প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমী
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগের
মুদ্রণ শাখা

প্রচ্ছদ
মাহবুবুর রশীদ

সবিনয় নিবেদন

মায়ের মুখ সন্তানের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ। খান্ডব দাহনের এই যুগে জীবন-জীবিকার নিষ্ঠুর ঘূর্ণাবর্তে, লাঞ্ছনায়-অপমানে দীর্ণ সন্তানও পৃথিবীর দিকে এখনো যে কোমল চোখে তাকাতে পারছে সে শুধু সম্ভব হচ্ছে ঐ মুখটির জন্যে। অসম্ভব অমৃতময় একটি মুখ, সন্তানেরা দেখছে নিরন্তর ঐ মুখের আদল—দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। মাতৃবক্ষের শাল দুধ-খাওয়ার সময়ে সেই যে জীবনের প্রথম দেখা মুখ—হেঁই থেকে শুরু। সদ্য প্রসূত শিশুর দৃষ্টিশক্তি থাকে খুবই ক্ষীণ।

মাতৃদুগ্ধ পান-কালে শিশু তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে (এক বিঘৎ পরিমাণ) যে মুখটি দেখে থাকে তখন থেকেই তার অন্বেষণের প্রধান বিষয় সেই প্রিয় মুখ—সারাটা জীবনব্যাপী ঘুরেফিরে সর্বত্র সর্ববস্তুতে ঐ আদলটিই খুঁজে ফেরে সে। আমাদের চোখের সামনে সর্বক্ষণ সুখদায়িনী চির-অমলিন ঐ মুখ দৃশ্যমান বলেই আমরা পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম 'খুনী' হতে পারিনে।

'মা'-ডাক সন্তানের সকল শান্তির উৎস।

"মা-কথা মধুর বড়ো সুধার সমান/কহিলে শুনিলে কথা জুড়ায় পরান।" সত্যি-সত্যি প্রাণ জুড়োয় এবং মা-কথা কেবলই সুধাময়।

পৃথিবীতে সু বা কু সন্তান আছে অনেক। কিন্তু একজনও কু-মাতা নেই।

পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই 'মা' এক প্রিয় বিষয়। গদ্যে-পদ্যে-স্মৃতিকথায় ঘুরেফিরে নানাভাবে এসেছে মাতৃপ্রসঙ্গ। মর্মবিদারক সেই বিখ্যাত চীনা গল্পের কথা তো সবারই জানা। "প্রেমিকার মন যোগাতে মায়ের কলজে চিরে নিয়ে যাওয়ার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল প্রেমিকপ্রবর—মায়ের কলজে বলে উঠল, ব্যথা পেলি খোকা?"

বাংলা সাহিত্যে ও মা-কে নিয়ে লেখালেখির শুমার নেই। মা'কে নিয়ে রচিত দুই বাংলার কবিদের সাম্প্রতিক কবিতার এই সংকলনে আমরা দেখতে পাব মাতৃভাবনা কত বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে!

আশা করি সংকলনটি পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে আদৃত হবে।

রফিক আজাদ

সকল মানুষেরই, জন্মের প্রথম সম্পর্ক, মা। যে-মায়ের শরীরের মধ্যে সে জীবন পেল সেই মা। তার স্পর্শ, তার গন্ধ, তার স্তনদুগ্ধ। শরীর থেকে বয়ে আসা অমৃত ধারা। জ্ঞান তখনো প্রায় অন্ধকারে। স্মৃতি তখনো এত স্থায়িত্ব পায়নি যে পরবর্তিকালে, ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারবে, বা প্রকাশ করতে পারবে তার অনুপুঙ্খগুলি। সেই সকল অভিজ্ঞতা প্রায়ান্ধকার এক স্মৃতিস্তরেই থেকে যায় হয়ত। কিন্তু সেই প্রথম স্পর্শ, গন্ধ, প্রায় অজ্ঞাত নিরাপত্তা ও নির্ভরতার বোধ, আজীবনই যেন সংবেদন শক্তির পিছনে কোথাও, কোনো লুক্কায়িত গুহায় থেকে যায়। তার প্রকাশ আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুভব করি বড় বড় হতে হতে, বড় হয়ে উঠে, পরিনত জীবনের দিকে ঢলে পড়তে পড়তে, এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও হয়তো! অন্যপক্ষে, সেই আধো অন্ধকার অনুভব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মা কথাটির কাছ থেকে, সম্পর্কটির কাছ থেকে, ঝলকে ঝলকে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে করতে চলে। আনন্দ, নির্ভরতা, দাবি এইসব পেরিয়ে দূরত্ব, গোপনতা, অভিমান এবং অবধারিত সব বিচ্ছেদ ক্রিয়ার মধ্যেও এসে দাঁড়ায় সেই অভিজ্ঞতার ধাপ। মৃত্যুর মতো অমোঘ কোনো পথের মধ্য দিয়ে আসতে পারে বিচ্ছেদ। আসতে পারে, সম্পর্ক-ভাঙনের রাস্তা দিয়ে। যেভাবেই তা ঘটুক, তার বেদনা মানুষকে ভেতরে ভেতরে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। অন্তত সেই সব ভাঙন মুহূর্তে, বিচ্ছেদ মুহূর্তে তার মনের সঙ্গে অবধারিতভাবে জড়িয়ে থাকে প্রথম দিনের অচেতন নির্ভরতা স্পর্শগন্ধ থেকে বেড়ে ওঠা সচেতন আনন্দ সুখ হাস্য কলরোল শাসন থেকে আজকের এই ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত সব, সমস্তটুকু অভিজ্ঞতার সারাৎসার। এবং সারাজীবনই—'মা' এই বিশেষ, একক, অপূর্ব, এবং অনতিক্রমণীয় বস্তুটির সঙ্গে যে তার সম্পর্ক হয়েছিল বা হয়েছে,—এই অনুভূতির প্রকাশ গোপন অনতিক্রম্য, বা স্পষ্টভাবে ঘটে চলে, কোনো কোনো মানুষের স্বপ্নে কাজে ব্যবহৃত শব্দে।

শব্দ। মানুষের উচ্চারিত প্রথম শব্দটিও হল 'মা'। এই উচ্চারিত শব্দটির, যখন উচ্চারণও কোনো আকার পায় না একটি অর্ধোস্ফুট ধ্বনি মাত্র হয়ে থাকে, সেই প্রায়-অচেতন স্তর থেকেই মানুষের সঙ্গী। আর সেইসব মানুষ, যাঁরা শব্দকে ধরেই বেঁচে রয়েছেন, যাঁরা কবি, তাঁদের কাছে এই শব্দটি আরো বেশি গুরুত্ব নিয়েই আসে। কেননা অনুভবের, অভিজ্ঞতার স্পষ্ট বা সাংকেতিক প্রকাশই তাঁদের কাজ। সেইসব অনুভবের প্রথমটি হল 'মা'। সারাজীবন কবি যে অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করে চলেন, তার প্রথমটি, যা তিনি শিখেছিলেন, তা হল মা। মা শব্দটি

নানাভাবে দ্যোতনাময়। 'মা' অনেক সময়ই কবির হাতে কেবল 'মা' থাকে না। হয়ে দাঁড়ায় জন্মভূমি। এমনকি পৃথিবী এই জল হাওয়া মাটি যা থেকে প্রাণ জন্মায়। প্রাণ লালিত হয়। এই প্রাণ, এই কোটি কোটি আলোকবছর ব্যাপী ছড়নো যে তারকা মণ্ডল, আগুন গ্যাস আর অন্ধকার শরীরে ধারণ করে ঘুরে বেড়ানো সংখ্যাহীন সব আকাশ বস্তু, এদের কারো মধ্যেই যে প্রাণ আসেনি। এসেছে একমাত্র ক্ষুদ্র এই গ্রহে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে একক। একাকিনী। সেই সমস্তই যেন ধরা আছে জন্ম শব্দটিতে, জীবন শব্দটিতে, প্রাণ শব্দটিতে। এবং সবচেয়ে বেশি, 'মা'। এই শব্দটিতে।

সেই কারণেই 'মা'কে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে চিরকালই। এই একটি শব্দ, যা একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ব্রহ্মাণ্ড, তারাজগৎ পর্যন্ত ধরার শক্তি রাখে, যদি তা ব্যবহার করা যায়। মৃত্যুর ওপারেও যেন পৌঁছতে পারে, তবে সে—কবিতা। অন্ধকার কোনো আকাশভরা মায়ের ভিতর থেকেই একদিন নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল এই মহাজগৎ এতদূর অবধিও যেন দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রাখে সে। যদিও সে এর পাশাপাশি রাখতে পারে, মায়ের স্নেহশাসন. মায়ের ভাঁড়ার ঘর থেকে আচার চুরি, ঘুমিয়ে পড়ার সময় মায়ের বলা গল্প। রাখতে পারে, ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখবার পর, পিছন ফিরে দেখা, দরজা ধরে মায়ের স্মিতমুখ দাঁড়িয়ে থাকাটুকুও।

সেইজন্যই, মা-কে নিয়ে কবিতা লেখার অধিকার আমাদের সকলের। আমরা সবাই হয়তো সমান ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারি না কঠিন এই কাজে। জীবনেও কি পারি সব কাজে সমান সাফল্যে পৌঁছতে? কবিতা তো জীবনেরই অংশ। কখনও কখনও জীবনের প্রতিরূপও হয়তো সে। তবু আমরা সবাই চেষ্টা করি জীবনকে ধরতে। নিজের নিজের মতো করে। এই সংকলনও, সেই উচ্চাবচতা নিয়েই চেষ্টা করলো মাকে নিয়ে লেখা কবিতার বহুবিচিত্র আলো অন্ধকারকে ধরে রাখতে।

এই সংকলনের কাজে আমাকে প্রথম থেকে প্রতিটি স্তরে সহযোগিতা করেছেন কবি মৃত্যুঞ্জয় সেন। এই সংকলন যদি পাঠকের ভালবাসা পায়, তার প্রধান কৃতিত্ব তাঁরই হওয়া উচিত এবং এ কথাও স্বীকার করব, এই সংকলনের যাবতীয় ত্রুটির দায়, আর কারও নয়, আমার নিজেরই।

প্রসঙ্গত

পৃথিবীর সর্বত্রই এক একটা শতাব্দী আসে এক একটা নতুন ফসল নিয়ে। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেও আমাদের দেশে যে-সব কব্য রচনা করা হয়েছে সে-সব সাহিত্য-সমালোচকেরা কোনও মতেই আধুনিক কবিতা বলে স্বীকার করেন না। আর মধ্যযুগের অবসান পর্যন্ত নানা কাব্যে শুধু দেবদেবীর, বৈষ্ণবের, শাক্তের সাধকসঙ্গীতই শোনা গিয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তে কবিতায় আধুনিকতার ঢেউ লাগলেও তিনি রঙ্গকবি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ই বাংলা কবিতায় উপস্থিত হল মধ্যবিত্ত সমাজের নানান ভাব-ভাবনার প্রতিচ্ছবি। মাইকেল মধুসূদনে কলমের ছোঁয়ায় সেই কাব্য-কবিতার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হল। কবিতায়-কল্পনায় ও রচনাভঙ্গিতে সংযোজিত হল নতুন মাত্রা। পশ্চিমে তখন আধুনিকতার স্বরূপ সন্ধান চলছে। এদেশেও জাগরণও ঘটছে সমাজ-চেতনার। ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। পাশ্চাত্যের প্রভাবে বাংলাসাহিত্যে পৌঁছে গিয়েছে আধুনিকতার ফসল। বাংলা-কবিতায় দেখা যাচ্ছে কবিদের অন্বেষণ, আত্ম-আবিষ্কারের তাড়না। আঙ্গিকও যাচ্ছে পাল্টে। সেখানে নানান অঙ্গীকাব। কবিতার রূপ রস হচ্ছে সচেতন মানবজাতির মুখের ভাষা, প্রাণের ভাষা। কবিতার বিষয়বস্তুও নানান বৈচিত্র্যে ভরপুর। বিংশ শতাব্দীর অবদান সেসব। এবং আমাদের দেশে মাতৃতান্ত্রিকতার জয়গান। স্বাভাবিক কারণে আধুনিক প্রজন্মের কবিদের কবিতায় নানান ভাব ভাবনার মধ্যেও চিত্রিত হয়েছেন মা। মা চিরসত্যের প্রতীক। শব্দটি যে কোনও মানুষের কাছে পরম আদরের, মনোযোগের। সেই মা-কে নিবেদিত কিছু কবিতা এই সংকলন-গ্রন্থে গ্রথিত করা হয়েছে। এই সংকলন-গ্রন্থের সম্পাদক কবি রফিক আজাদ ও কবি জয় গোস্বামী তাঁদের লেখা সম্পাদকীয় তে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেসব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সেই কথাই ছিল এই সংকলন-গ্রন্থের পক্ষে যথেষ্ট।

অবশ্য ওই সংকলন-গ্রন্থে কোনও মানদণ্ড কবি ও তাঁদের কবিতা নির্বাচন করা হল তা নিয়ে নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে। কিছু বলার দায় থেকে যায়। আধুনিক কবিতার অগ্রদূত কবি জীবনানন্দ দাশ ও বাংলাদেশের প্রবীন ও প্রাজ্ঞ কবি আহসান হাবীবের কবিতা দিয়ে এই সংকলন-গ্রন্থ শুরু করা হয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা কেবল কিছু নির্বাচিত কবিতার উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটাতে চাইছি না, আমবা চাইছি, সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কবিতার স্বরূপখানি তুলে ধরতে। তাই আমরা বর্তমান দশকের যাঁরা বলিষ্ঠতম কবি তাঁদেরকেও এই সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করে তৃপ্তিবোধ করছি। অবশ্য এও আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে সংকলন-গ্রন্থটির মাধ্যমে শুধুমাত্র আধুনিক

কবিতার তাৎপর্য ও বর্তমান বাংলা কবিতার হদিশ তুলে ধরব না, সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ দিক চিহ্নিত করে সংকলন-গ্রন্থটিকে এক স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে গড়ে তুলব। এবং এসব করতে গিয়ে আমরা সতর্ক ছিলাম সচেতন কবিতা-পাঠকদের চাহিদাপ্রতি। তাই নির্বাচিত কবিতাগুলির প্রাসঙ্গিকতা মা হলেও সেগুলিতে যাতে নানা বর্ণের রূপ রঙ মাধুরী বজায় থাকে তার দিকে নজর দিতে । এইসব কবিতা থেকে পাঠক আধুনিক চেতনার বিচিত্রমুখী চিত্রাস্রোতের সন্ধান পাবেন। অন্তর্জগত ও বহির্জগতের বিশ্লেষণ। সমাজ-চেতনার অঙ্গীকার, রচনা শৈলীর মাধুর্য কবিতাগুলিতে বিদ্যামন।

প্রসঙ্গত, জানাই, এই সংকলনগ্রন্থে চূড়ান্ত তালিকায় আরও কয়েকজন কবি ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এ মুহূর্তে মা-কে নিবেদিত কোনও লেখা না থাকায় আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারেননি, আবার কেউ কেউ আমাদের অজানা কোনও কারণে কবিতা পাঠাননি। আগামী সংস্করণে তাঁদের সাড়া পাব বলে আশা রাখি।

পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে আমাদের পরিকল্পনা ছিল কবিদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কিছু তথ্য ও তাঁদের ফোটো এই সংকলন-গ্রন্থে কবিতার সঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া কিন্তু সকল কবির সব তথ্য ও ফোটো আমাদের সংগ্রহে এ মুহূর্তে নেই। পরবর্তী সংস্করণে সেসব সন্নিবেশিত হবে। কিছু ছাপা ভুলও তখন সংশোধন করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

প্রকাশক জয়দেব ঘোষ নতুন পরিকল্পনা হলেই এগিয়ে আসেন। এই কবিতা মনস্ক প্রকাশক এ মুহূর্তে কবিতা-পাঠকদের বন্ধু হয়ে উঠেছেন। এই ধরনের স্বতন্ত্র মর্যাদা পাওয়া সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে তিনি ছিলেন সমান আগ্রহী।

সূচিপত্র

বাংলাদেশ

পশ্চিমবঙ্গ

বাংলাদেশ

রফিক আজাদ

মায়ের ডাকের ছড়া
আহসান হাবীব

খোকন খোকন করে মায়
খোকন রে তুই ঘরে আয়
খোকন গেছে কাদের নায়
গেছে খোকন কোন্‌খানে?
নেই সে ঘরে নেই ত খোকন শতদলের মাঝখানে।

চৌমাথার এক ঘণ্টিওয়ালা পাগলাঘণ্টা বাজাচ্ছে।
সেথায় আসন পেতে খোকন নিজকে নিজে সাজাচ্ছে।
হাত পা ছুড়ে ঘণ্টিওয়ালার নাচানাচির নেইক শেষ।
ঘণ্টিওয়ালা নাছছে দেখে খোকন বলে, নাচছি বেশ!
উল্টো করে আয়না ধরে বলে খোকন তাইত,
ঘরকুনো সেই বেড়ালমুখো চেহারা আর নাইত!

ঘণ্টিওয়ালার দু'চোখ লাল
পরেছে এক বাঘের ছাল
মাথায় হরিণ শিং লাগিয়ে সঙ সেজেছে চমৎকার।
খোকন ভাবে, বেশ সেজেছি, এমন সাজে সাধ্য কার?

মা বলে, শোন, ওরে খোকন,
ঘুরিয়ে ধর আয়নাটা,
খোকন ভাবে, বুড়ো মায়ের
কেমনতর বায়নাটা!
আমি যা তাই সত্যি হবে?
যা হতে চাই সত্যি নয়?
বুঝছে না মা, এই সাজেই
করতে হবে বিশ্বজয়!

মায়ের বাড়ির পথে
সিকানদার আবু জাফর

মায়ের বাড়ি যখন ইচ্ছে এসো
অষ্ট প্রহর সব দরজা খোলা;
পথ চিনতে কষ্ট কেন হবে।
হাড়ের গুঁড়ো, মাথার ঘিলু
কলজে ছেঁড়া ছেঁড়া
সাজিয়ে পথের নিশান করা আছে,
দেখামাত্র, অমনি যাবে চেনা।
আরো অনেক চিহ্ন আছে পাতা
ভোরের আলো ফুলের গন্ধ
নানান পাখির বুলি
মরে মরে ছড়িয়ে আছে বলে
পথ চলতে পায়ে লাগবে
নানা রঙের ধূলি।

দুষ্টু ছেলের ডাকাত-খেলার খুশি
মিষ্টি মেয়ের চোখ-ধারালো হাসি
শুকিয়ে গিয়ে ঝুলছে দেখো
পথের কাঁটা গাছে।
দুপুর-ঢাকা বট অশথের ছায়া
কিংবা ঘাসের সবুজ শীতলপাটি
দেখবে পুড়ে কয়লা হয়ে আছে।
চলতে পথে বারে বারেই শিউরে
উঠবে দেহ
মনে হবে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছ বুঝি
কারও আশা ভালোবাসার নিথর শবদেহ।
মায়ের বাড়ির পথে যদি
ঘনায় আঁধার নিশা
কানপাতলেই ছেলে-মরা
মায়ের কান্না শুনে
মিলবে পথের দিশা।

আমার মা

সৈয়দ আলী আহসান

এক

আমার মা কখনও কবিতা পড়তেন না কিন্তু
কবিতা পড়া শুনতেন। বাবার প্রিয়গ্রন্থ ছিল ফিরদৌসীর
'শাহনামা'। প্রায়ই বিকেলবেলা যখন সূর্যের
তাপ নেই, তিনি বারান্দায় বই নিয়ে বসতেন।
সুর করে ফারসি পড়তেন আর বাংলাতে তার
অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। শ্রোতা থাকতেন আমার
মা। অবসর সময়ে কোনও কোনও দিন মা
আবার এসব গল্প আমাদের বলতেন।
মা অর্থ শুনতেন ঠিকই কিন্তু বিশেষ তন্ময়
হতেন বাবার ফারসি পড়া শুনে। ধ্বনি বৈচিত্র্য
শুনে মা-র মনোভঙ্গির পরিবর্তন ঘটত যেন, কখনও
তার মুখে আলো খেলতো আনন্দের, কখনও
উৎকণ্ঠার, কখনও নিবিড় প্রত্যাশার। এতদিন পর
পুরনো দৃশ্যগুলো নির্মাণ করতে গিয়ে এভাবেই
সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে ভাল লাগছে।
এখন মনে হয় মা-র চিত্তে একটি কাব্যগত রসাবেশ
ছিল, তা না হলে সুরের ঝংকার তাঁর মনে
সাড়া তুলতো না। কখনও দেখেছি টিনের
আটচালা ঘরের পশ্চিমের জানালার কাছে
তিনি সকালবেলা বসে আছেন। বাঁশের
জালি করা বেড়ার ফাঁক দিয়ে নতুন সূর্যের
রৌদ্র কখনও বিন্দু বিন্দু, কখনও রূপোর টাকার
মত আমার মা-র সুন্দর হাতে, কপালে, চিবুকে,
চোখের পাপড়িতে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার
এখন মনে হয়, মা এই রোদের খেলা দেখতে
ভালবাসতেন। এভাবেই তিনি কবিতাকে অনুভব
করতেন সকালবেলার রোদের লঘুস্পর্শ নিয়ে
যা আলোর প্রজাপতি হয়ে, তার গায়ে ছড়িয়ে
পড়তো। তীনি কবিতা পড়তেন না, কবিতা লিখতেন
না, কিন্তু কবিতা অনুভব করতেন। কখনও এ অনুভূতি
ধরা পড়তো সুর-ঝংকারে তার মনে যে তন্ময়তা
জাগাতো তার মধ্যে, কখনও ধরা পড়তো সকাল
বেলার রোদের ছায়া নিয়ে তার নিশ্চেতন অলস
অবসর যাপনের মধ্যে।

দুই

যখন সন্ধ্যায় গৃহকপোতগুলো
একটি অন্তরাল সন্ধান করছিলো,
যখন লম্বা ঘাসের পাতা রৌদ্র হারিয়ে
ঠাণ্ডা বাতাসের সাড়া শুনছিলো,
যখন আমগাছের ঘন পাতার অন্ধকারে
সূর্য ডুবলো—
তখন তুমি সময় গণনা করে
একটি শুভ্র শয্যায় হাত রাখলে।
তোমার মনের অনিশ্চয় চিন্তার মতো
প্রদীপের শিখা কেঁপেছিলো,
যখন একটি অস্তিত্বের প্রস্তাবের মতো
তুমি বেদনার মধ্যে পদশব্দ শুনছিলে।

রাজহাঁসের পাখার শুভ্রতার মতো
অনেক বিশুদ্ধ চিন্তাকে তুমি স্মরণ করছিলে—
এবং অনবরত মহাপুরুষদের কথা ভাবছিলে
একটি প্রশান্তির অধিকারে।

অশ্রুবিন্দু মুক্তোর মতো এবং শুনেছি
তখন তোমাকে সুন্দর দেখাতো,
কিন্তু সে-রাত্রে তুমি অবাক হয়ে ভাবছিলে
কেন তোমার চোখে পানি নামলো না—

যন্ত্রণার একটি বিমুগ্ধ তন্ময়তায়
তুমি আমাকে জন্ম দিলে,
রোরুদ্যমান অসহায় মানব শিশু
তোমার স্তনের ছায়ায় নিদ্রিত হলো।

মা, আমি বড় হয়ে তোমার ইচ্ছাকে
পূর্ণ করতে পারলাম না।
বাতাসে প্রদীপের শিখার মতো অসহায় আমি
মহাপুরুষ হতে ভয় পেলাম—
রৌদ্রে প্রজাপতির ডানার আড়ালে
রক্তগোলাপকে দেখে,
আমি সাধারণ মানুষের আগ্রহ এবং দুঃখের মধ্যে
একজন একাকী কবি হলাম।

বাঁচবো কি

আবুল হোসেন

বাঁচবো কি? আর কী করে বাঁচবো?
গাল ভরে হু হু কান্নার ঢেউ,
বুকের মধ্যে ছারখার জ্বালা
ফুলে ফুলে ওঠে,
গন্‌গনে সীসে ঢালা ঝাঁঝাঁ কানে,
বালবের ছেঁড়া তারের মতোন
থরথর হাত।
ছড়ানো টেবিলে পড়ে আছে তার—
মা নেই আমার।

মনে পড়ে সেই তেরো বৎসর
আগে এক দূর ঝক্‌ঝকে গ্রামে
দু' চোখ অন্ধ, দমও বন্ধ,
দুপুরে দরজা হাতড়ে বেড়ানো—
বুকের খাঁচায় হাড়ে আটকানো
ময়নাটাব সে পাখা ঝাপটানো।

তুব বেঁচে আছি।
সকালে নাশ্‌তা, দুপুরে আপিস
সন্ধ্যায় তাস, রাত্রে বালিশ,
মাঝে মাঝে ছুটি হাওয়া বদলানো,
ঘরোয়া তর্কে আকাশ ফাটানো।
কখনো বা ঢাকা কখনো করাচি।
সময়ের সীমাহীন দরিয়ায়
জীবন জাহাজ পাড়ি দিয়ে যায়,
চেনা মুখ ক্রমে স্মৃতির রেখায়
দিগন্তে সূর্যাস্তে মিলায়,
ফেলে চলে যায় জানা বন্দর,
হারায় পুরানো পাখির বহর,
সঙ্গী কেবল হাঙরের ঢেউ।

থামবে যেখানে সেখানে কি কেউ
গরম চায়ের বাটি হাতে করে
ঘাটে বসে আছে সারা দিন ধরে।
সেখানে কি কেউ অচেনা শহরে
হাত ধরে পথে নিয়ে যাবে ঘরে?

পড়ন্ত রোদে চোখ মেলে আজ
দেখি জীবনের বিশাল জাহাজ
ছোট হয়ে আসে। বারে বারে তাই
ভেজানো দরজা শুধু হাতড়াই।
যাবার জন্য প্রাণ উথলানো
সেই সময়টা থামছে না আর
যখন তখন আসছে আবার।

মা-কে

আবদুল গনি হাজারী

আমার বিশ্বাস, মা আমার, তোমায় উদ্বিগ্ন করেছে
আমার অবিশ্বাসে, জননী, তোমার আতঙ্ক
তোমার অশ্রুর সিঞ্চনে তবু
কি অপ্রমেয় প্রাণের বীজ।

মা

আতাউর রহমান

ঘন বর্ষা, ঝড় ঝড়ে বিপর্যস্ত বাংলার আকাশ
ঘর ভাঙে, ভাঙে সেতু হাট ঘাট ভেঙে পড়ে
উল্টা পাল্টা ঝড়ের ধাক্কায়
আকাশ উন্মাদ হয়ে গর্জে রাত্রিদিন
ঘন ঘন বাজ পড়ে অদূরে সুদূরে।
এমন দুর্যোগে কেউ বাইরে কি থাকে?
ভাবছেন মা আমার শঙ্কিত দুরু দুরু বুকে
খোদা তাকে রক্ষা করো
জোড়াখাসি কোরবানী তোমার দরগায়।
গভীর দিঘল রাত
চোখ দুটি বিনিদ্র পথিক
স্মৃতির সড়কে তিনি হেঁটে যান দেখেন দু'পাশে
সারি সারি চিত্রগুলি সাজানো সবাক
ফুটফুটে আতাউর কোলে তাঁর বোশেখের শেষে
আতাউর ধুলোকাদা নিয়ে আজও খেলছে আঙ্গিনায়
মাছ ধরছে নয়ানজুলির জলে, ছুটছে মাঠে মাঠে
সেলেট পেন্সিল আর বই নিয়ে যাচ্ছে পাঠশালায়,
কখন বা দেখছেন, আতাউর জ্বরের ঘোরে বকছে প্রলাপ
পড়ছে বহু রাত জেগে পরীক্ষার দিনে
কখনো বা দেখছেন ছেলে তাঁর পলাতক
কোন এক নিষাদের ভয়ে।

আতাউর আশৈশব শান্ত সুশীতল
রাত দিন বই পুঁথি ঘাঁটে আর কি যেন সে ভাবে
সবার ভেতরে আছে, নেই তবু কোন কিছুতেই
আমার পেটের ছেলে আমা থেকে দূরে চলে গেছে।

রাত্রি ভোর হয়
আজানের শব্দে তিনি আল্লা রসুলের নামে
ছাড়েন বিছানা,
নামাজের অন্তে ওঠে করুণ প্রার্থনা
আল্লা তুমি রহমান রহিম

দয়া কর, দয়া কর
ফিরে দাও ছেলেকে আমার।

এ বছর আতাউর খেতে পেলোনাক আম জাম
গাছের তলায় গেলে মনে পড়ে তাঁর
কোথায় কিভাবে আছে জানেন খোদা-ই।
পেটের অসুখ মাথাঘোরা
সর্দি-কাশি জ্বর,
আরও কত অসুবিধা আছে শারীরিক,
স্বাস্থ্যটা তো ভালো নয়, ...
দুপুর গড়িয়ে যায় আতাউর খেয়েছে কি ভাত?
কোথা পাবে সরু চাল; ছোট্ট মাছের ঝোল; আধাসেদ্ধ ডিম?
খাচ্ছে কি খাচ্ছেনা আল্লা-ই জানেন।

বউমা, কেঁদোনা, কেঁদোনা।
আল্লা আছে, ফিরে আসবে ও।
চিঠি লিখো, আসতে বলো তাকে।
সকাল বিকাল মা কাটান যে পথ চেয়ে চেয়ে
পুব থেকে পশ্চিমে বার বার দৃষ্টি চলে তাঁর
উত্তর দক্ষিণের পথ বার বার ঘোরাফেরা করেন উদ্বেগে
"কই, তাকে দেখা যায় না তো?
ঐ দুরে কাকে দেখা যায়?
আতাউর? চেনা যায় না তো?"
চোখ দুটো ঘষে নেন মা আমার আঁচলের খুঁটে
হয়ত চোখের দোষে দেখা যায়নাকো।

আতাউর আতাউর ফিরে আয় ফিরে আয় বাবা,
দুয়ারে ঘাতক দস্যু—দেশের দুশমন।

জননীকে
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

শুধু কোল থেকে নয়, স্নেহ শাসনের গণ্ডি হতে
বহুদিন পলাতক। কতো দিন লেগেছে তোমার
এক ব্যথা ভুলে গিয়ে অন্য এক সুখের আলোতে
গড়ে নিতে, অনেক বৎসর ধরে, আলাদা সংসার!
সত্যি কি অতল ওই মাতৃস্নেহ? দৃষ্টি থেকে দূরে
স্পর্শ থেকে কতো দূর যায়, যে সময় কণ্ঠস্বর
হারায় নীরবতায়, যে সময় স্মৃতি ঘুরে ঘুরে
বারবার পিছনে তাকায়—
সমস্ত জীবনভর
শূন্যতাকে স্বীকার করোনি। দূর হতে গৃহচ্যুত
বঞ্চিতের ঈর্ষা নিয়ে চেয়ে দেখি তোমার বিশাল
সাম্রাজ্যের সীমা, দেখি দিগ্বিজয়ী তোমার পতাকা।
কোন দুঃখ আছে কি তোমার, আছে কোন ঊর্ণাজাল
সত্তার গভীরে, অতি সংগোপনে, তারা-রশ্মি-মাখা,
বাতাসের স্পর্শের অতীত, অলৌকিক, মন্ত্রপূত?

কখনো আমার মাকে

শামসুর রাহমান

কখনো আমার মাকে কোনো গান গাইতে শুনিনি।
সেই কবে শিশু রাতে ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে
আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কি না আজ মনেই পড়ে না।

যখন শরীরে তার বসন্তের সম্ভার আসেনি,
যখন ছিলেন তিনি ঝড়ে আম-কুড়িয়ে বেড়ানো
বয়সের কাছাকাছি হয়তো তখনো কোনো গান
লতিয়ে ওঠেনি মিড়ে মিড়ে দুপুরে সন্ধ্যায়,
পাছে গুরুজনদের কানে যায়। এবং স্বামীর

সংসারে এসেও মা আমার সারাক্ষণ
ছিলেন নিশ্চুপ বড়ো, বড়ো বেশি নেপথ্যচারিণী। যতদুর
জানা আছে, টপ্‌পা কি খেয়াল তাঁকে করেনি দখল
কোনোদিন। মাছ কোটা কিংবা হলুদ বাটার ফাঁকে
অথবা বিকেলবেলা নিকিয়ে উঠোন
ধুয়ে মুছে বাসন-কোসন
সেলাইয়ের কলে ঝুঁকে, আলনায় ঝুলিয়ে কাপড়,
ছেঁড়া শার্টে রিফু কর্মে মেতে
আমাকে খেলার মাঠে পাঠিয়ে আদরে
অবসরে চুল বাঁধবার ছলে কোনো গান গেয়েছেন কি না
এতকাল কাছাকাছি আছি তবু জানতে পারিনি।

যেন তিনি সব গান দুঃখ-জাগানিয়া কোনো কাঠের সিন্দুকে
রেখেছেন বন্ধ ক'রে আজীবন এখন তাদের
গ্রন্থিল শরীর থেকে কালেভদ্রে সুর নয়, শুধু
ন্যাপথলিনের তীব্র ঘ্রাণ ভেসে আসে!

আমার মা'কে যখন
আলাউদ্দিন আল আজাদ

আমার মা'কে যখন মনে পড়ে চলতিবাসের ভিড়ে জানালায়
তাকাই করুণ আমি রডধরা সহযাত্রীর হাতের যত ঘাম
লাগে গালে ঝাঁকুনির তালে তালে এবং যদিও খুব নিরুপায়
গরম নিঃশ্বাসে চাপে দেখি দূরে হলুদ-সবুজ বন, কালোজাম
থোকা থোকা ধরে আছে আলগোছে ঠোকর মারে কাকেরা, উড়ে যায়
ডাল থেকে ডালে, বসে, কিযে খুশি দুপুর রোদেও ডাকে অবিশ্রাম :
আমি মুগ্ধ শিশুচোখে এক হ্রদ বিস্ময়ের ঝিকিমিকি, মহাকায়
বটগাছ খেলা করে বাতাসের স্রোতে হাতে পাখি নীলকণ্ঠ নাম

২

কখন পিছনে এসে মা আমার সহসা ধরে ফেলেন ছোটো হাত
বলেন, 'এখানে তুই, দুষ্টু! আর আমি এতক্ষণ খুঁজে হয়রান।'
'না, দাবোনা আমি' ঘাড় নেড়ে মোচড় দিয়ে বলেছি, 'হোক লাত
আমি দেখবো গাছের দালে দালে কাতবেলালির নাত!' সেই স্থান
এখনো রয়েছে জেগে ফাল্গুনের জোয়ারে ভাসছে খুব মৌতাত
ফুলে ফুলে গুন্‌গুন্‌ মৌমাছি ঘনপাতার আড়ালে সাবধান
কোকিলেও গায় গান কুহু কুহু—কেবল আমরা নেই, কি আঘাত
পেয়ে নাকে-মুখে দুঃখে চলে গেছি পদচিহ্নও রাখেনি সে বাগান

৩

যখন মা'কে আমার পড়ে মনে ঘোর হয়ে আসে ভরা শ্রাবণের
কালোমেঘ, হিরণ্ময় বিজলির প্রস্তাবনা শেষ হলে ঝম্‌ঝম্‌
বৃষ্টি অবিরাম পড়ে গুরুগুরু তূর্যধ্বনি কি আশ্চর্য দেখি ফের
খুলে যায় রূপকথার মায়াবী দরোজারা একে একে, ছম্‌ছম্‌
নীরবতা আমি চলি স্তব্ধপুরী সিঁড়ি বেয়ে বুক ভরা আছে ঢের
দুঃসাহস, দাঁড়ালাম নিরিবিলি যেখানে শুয়ে আছেন মনোরম
রাজকন্যা মৃতপ্রায়, অচেতন সম্মোহন মন্ত্র ঘুমে, পাই টের
সকল পাথরমূর্তি আমারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে, থমথম

৪

কা'কে ভয় করি আমি? এই দ্যাখ আমার বাজুতে বাঁধা জননীর
স্নেহের তাবিজ, তার চুম্বনের দাগ সারা শরীরেই ধরে আছি :
সোনার-রুপার কাঠি অপলক অদলবদল করি, হাতে তীর
ধনুকের সাজ শুধু কৌটার ভোমরার পাখা ছিঁড়ে কাছাকাছি
টেনে নিই তা'কে তুলে পঙ্খিরাজে যে আমার জন্য জ্বলে স্থির
দীপাবলী হয়ে ছিল, আসুকনা ধেয়ে রাক্ষসেরা ওরা মত্ত মাছি
মাত্র মেরেছি সহজে, যৌবরাজ্যে যাচ্চি উড়ে উড়ে আমি মস্তবীর
ছাড়িয়ে পর্বতমালা নদী ও প্রান্তর, গলায় দোদুল মালাগাছি

৫

আমার মা'কে যখন মনে পড়ে ছিন্ন হয়ে যাই আমি স্তব্ধবাক
পাষাণপ্রতিম, শুধু ভরাচোখ যেন এক সরোবর—গরমিল :
ভুলতে পারি না তা'রে বি খোলাসা ছোবলে নিয়েছে ক্ষুধা দুর্বিপাক—
সেই বিষ তপ্ত করে, দগ্ধ করে আমাকে—তাই যখন অন্ধ চিল
খুব আলোড়িত কালবোশেখীর মেঘে চক্রাকারে ছাড়ে তীব্র ডাক—
চেয়ে দেখি—আমি যেন নগ্ন পায়ে চলেছি, থরে বিথরে অনাবিল
জুঁই আবৃত কবর ছেড়ে সারা পল্লীর পথ-বিপথ সেরে বাঁক
নিয়ে শহীদ মিনারে এসে দাঁড়িয়েছি, যতক্ষণ না আসে মিছিল।

ইচ্ছে হয়

হাসান হাফিজুর রহমান

ইচ্ছে হয়, ফিরে যাই মার বুকে
শৈশবের অমলিন খেলাঘরে
সেখানে হাঁটি হাঁটি পা পা শিখি পুনরায়
ধুলোকে সোনার চেয়েও দামি জেনে
বানাই প্রাসাদ,
অভাবনীয় সেই স্বর্গে যাই ফিরে;

ইচ্ছে হয়, পিতার সান্নিধ্যে যাই পুত্র হয়ে পুনর্বার
অপত্য স্নেহের যে ঋণ বুঝি নাই কোনোদিন
দুহাতে কুড়াই সেই অপরিমেয়;

ইচ্ছে হয়, যৌবনের রাঙা জাদু দণ্ডে
দু পা ছড়িয়ে বসি নিরুদ্বেগ কিছুকাল
রক্তের মাতাল রস করি পান, যার স্বাদ কিছু জানি নাই;

ইচ্ছে হয়, এখনো সময় আছে
যথার্থই পিতা হই হাস্যমুখ সুখী পরিবারে—
স্নায়ুর দারুণ প্রতাপ বেঘোরে তাড়ায় শুধু;

ইচ্ছে হয় ফিরে যাই শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে।
সময়ের অতুলন মণিগুলো হাতের মুঠোয় পেয়েও
এসেছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেবল, শিখিনি গোছাতে।

শুধু ইচ্ছে নিয়ে মরি, ফেরবার পথ জানা নেই।

আমার মা নিটোল একটি কবিতা

জাহানারা আরজু

আমার মা আমার চোখে নিটোল একটি কবিতা—
যার কোলে দোল খেয়ে খেয়ে পরম তৃপ্তিতে
ঘুমাতাম আমি। কী শুনেছি মার কণ্ঠে তখন—
এখন মনে নেই আমার সে গান! দিনে দিনে
আমি ছোট নীল কুঁড়ির মতো মায়ের কোল জুড়ে
আমার শৈশবের পাপড়িগুলো মেলে দিতাম!
আমার চোখে মা ছিলেন ছন্দের শিখা—
কাঁচা সোনার বরণে তাঁর দেহখানি মাজা—
কোলে দোলে শ্যামল মেয়ে নীল ফুল আদরের
ঝুম্‌কো লতা, মায়ের বরণের উল্টো আমার বরণ,
বাবার হুবহু আদল নাকি আমার দেহের বর্ণ ও অবয়বে—
পিতার আদর যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখতো
সর্বক্ষণ—'বাপগঠন' গৌরব গর্বে ভরে উঠেছিল
আমাকে নিয়ে তাঁদের দুর্লভ আনন্দের মুহূর্তগুলো—
আর পৃথিবীর অশুভ ছায়া থেকে দূরে সরিয়ে
রেখেছেন প্রথম সন্তানকে তাঁদের—। ছুটে এলো স্বজন,
পাড়া পড়শিরা দেখবে সোনার প্রতিমার কোলে কেমন সে
নীল অপরাজিতা। মায়ের দু'চোখে ঝাঁক ধরে উড়ে এলো
সপ্ত আকাশের রঙধনু-রঙ, কণ্ঠে গুনগুন গানের কলির
মৃদু সিম্ফনি—ঢেউ—, সে ঢেউ আমার বুকেও দিনে দিনে
দোল খায়-আমার কথায়, ছড়ায়—আখরে, কবিতায়!
প্রতিটি দিনের পাতা তাই বুঝি খুঁজে পেল এক
প্রজাপতি বর্ণিল জগৎ-স্বপ্নের সোনার হরিণ, নক্ষত্রের
রাত যেখানে কথা বলে।

তারপর কেটে গেল কতদিন—
সুখ দুঃখের পথ হেঁটে হেঁটে কখনো ব্যথা ক্লান্ত শ্রান্ত
এ পণ্যের বোঝা বয়ে বয়ে, কখনো প্রাপ্তির বৈভব গৌরবে
ঝলমলে উজ্জ্বল জীবনের মেঘ-রৌদ্রের খেলায়।
এমন বিবর্তনে আমিও মা হলাম, মা হয়েছে আমারও সন্তান
আমরা একে অপরকে ছাড়িয়ে চলেছি ক্রমাগত,—এখন
আমরা কেউ-ই যেন আর কারো জন্যে দাঁড়িয়ে নেই,

আমার মায়ের সেই সোনার আঁচল বৈধব্য-সাদা এখন—
খুঁজে ফিরি কোথায় সে নীলাম্বরী মায়ের সন্ধ্যা-তারা
চুম্‌কি বসানো শাড়ির আঁচল—প্রতিটি বুনোট সুতোয়
যেন সন্তান-সোহাগের রঙ লাগা স্বপ্নের ঝিলিমিলি—
সুনীল আকাশের ছায়া যেন মায়ের নীল শাড়ির আঁচল!
আমার সেই নিটোল কবিতার মতো মা, বার্ধক্যের নির্মম
কোঠায় পা রেখেছেন তার-সেই রূপকথার রাজ্যের
রূপবতী-কলাবতী রাজকন্যার মতো মা, নিষ্করুণ
বার্ধক্যের কাছে সমর্পিতা এখন!

সময়ের দ্রুত ধাবমান শকটে যেখানে চলে এসেছি
আমরা সবাই, সেখান থেকে আমরা তো তেমন করে
ছুঁয়ে যেতে পারছিনা আমাদের সেই মাকে—
মায়ের মনের আকাশটাও কি শতধা বিভক্ত এখন?
আমরা যে চাই শীত-উষ্ণতার সবটুকু ওম মায়ের
বুক থেকে পেতে, মায়ের মুখে উচ্চারিত আমাদের
ডাকনাম শুনে শুনে আর একবার শৈশবের খেলাঘরে
হারিয়ে যেতে—অথচ সময়ের বহমান স্রোতধারায়
দাঁড়িয়ে আছি আমরা সন্তানের—ওপারে দাঁড়ানো
আমাদের মায়েরা,—কী ভীষণ একাকিত্বে অসহায়।
বার্ধক্যের নির্মম ছোবলের কাছে আমরা সবাই—একে একে
ক্রমধাবমান। জানিনা কে কখন টুপটাপ খসে যাব। আমাদের শৈশব
যৌবন—তারুণ্য এক অতলতায় তলিয়ে যাচ্ছে দিন দিন!
তবুও সবকিছু ছাপিয়ে ছাড়িয়ে মনে হয়, আমার মা
আমার চোখে নিটোল একখানি কবিতা—
মাথার ওপর যতক্ষণ মায়ের আঁচল আছে, ততক্ষণ
কোন অশুভ ছায়া পারবেনা আমাকে গ্রাস করে নিতে
তাইত মায়ের বার্ধক্যকে আমরা দু' হাতে সরাতে চাই
সজীব সশ্রদ্ধ ফুলের স্তবকে ভরে দিতে চাই
সারা বিশ্বের মায়ের সফেদ আঁচল—
সমগ্র পৃথিবীর শান্তির ছায়া যেন লুকানো ওখানে
যার তুলনা হয়না কিছুতেই, তবুও বিনম্র উচ্চারণে বলি
আমার মা আমার চোখে নিটোল একটি কবিতা!

মা দুঃখ পাবে

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্

হাঁসেরা মেঘের সাথে উড়ে
নদীর কাছে আসে।
নদীর প্রসাদ ধান্
অঙ্গে সুবাস।
এক ঝাঁক ন্যাংটো বালক
চাপিলার সাথে খেলা করে,
মায়ের আঁচলে রোদ
উঠানে ছড়িয়ে ভেজা ধান।

বন্দুক নামিয়ে ফেলো,
হাঁসকে মেরো না।
মেঘ নিঃসঙ্গ হবে
শিশু নিঃশব্দ হবে
দেশে আকাল হবে
মা দুঃখ পাবে।

মুখোশে ঢাকা জননীর গাথা

সৈয়দ শামসুল হক

কবেকার কথা, এখনো আমার মনে পড়ে তাকে স্পষ্ট—
ছিল সে আমার স্বামী, সখা, নাথ, মধ্যদিনের সূর্য;
প্রতি মরসুমে এনে দিত গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি;
তার উত্তাপে তখন কেবলি হতাম তরুণতর।

সূর্যই ছিল প্রবল বীর্য আমার শরীরে বহমান।
সূর্যই ছিল অবিরাম নদী দুই পর্বত থেকে।
সূর্যই ছিল ঘনবনভাঙা দুর্মর সুঘ্রাণ।
সূর্য আমার গুরুগুরু ঢাক আমনের উৎসবে।

আমি বিনিময়ে দিয়েছি রক্তে তৈরি পুতুল তাকে—
পুত্র আমার রোদ্দুরে লাল গলিত সোনার অনুরূপ।
পুত্র আমার বেয়ে ওঠে ডাল দেহের বৃক্ষে আমারই;
তার দুই গালে চুমো সেতো সেই হৃদয়নাথেরই ঠোঁটে।

যেন অবিকল পিতার দ্বিতীয়, যেন সকালের পূর্বে
ভালো করে কিছু এখনো দেখিনা শুধু উত্তাপ অনুভব,
যেন ধীরে ধীরে দুই চোখ মেলে আমারই ভূগোল পড়ছে।
দিনে দিনে বড় হলো সে আমার বিবাহের লাল ফল।

তুলে নিল কাঁধে তীক্ষ্ণ লাঙল, সাথে নিল জোড়া মোষ,
নৌকোর মতো ডুবে গেল রোদে ফসল তুলবে বলে।
তার পথ চেয়ে আঙিনায় চোখ, কলস রেখেছি পূর্ণ,
এলো সে স্বচ্ছ সন্ধ্যায় ফিরে, কোঁচড়ে কি যেন তার।

আমারই হাতে সে খেলো লাল ভাত, খেলো মিঠে রাঙা আলু।
আমি তাকে ঘুম পাড়ালাম গেয়ে ঘুম পাড়ানিয়া গান।
আধো ঘুমে ছেলে হঠাৎ আমাকে উপহার দিল হাতে—
আঁধারে ছড়ালো দ্যুতি, চেয়ে দেখি মুখোশ সোনায় গড়া।

ভালো করে দেখি, আমারই মুখের অবিকল এক ছবি,
যেন রোদ্দুরে আর্শি হয়েছে হঠাৎ দিঘির জল,
জ্বলজ্বল করে উজ্জ্বল ধাতু, নেই কোনো কুঞ্চন,
আঙুল ছোঁয়ালে মসৃণ মুখ তখুনি ফেরায় স্পর্শ।

আমি হাসলাম, তখুনি সোনার মুখোশ উঠলো হেসে;
আমি কাঁদলাম, তখুনি সোনার মুখোশ উঠলো কেঁদে;
আমি করলাম ভ্রূকুটি, সোনার মুখোশ ভ্রূকুটি করে;
আমি সোনা হলে, একি বিস্ময়, মুখোশ সোনার হয়;

তখন আকাশে সাতটি তারার শাসন মধ্যরাতে—
কম্পিত হাতে পুত্রের দেয়া উপহার পরলাম।
করতালি দিয়ে বলে সে, আমার জননী সোনায় গড়া।
ধীরে ধীরে মুখ অবনত করে রাখলাম তার মুখে।

পুত্র আমার কাজ করে মাঠে, বলে, মা সোনায় রচিত'
মুখের বদলে সোনার মুখোশ করে নেয় অধিকার।
আমি নিশ্বাস নিই সারাদিন মুখোশের ভারতলে—
আমার মুখে যে কঠিন পাষাণ পুত্র কি করে জানবে?

যেদিন গ্রামের নৈঋত কোণে বাজপড়া তালগাছে
দেখা গেল এক অদ্ভুত পাখি আচানক বসে আছে,
দেখা গেল খাঁ খাঁ আল বেয়ে ওড়ে ধুসর চাদর কার,
শুনি পুত্রের কণ্ঠ আমার হঠাৎ শুখানো হাওরে।

ডুবেছে সূর্য, ডুবেছে দৃশ্য, ডুবেছে আপন ছায়া,
যা ছিল আমার ডুবে গেছে সব ধ্বনিহীন ধ্বনিস্রোতে,
পুত্রের পথ জেগে আছি একা তখনো উজাড় গ্রামে—
হঠাৎ দুপুর রাত্তিরে পড়ে দরোজায় করাঘাত।

আবার আমারই বৃক্ষ সে ধরে দাঁড়ালো আহত পায়ে,
দুটি নীল ঠোঁট তারই দেয়া সেই সোনার মুখোশে রেখে
বলল, মা তোর মুখখানি আমি আঁধারেও টের পাই।
জ্বলে জ্বলজ্বল জননী তোমার সোনার রচিত মুখ।

পুত্র আমার জানেনা সোনার মুখোশের তলে আমি
কবে মরে গেছি, এখন সেখানে কঠিন করোটি আর
দুটি চোখে দুই শূন্যগর্ভ বিকারবিহীন চাহনি,
বীভৎস দাঁত যেন পদ্মার হাহাকার ঘেরা পাড়।

যদি ভয় পায়, তাই আমি তাকে দেখাবো না খুলে মুখ;
যদি ভয় পায়, তাই আমি তার কাঁধে হাত রেখে হাসলাম;
জানবে না ছেলে, আমি নই, সেই সোনার মুখোশ হাসে।
আলোয় আঁধারে চিরদিন আমি পরে আছি তার উপহার।

একটি স্নেহের আলিঙ্গনে

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

আমার মায়ের কোনো চিঠি আমি পাইনি জীবনে।
সে-সব স্নেহের কথা নিজেরি নিভৃতে তিনি
সাজিয়ে রাখেন মনে-মনে
সে-সব ফোটেনা কোনো পরিচিত লিপিতে কি
নিবিড় অক্ষরে
নিজেরি ভিতরে
সযত্নে সাজিয়ে রেখে অপেক্ষায় তারো তৃষ্ণাতুর
সজল স্নেহের চোখ কেবলি সুদূর
প্রবাসের দিকে জেগে থাকে
যেখানে আমাকে
চব্বিশ বছর আগে পাঠিয়েছিলেন তিনি
কান্না-ভেজা করুণ-গলায়
জড়িয়ে নিবিড় দুই বাহু দিয়ে 'আয় খোকা আয়
প্রবাসে যাবার আগে তোকে দেখি'
গাঢ় আলিঙ্গনে
স্নেহের চুম্বনে
একদা উজাড় ক'রে দিয়েছেন তিনি তার সম্পন্ন হৃদয়
স্নেহময়
সত্তার ঐশ্বর্য আর প্রাণের গভীর ভালোবাসা
একান্তে হৃদয়ে তার সবুজ তৃণের মতো আশা
বিমুখ প্রান্তরে চোখ মেলে রাখে
রৌদ্রালোকে
প্রশান্ত হাওয়ায়
চাওয়া ও পাওয়ায়
কখনো রাখেনা হাত কোনো তুচ্ছ ব্যবধান
কোনো দুঃখবোধ
বেদনা সন্তাপ-শোক হৃদয়ের ক্রোধ
ওঠে না আগুন হয়ে জ্বলে কোনো চিঠির অক্ষরে
নিজস্ব ভাষায়
পুষ্পিত ইচ্ছা ও সাধ নিজেরি নিভৃতে তিনি
সাজিয়ে রাখেন মনে-মনে
কখনো সাক্ষাতে ফোটে
তার স্নেহ-ভালোবাসা
সকল সন্তাপ-শোক
একটি নিবিড় আলিঙ্গনে।

একাত্তরে, আমার মায়ের জন্যে
ফজল শাহাবুদ্দীন

কতোদিন আমি আর দেখিনা কিছুই
এই আমি হে আমার মা পলাতক কতোদিন

স্বদেশ তোমার কাছ থেকে নিয়েছি বিদায়
সেই কবে
আমি পলাতক কিছুই পারিনা ছুঁতে আর
নদীর জলের রেখা আকাশ বিপুল
গলির মোড়ের সেই চেনা ল্যাম্পপোস্ট
তোমার চোখের মতো নক্ষত্র অযুত
তোমার স্পর্শের মতো হে আমার মা
বৃক্ষের আর ঘাসের সবুজ শরীর লেবু পাতা
রবীন্দ্রসঙ্গীত—
দেখিনা কিছুই পারিনা কিছুই ছুঁতে আর
আমি পলাতক কবে থেকে
একা আমি, যেন এক পুরনো সেতার কিংবা তানপুরা প্রাচীন
বাজিনা কখনো, আমাকে বাজাতে পারেনা কেউ—
আমাদের গ্রাম, সেই বটগাছ, দিঘি
ছোট নদী তিতাসের জল পানকোড়ি
একদা ঘনিষ্ঠ সব বিশাল সঞ্চয় ছিলো যে আমার

এই আমি হে আমার মা পলাতক কতোদিন
আমি আর দেখিনা কিছুই

এখন বাংলাদেশে এই একাত্তরে
জাপান বোমার মতো ক্ষুধা বহ্নিমান
পথে পথে আততায়ী
অরাজক দিন সব আর রাত্রি যত উন্মাদের
ঘাতক সন্ধ্যার কাছে আহত স্বদেশ
বিদ্ধ ঝলসানো আজ হে আমার মা
তোমার শরীর
আর আমি পলাতক
নিষিদ্ধ যোদ্ধার মতো ঘুরে ফিরি সারাদিনমান
অস্ত্রের সন্ধানে
তোমার চোখের জলের কাছে আছে জানি শেষ অস্ত্র
অস্ত্র আছে তোমার মৃত্তিকায়

স্মৃতি

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

ঠাণ্ডা রোদে ভরে গেলে ঘর আশ্বিনের ভোরে
বুঝতে পারি স্নেহের আঁচলে বেঁধে একমুঠো শিউলি তুমি
বসেছো নামাজে; প্রার্থনার ইচ্ছেগুলি
পায়রা হয়ে উড়ে আসছে বাগানে উঠোনে
তুমি আমার জননী।

ফেরার পিপাসা

আল মাহমুদ

ফিরে যেতে সাধ জাগে, যেন ফিরে যাওয়ার পিপাসা
জাগায় সুদূর স্মৃতি : মায়ের আঁচল ধরে টেনে
দেখায় দূরের নদী, ওই তো হাটের নাও মাগো
দক্ষিণা বাতাসে দ্যাখ্ ভেসে যাচ্ছে সমস্ত সোয়ারি :
হরিণ বেড়ের মাঠে পৌঁছে যাব সন্ধ্যার আগেই
এ বেলা ভাসালে নাও রাত অত আঁধার হবে না
আকাশের দিকে দ্যাখ্, কোথায় ঝড়ের দাগ বল?
মিছেমিছি ভয় পাস অনর্থক অশুভ ভাবিস।

বাপের কবরে গিয়ে মোম জ্বেলে কাঁদলে তখন
আমি কি বলবো কিছু? না মা আমি জোনাক পোকায়
আঁঠালো লতায় বেঁধে মালা করে পরবো সুন্দর।
আমি তোর মোট নেবো, তোরঙ্গটা দিস মা আমাকে
হেঁটে হেঁটে পা ফাটালে চটি তোর নিজেই বইবো।
নে তোর পানের বাটা, বোরখা নে গো, মামানীকে বল—
তাহলে এবার আসি দুঃখীদের সংবাদ নিওগো।

বত্রিশ সায়েদাবাদ, ঢাকা—এই বিষণ্ণ দালানে
তেমন জানালা কই যাতে বাঁকা নদী দেখা যায়,
ধবল পালের বুক যেন মার বক্ষের উপমা,
কোথায় সলিলে ভাসে জোয়ারের তাবৎ নায়রী,
দেয়ালের ফ্রেমে রাখা কে দুঃখিনী জলের জলুস
পাথর ফাটানো ধারা সান্ত্বনার শব্দের মতন
তুমি কি জননী সেই, অভাবের আভায় দলিত
বাঙলার মানচিত্র এ ঘরের দেয়ালে রয়েছো?

স্বপ্নের আঘাতে আমি সারারাত ঘুমাতে পারি না
অথচ বালক কালে মা আমার দক্ষিণ বাজুতে
রুপোর মাদুলি তুই বেঁধেছিলি স্বপ্ন না দেখার,
তবু কেন জননী গো খোয়াবের অসুখ সারে না!
সামান্য আবেশ এলে ভেসে যাই নুহের নৌকায়
অথবা উড়াল দিই আশার পাখিটি একা একা
প্রবল হাওয়ার মধ্যে আদিগন্ত শোকের কিনারে
নিঃশব্দে উড়তে থাকি ঢেউয়ে ঢেউয়ে, যদি কোনদিন
আদিম উদ্ভিদ রেখা দেখা দেয় কোমল কৌশিক
দারুণ বালুর বেগ দিগ্বিজয়ী মাটির মহিমা।

মা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

তুমি কি বোঝ
তোমার স্মৃতি পালক ভেবে
সাজাই আমি রোজ,
তোমার দেহ নয়, তা জানি
তুমি কি রাখো খোঁজ?

আমার হল জন্ম, আমি
দেখিনি তোমার দেহ
চেতনালোকে কখন তুমি
ছিলে, তা সন্দেহ;
দেয়ালে নেই তোমার ছবি
বড় শীতল একা তোমার ঘর;
গিয়েছ চলে সে কতকাল
বাঁশের পাতা শোনায় শুধু প্রশান্ত মর্মর।

তবু যখন তোমায় ভাবি,
শুনি তোমার সাদা পাখার ধ্বনি।
এখুনি যেন যাচ্ছ ফেলে
একা বর্ণমণি।

স্মৃতিপালক তোমার দেহ নয়. তা আমি জানি,
তবু তারাই চকিতে যেন
আমার চোখে শরীর সন্ধানী।

সাজালে তারা ভরাবে নাকি
দু'টি পাখার মাঝের শূন্যতাকে
কল্পস্রোতে স্মৃতি আমার
অদেখা এক শরীর হয়ে ডাকে॥

শুধু সেই প্রতিশ্রুতির জন্যে

আসাফ্‌উদ্দৌলাহ্‌

প্রয়াত পিতার স্মরণে
আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম
বছর খানেক আগে।
এক ছুটির দিনে ছাপানো সেই স্মৃতিমুগ্ধ
কবিতা পড়েছিলেন অনেকেই। মা-ও পড়েছিলেন
ক্ষীণ দৃষ্টির ঝাপসা কুয়াশায়
ভীষণ পুরুলেন্সের ঐ-পার থেকে।
মখমলের মতো নরম কপালে অনেক দুশ্চিন্তার
উপহার সেই গভীর ভাঁজগুলো আগ্রহে আরো
গভীর করে মা কতোটুকু পাঠোদ্ধার করেছিলেন
আমি কি করে বুঝবো?

এর ক'দিন পরেই
মা যেন ছোট্ট মেয়ে। একটু আড়ালে নিয়ে
বললেন ঃ "তোর বাপ মরে গেলে যেমন একখানা
কবিতা লিখেছিলি, আমি মরে গেলে অমন
একখানা কবিতা লিখবি তো আমার উপর?"
হো-হো করে উঠেছিলাম হেসে। আরো
কাছে এসে মা বললেন ঃ "মরে গেলে তো আর
পড়তে পারবো না। আমি থাকতেই লিখে রাখ্ না।
বাপেরটার চেয়ে খারাপ না হয় যেন।"
মা তখনই অসুস্থ বেশ। এর ক'দিন পরেই একদিন
সকাল হবার সাথেই মা যে কোথায় চলে গেলেন.......

এখনো অবিশ্বাস ডানা ঝাপটায়। মনে হয় ক'দিনের জন্য
আমাদের উপর ক্ষীণায়ু অসন্তোষে বেড়াতে গেছেন
নানার বাড়ি। এসে যাবেন কাল সন্ধ্যা
হবার আগেই; যখন ঘরে ঢুকেই দেখবো
টান্-টান্ সাদা বিছানা। দুধের বাটিতে খই।
কলমির শাকে কী দারুণ স্বাদ। ঝাঁঝালো দুপুরে
ঘরে ফিরে সেরকায় ভেজানো পেঁয়াজ।

গ্রীষ্মের ভ্যাপসা রাতে হাতপাখায় সেই
অন্তরঙ্গ তাল আর নির্ভুল লয়।

পিতা যেন সূর্যোদয়ের অহংকার, আঘাতের
শাণিত অস্ত্র, আক্রমণের প্রস্তুতি।
পিতা বুদ্ধি, সংগ্রাম, সাহস—
পিতা উড়ন্ত পাখির নীল পথের অস্থির প্রয়াসী ডানা,
পিতা সাফল্যের ফুলের তোড়া, উষ্ণ পদক,
পিতা হ্রেষারবা অশ্বের ধুলো
পিতা বিদ্যা, শাসন, গৌরব
পিতা শব্দের উৎস, গতির আয়োজন,
পিতা নৌকোর গলুইয়ে জোয়ারের ঢেউ,
পিতা মাথার উষ্ণীষ,
পিতা পৃথিবীর সব সূর্যালোক।

মা যেন সূর্যাস্তের অলঙ্কার, আয়াতভরা রক্ষাকবজ
মা যেন মায়া, দুর্বলচিত্ততা
মা যেন দেবদারুর ঘন নিশ্চুপ নিশ্চিন্ত পাখির নীড়
মা যেন ব্যর্থতার ঝরাফুল, গভীর কোনো গোপন বেদনা
মা যেন টিনের চালে শ্রাবণের গান
মা জ্ঞান, প্রশ্রয়, পরাজয়,
মা বরফগলা নদী, বিশ্রামের আয়োজন
মা ভাটার টানে ডুবতে যাওয়ার শখ
মা যেন খালি গায়ের গামছা
মা যেন মেঘে ঢাকা ইতস্ততঃ লুকোচুরির
ক্ষীণ চন্দ্রালোক।

পিতা গেলে ঘর যায়, যায় ঠিকানা
ধসে যায় মাথার উপরের ছাদ
আর পড়ে যায় সীমানার শক্ত দেয়াল।
মা গেলে জমি যায়, ভিটা যায়
মা গেলে গাছ মরে যায়।
পিতার মৃত্যু হ'লে কাঁদা যায়
কবিতাও লেখা যায় কখনো কখনো;
মা মরে গেলে কবিতার চেয়ে, কান্নার চেয়ে
অনেক অনেক কঠিন কাজ করা যায়। কিন্তু

কবিতা লেখা যায় না···
কান্না এলে গান গাওয়া যায় না যেমন।

আমার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও
তোমার উপর কিছুই লেখা সম্ভব নয়, মা।
দু'হাতের শ্রম দিয়ে গড়া তোমার টিনের
তাজমহল একেবারে শূন্য এখন। তোমার গায়ের
গন্ধ আমার গায়ে, সারা বাড়ির অনুপুঙ্খে।
গাছগুলো ছিলো আমাদের মতো তোমার সন্তান
তারা কথা বলতো তোমার সাথে। গরু দুধ দিত
বালতি ভরে তুমি ওদের পাশে গিয়ে একটু দাঁড়ালে।
এখন ব্যস্ততা নেই। কেউ নেই প্রতীক্ষায়
বাড়ির চৌকাঠে। একটি অক্ষরের সেই বিশেষ শব্দ
আর উচ্চারিত হবে না আমার মুখে। যে নামে
ডাকা যায় না কাউকে কোনদিন আর। এমনি আর
একটি শব্দ নিঃশব্দ হয়ে গেছে জীবন থেকে দু'বছর
আগে।
এমনি করে শব্দের পর শব্দ নিঃশব্দ হয়ে যায়।

এমনি করেই অনেক সাধে
আমরা যা কিছু নির্মাণ করি, সেগুলো
একে একে বিধ্বস্ত হয়। সন্তান স্বার্থপর হয়;
বন্ধুকে আবিষ্কার করি
সুবিধাবাদীর দীর্ঘ সারিতে। সেই কবেই তো
দৃষ্টি ছেড়েছে চোখ, গতি ছেড়েছে দেহ
ভালবাসা উধাও চৈতন্য থেকে।
যে ফুঁ আগুন জ্বালায়, সেই ফুঁ-ই
নিভিয়ে দেয় ঘরের আলো। এক ফুঁ-তে
জ্বলে ওঠে চুলোর আগুন, অন্য ফুঁ-য়ে
নিভে যায় সলতের শিখা। মধ্যবর্তী
আরেকটি একাগ্র ফুঁ-তে বেজেছিলো
ধূসর বাঁশি।

তুমি ছিলে পৃথিবীর একমাত্র আদালত
যেখানে বিচারের আগেই
আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নির্দোষ।

তুমি আছো মা গো
আবু বকর সিদ্দিক

ট্রেঞ্চে উচ্চকিত রাত। শেল ফাটে কানে।
জারজ মেশিনগান কুলটা মর্টার।
"চার্জ দেম!"—শহিদের থ্যাঁতলানো লাশ;
বাতাসে অন্তিম শ্বাস : মা—মা গো.........

মাটির চাপড়া গালে;—মা গো! তুমি আছো!

চড়া দামে কেনা এই দামি জন্মধন
সস্তায় বিকিয়ে দেয় কুসন্তান; আর
জলপাইরঙা সাঁজোয়া বহর কী যে
পাঁয়তারায় ধর্ষণ করে জনপদ!

অপত্যবিকার একি? মা গো! তুমি আছো?

পাঁজরের বাম পাশে স্পন্দিত তুমিই!
আকাশের অনন্ত ছাড়িয়ে শুধু তুমি!
নীল ঢেউ সাদা ফেনা জন্মমৃত্যু তুমি!
প্লাবনের জ্বরে তুমি নিরাময় স্পর্শ!

দুধক্ষীর ক্ষীরনদী! তুমি আছো মা গো!

কৌটোর ইচ্ছেগুলো

জিয়া হায়দার

তুই একবার কাছে আয়, বোস্ এখানে, কপালে
হাতটা রাখ্, দ্যাখ্ কি যে ঝাঁ ঝাঁ জ্বরে
গা পুড়ছে। বিষ্টি হয়না ক'দিন,
তায় গুমোট গরম; বুকে তুই কান পেতে দে, তাহলে
শুনতে পাবি, কদ্দিন বিষ্টির দেখা নেই;
রেহেলে কোরাণ পাক, পানবাটা, পিঁড়ি,
আর যেন কি কি সম্পত্তি আমার
তুলে রাখবি কিন্তু সেই সব ভালো করে;

সামনের বছর, কিংবা তার পরের বছর, কিংবা তারো পরে
একদিন না একদিন খুব বিষ্টি হবে,
সে বিষ্টিতে দোরগোড়ায় যে ফুলগাছটা; তাতে ফুল ফুটলে—

জানিস, তখন আমি বারো বছরের,
সংসারের বড়ো বউ, নিজ হাতে লাগিয়েছিলাম,
কিন্তু ফুল দেয়নি কোনো সকালেই;
তা সেই বিষ্টির পর ভোরে ফুল ফুটলে তুই
আমার কবরে রেখে আসবি, শিয়রের দিকে;

সে সময় খুব ফসল উঠবে, ইচ্ছেমতো গান করিস, দোহারে
ধুয়ো ধরিস, বাঁশির গান,
আর সে সময়ই কিন্তু আমার ছোট্কুর বিয়ে দিবি,
নতুন বউমাকে বলবি নিজহাতে উঠোনটা নিকোতে,
তারপর উঠোনে, দাওয়ায় আলপনা কাটতে,
তা'তে যেন অবশ্যই ধানশীষ আর পায়রা থাকে;

ওই যে বললাম, কোরাণশরীফ, পানবাটা,
এগুলো বউমাকে দিবি;

মা হাসলেন, নিবন্ত প্রদীপ হঠাৎ জোরালো যেন,
এ জন্যেই তুলে রাখতে বলছি ওগুলো;

আর শোন্, এতোক্ষণ বলাই হয়নি,
আমার মাথার নীচে একটা কৌটো আছে,

সেটাও বউমাকে দিবি;
জানিস ওতে কী আছে,
আমার কয়েকটুকরো ইচ্ছে—
ফুল, বিষ্টি, পায়রা, ধানশীষ, গান;
ইচ্ছেগুলো কৌটোর ঢাকনা খুলে বেরোতে পারেনি কোনোদিন,
তোর হাতে, না, তোর না, তুই, তোরা বড়ো অলক্ষুনে,
পয়মন্ত বউমার হাতে পড়ে' দেখিস একদিন
ইচ্ছেগুলো বেরোবেই ঠিক, রং বেরঙের প্রজাপতি হয়ে,
সারা বাড়ি, ঘরময় ঘুরবে, উড়ে উড়ে আরো, আরো
নতুন ইচ্ছের রেশম বানাবে,
তখন আমার নামে একটা মিলাদ দিস;

তুই কিছু বল্ এখন, যা মনে ধরে বল্;
আরো অনেক, অনেক দিন আমাদের মাটিতে
বিষ্টি হবে না, ফুটবে না ফুলও;
কেন, আমি তা জানি না,
আমরা কেউ নয়, কেউ-ই জানি না—

মাকে একথাটা বলবো কি বলবো না;
অসহায় বিহ্বল সংকোচ
বলবো কি বলবো না!

মা

দিলওয়ার

কোলে নিয়ে
দোল দিয়ে
বলেছিলো মা—
'চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।'

বলেছিলো সেই কবে
দুধে ধোয়া শৈশবে—না?
আ!

জান্‌লাম মা-র কাছে
আমি এক রাজপুত
মানুষের দরবারে
জীবনের রাজদূত,
প্রকৃতি বলেছিলো—বাঃ!

তারপর ধীরে ধীরে ফুট্‌লাম
অবনী আঁধার চিরে ফুট্‌লাম
ঘূরন্ত গ্রহের সাথে ছুট্‌লাম,

ছুট্‌লাম দূর মহাশূন্যে
শৈশবে দেওয়া মা-র পুণ্যে,
চাঁদে গিয়ে রাখ্‌লাম পা
থর থর কাঁপে সারা গা
চাঁদের কপালে একী
বিশ্বের মা!!
আ!

কোকিল নিয়তি

বেলাল চৌধুরী

কোকিল নিয়তি থেকে কোথায় পালাবে তুমি, দেখি—
যেখানেই যাও, যতদুরই যাওনা কেন
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এই কোকিল-নিয়তি থেকে, কিছুতেই
আর নিষ্কৃতি নেই তোমার—অথচ পথ তো কম ভাঙলে না।

যত কান্না তোমার, সে তো শুধু মায়েরই জন্য,
যে মা তোমাকে বৈশাখী রাতের দুঃসহ
নিস্তব্ধতায় আবৃত জগতে সংসারে
একা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল.........

সহোদর প্রতিম বসন্ত সখা হে ভাই কোকিল
তোমার নিঃসঙ্গতায় সবটুকু আজ ঢেলে দাও,
যতটুকু পারো এই বৈশাখী নিশীথে
আকাশের যত তারা আর সোদরপ্রতিম মাতৃহারাদের প্রতি।

তোমার মতন এমন সুচারু শব্দাংশ আর কার আছে,
আর থাকলেও তাদের নিঃসঙ্গ দুর্দশার কথা কে আর স্মরণে আনে
মূক হয়েও মুখর হবার মতো এমন আকুতি কেউ কি দেখছে?
হে ভয়ঙ্কর নৈঃসঙ্গ্যের পাখি, কাঁদো,
কাঁদো তবে, হে ভাই কোকিল কাঁদো প্রাণ ভরে,
যত পারো কেঁদে কেঁদে ভাসাও বুক, কবিদের বানাও বোকা,
হে নৈঃসঙ্গ্যের পাখি, কাঁদো, কাঁদো—

আমার মা

খালেদা এদিব চৌধুরী

হে আমার আজন্ম প্রিয়তম মা—মাগো
আমার চৈতন্যে জাগ্রত এক সত্তার মতো
তুমি চির অনুভবের এক উজ্জ্বল দ্যুতি।
যদি অই আকাশের একটি নক্ষত্র তোমাকে মনে করি
তবে এই শান্তিই আমার প্রসন্ন বিশ্বাস—
আমার জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা
সমস্ত অহংকার এবং গৌরব
কেবল তোমার স্পর্শে মহীয়ান
আমার জীবন—পূর্ণতা
তোমার সত্তার উপকরণে নির্মিত—
শুধু তোমার ঋণে আমার সমস্ত দায়ভিক্ষা মা।
আজ তুমি নেই,
গোলাপের একটি কুঁড়ির মতো
স্নেহময় মুখ তুলে তাকাবেনা কোনোদিন আর
অলৌকিক এক পাখি হয়ে তুমি সুদূর নীলিমায় বিলীন—

হে আমার মা, আজন্ম প্রিয়তম মা
আজ এটুকুই আমার প্রার্থনা—
তুমি বারবার নক্ষত্রের আলো হয়ে
শুধু আলোকিত করো আমার ভুবন,
তোমার স্বর্গীয় আত্মার সৌরভে
বিমোহিত হোক আমার সমস্ত জীবন।

মায়ের কাছে

ওমর আলী

দু'বছর আগেও এখানে কিন্তু 'মা' শব্দ এসে পৌঁছেনি
আর এখন দেয়ালের ও-পাশে গেলেও—চোখের আড়াল হলে
আষাঢ়ে বৃষ্টিতে নিয়ামতপুর ভেজে কিংবা পানির ঝাপসায়
চোখ কেঁদে ওঠে.....
দু'বছর আগেও এখানে কিন্তু নববধূ সেতারা বেগম...
আর এখন দেয়ালের ওপাশে গেলেও—মা কই? মা কই?
লাজুক ঘোমটার নীচে অমলিন নত ফুল তাই
বেঁচে থাক মা তোর সমস্ত ঘর আলো হয়ে উঠুক আঁধারে
আলো হয়ে উঠেছে দেয়াল ভেঙে শব্দ পৌঁছালো—
মা কই রে? মা কোথায় গেলো?
সেজন্যেই সেতারা বেগম কিন্তু বুকে চেপে ধরেছে সমস্ত
সাদা আলো
যেখানে শহর শেষ সেখানেই ছই ঢাকা গরুর গাড়িতে
উঠতে হয় মা আরো দেখতে দেখতে যাওয়া যায় কাঁচা রাস্তার
দু'পাশে নাজিরপুর শানিরদিয়ার আরো এগোলেও
বাগুন্দা বাথানপাড়া....
কতকাল পরে এই যাওয়া হচ্ছে...সেতারা, যা মা—
মাগো হেলঞ্চ শাক সামান্য তেলেই খেতে সত্যি সুস্বাদ
সেতারা যা মা দুটো কচু শাক নুন খুঁড়ো তেলাকচুর পাতা
তুলে আন তো মা
আলো চাল বাঁটা আর গুঁড়ো চিংড়িতে
ঘাঁটলে মধুর মতো লাগে...
পথে আর ব্যারিকেড নেই হবে না মাথার খুলি আর ভয়ংকর
মাতৃভাষার কাছে চলে যাওয়া এখন সহজ—
হয়তো সোনার মতো খেতভরা ফুটে আছে কোথাও
সামান্য কাদাপানি
গরুর গাড়ির চাকা ডুবে যেতে পারে
কোমল স্নেহের মতো পানির শব্দ হতে পারে
মনে হয় খড়ের পালার কাছে দেউড়ি পর্যন্ত থেমে যেতে
বেলা চলে যাবে
মনে পড়ে পেট ব্যথা সামান্য গা-গরম হলে রোদে পোড়া
গাছের চেহারা
কতোকাল পরে মাতৃভাষার কাছে যাওয়া
ফিরছে বশির মাসুদা খাতুন সেতারা বেগম জাহানারা
আমরা চারদিক থেকে ডেকে উঠবো মা কোথায়, মা?

সুগন্ধ

মনজুরে মওলা

আপনার সন্তান ছিলো পাঁচ—পাঁচজন,
ইতিহাস থেকে সে-কথাই, আম্মা, আমরা জেনেছি।
ইতিহাস বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করতে ভালোবাসে,
তাদের মধ্যে চার-চারজনই কখন এবং কিভাবে
অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তার সন্ধান মেলে না।

ইতিহাস বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করে,
মানুষ বিষয়কে দীর্ঘ ক'রে ধ'রে রাখতে চায়।
অদৃশ্য চারজন আপনার ধমনীতে
কতটুকু জায়গা ক'রে নেয়, জীববিজ্ঞান তা
বলতে পারে না। হৃৎপিণ্ড থেকে
লাল বল নিয়ে খেলতে-খেলতে তারা
পায়ের পাতার দিকে ছুটে যায়, আবার
হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। লাল কণায় সাদা কণায়
তাদের হাসির শব্দ জেগে উঠতে থাকে।

জীববিজ্ঞান ও ইতিহাস তাদের উদাসীনতায়
আপনাকে কতটুকু ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে,
আপনি, আম্মা, সে-কথা কখনো বলেন না।
আপনার কি ইচ্ছে করে পৃথিবীর সমস্ত
সি-ডি, ক্যাসেট ও এল-পি থেকে সব ধ্বনি
মছে ফেলে দিতে?
আপনার কি ইচ্ছে করে ফুল, টাকা তৈরির যন্ত্র
ও টাকার মতো
একবারও ফিরে না তাকাতে মানুষের দিকে?
আপনার কি ইচ্ছে করে প্রতিটি গাছের প্রতিটি পাতায়
একটি ক'রে পাতা-খাওয়া পোকা ছেড়ে দিতে?
মানুষের দুঃখকে দুঃখ ব'লে না মানতে,
মানুষের আনন্দকে আনন্দ না ভাবতে,

মানুষকে কেবল অভিধানে বন্দী-হ'য়ে-থাকা
শব্দ মনে করতে?

এ সবের কিছুই আপনি করেছেন বা করতে চেয়েছেন,
এমন আমাদের জানা নেই।
পাঁচজনের মধ্যে যে-একজন
অদৃশ্য হ'তে-হ'তেও অদৃশ্য হয়নি,
তার মুখের দিকে আপনি তাকিয়ে থাকেন দিন-রাত,
একবারও পলক পড়ে না,
যেন চাঁদ কিংবা তার কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে
নীলাভ পৃথিবীর দিকে আপনি তাকিয়ে রয়েছেন।
আপনার ভেতর থেকে সুগন্ধ বেরিয়ে
তখন আমাকে ঘিরে ফেলে॥

তোর কপালে দুঃখ আছে
ফজল-এ-খোদা

মা বলতেন
খোকা, তুই বড়ো বেশি কথা বলিস
তোর কপালে দুঃখ আছে।

আমার এ এক দোষ আমি বড়ো বেশি কথা বলি
আমি বলি, কথা দিয়ে কখনো কি কথা রাখা যায়
নাকি কোনো দিন রাখা গেছে!
কথা দেয়া যায় কথা তো যায় না রাখা
আমার এ এক দোষ আমি বড়ো বেশি কথা বলি।

ফড়িঙের পিছু পিছু যখন ছুটেছি অকারণ
সারাদিনই নদীর জলে কাটতো সারা বেলা
বাটুল চাঙার হাতে ঝোপঝাড়ে দুপুর গড়াতো
সে বয়সে আমি কত কথাই না বলতাম—
মা, তোমায় বড়ো হলে লাল পেড়ে ডুরে শাড়ি এনে দেবো
সোনার কাঁকন কানপাশা নাকফুল,
আরো অনেক কিছু এনে দেবো দেখে নিও;
মাকে দেয়া সেই কথা আজো রাখতে পারিনি আমি
আমার এ এক দোষ আমি বড়ো বেশি কথা বলি।

মা বলতেন
খোকা, তুই বড়ো বেশি কথা বলিস
তোর কপালে দুঃখ আছে।

মনে পড়ে সেই ঘুড়ি ওড়াবার কথা
ছোটো ভাই মতির হাতের ঘুড়ি
কেটে গিয়েছিলো বলে সে কী কান্না
কিছুতেই যায় না থামানো তারে
শেষে কথা দিতে হলো লাল নীল সাদা
রকম রকম ঘুড়ি কিনে দেবো বড়ো হলে;
এখন সবুজ অনুজকে কথা দেয় যেমন সহজে

বড়ো হলে মারবেল এনে দেবে হাজার হাজার,
মতিকে দেয়া সেই কথাও আমি রাখতে পারিনি
আমার এ এক দোষ আমি বড়ো বেশি কথা বলি।

মা বলেন, আমি আরো অনেক রকম কথা বলতাম!
হয়তো জাহানারার মনে আছে
শিউলি তলায় বৌ বৌ খেলা ছলে
ওকে কথা দিয়ে ফেলি—
ওর পুতুল বিয়েতে অনেক বাজনা এনে দেবো
মিনির মামার মতো বড়ো হলে,
যেমন পাশের বাড়ি এনেছিলো রমার বিয়েতে!
এখন জাহানারার মেয়ে রানী রোজী রঞ্জনাকে
আমার মতন কেউ কথা দিচ্ছে,
বাজনা আনবে তাদেরও পুতুলের বিয়ে দিতে;
জাহানকে দেয়া সে কথাও রাখতে পারিনি আমি।

মা বলতেন
খোকা, তুই বড়ো বেশি কথা বলিস
তোর কপালে দুঃখ আছে।

মনে আছে ঠিক বিয়ের প্রথম রাতে
কথা দিয়েছিলাম সুন্দরী নববধূ সুমনা মাহমুদাকে
সে ছাড়া কারোর কথা মনে আনবো না
কখনো কারোর চোখে চোখ রাখবো না
আর কারো প্রেমে ভুলেও কখনো হবো না মলিন;
সব গেছে, সব কথা গেছে...
আমার এ এক দোষ আমি বড়ো বেশি কথা বলি
কথায় কথায় শুধু কথা দিয়ে ফেলি।

মা বলতেন
খোকা, তুই বড়ো বেশি কথা বলিস
তোর কপালে দুঃখ আছে।

ধমনী-দোলার মত

অরুণাভ সরকার

যা-কিছু সহজ তাও ভুল হতে পারে। মাঝে-মধ্যে
মনেই পড়ে না
আজ কোন বার, কোন দিকে
হেঁটে যাচ্ছি, কোন্‌খানে
বৃষ্টিপাত
সব থেকে বেশি
কোন নদী দীর্ঘ সব থেকে; এমন কি
সাত-সাতে ঠিক কত, তা-ও ভুল হয়
ভুল হয় পরিচিত শব্দের বানান:
কেবল তোমারই নাম
সারাক্ষণ মনে থাকে
ধমনী-দোলার মত অনিবার্য, বিরতিবিহীন।

কেবল আমার দুঃখিনী মা

মোফাজ্জল করিম

কী করে ভাবলে আমার বর্ণমালা শেখা হয়ে গেছে?
এখনো তোমার সঙ্গে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে
অনেক তর্ক আছে বাকি। চিরকাল যার ওপর
অভিমান করা যায় এমন কাউকে আমার চাই
একথা তুমিই জানো, তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।
জীবন চাবুক হাতে অহর্নিশ তাড়া করে এলে
তোমার আঁচলে তুমি আমাকে আড়াল করে রাখো
আমার সকল লজ্জা তোমার কোমল হাতে ঢাকো
এই তো নিয়ম ছিলো। তুমি সেই বিচারের স্থান
যেখানে নালিশ করে জানতাম জিতে যাবো ঠিকই।
হঠাৎ ছুটির ঘণ্টা অবহেলায় বাজালে যখন
কোথায় আসামী যাবে বলে দাও। জীবন পুলিশ
হয়ে আমাকেই যদি অহেতুক করে নির্যাতন
কোথায় পালাবো বলো? কী খেতে ভালবাসি সে শুধু
তুমিই জানো তুমিই খাওয়াতে পারো সোনা বাবা বলে
তুমি যে কী মা তোমাকে ছাড়া বলো এক দণ্ড চলে?

তোমার চাওয়ার কিছু নেই শুধু তুমি নিজেকেই
বিলিয়ে দেবে যেমন রজনীগন্ধা অলক্ষ্যে সারারাত
বিলিয়ে সৌরভ ঝরে যায় অথবা অন্ধকারে
দীপশিখা জ্বলে জ্বলে নিভে যায়—এই ছিলে তুমি,
তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে গরিব আতুর
কিংবা তোমার সন্তান ঘুমিয়েছে পরম আয়েশে
যখন তোমার রাত প্রার্থনায় নিমগ্ন নামাজে।

কী আশ্চর্য দ্রুততায় তোমাকে এলাম রেখে পৃথিবীর
আলো থেকে বহু দূরে অন্য এক আলোর ভুবনে
যখন ধূসর মেঘে অকস্মাৎ সূর্যহীন চরাচরে
যুঁই ফুল বৃষ্টি ঝরে, চুপি চুপি অশ্রু কার ঝরে।
যেভাবে মানুষ গুপ্তধন লুকিয়ে রাখে মাটির তলায়

আমরাও তেমনি তোমাকে সেদিন কবরের নিস্তব্ধতায়
শুইয়ে দিলাম, বললাম, মিন্‌হা খালাকৃনাকুম
অ-ফিহা নুয়িদুকুম। মা তুমি মৃণ্ময়ী তাই
মাটির কাছেই তুমি অবশেষে ফিরে গেলে চলে
যেমন একদিন আমরাও ফিরে যাবো মৃত্তিকার কোলে।

জ্বরে গা'টা পুড়ে যাচ্ছে, চোখ মেলে দেখি না তোমাকে,
কখনো দেখবো না আর সজল নয়ন, কখনো আমার সুখে
সুখী হয়ে হাসবে না কেউ ত্রিভুবন আলো করা হাসি।

কোটি কোটি মানুষের বাসভূমি পৃথিবীটা এই
এখানে সবাই আছে, কেবল আমার দুঃখিনী
মা-টাই নেই।

মা তোমার ছেলে আজ কবি

সিকদার আমিনুল হক

অক্ষরবৃত্তের চেয়ে সহজেই যাঁর কাছে যাই
আর গেলে গন্ধ পাই যাঁর বুকে, অনন্ত বিশ্রাম—
তাঁকে কিন্তু শান্তি নয়, দীর্ঘকাল কষ্ট দিয়ে গেছি!
—বৃষ্টি ভিজে চলো বাড়ি; রাত্রিবেলা চেষ্টাকৃত জ্বরে
মা-কে রাখতাম ব্যস্ত! খেলা ছিলো এটা! কষ্ট দাও!
ওটা তাঁর প্রিয় থালা, অতএব চূর্ণ করো একে! ....
ক্ষুধা নেই, তবু বলতাম, ভাত; —না হ'লে চল্‌লাম...
মা যে! উচ্চস্বরে কষ্ট দাও। বজ্জাতির ভারে

ভালোবাসা শক্ত হ'তো। এক সত্তা। ভিন্ন কিছু নয়।
ধাক্কা দিলে দু'লে ওঠে। ফেল করতাম, দোষ মা-র
যেন তিনি চাঁদ জ্যোৎস্না, সব কিছু, বাবার ধারণা—
আর বকুনির মুগ্ধ কান্না দেখে শুধু চাইতাম
যেন কদমাক্ত হই, প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে যাক;
আজ রাতে বৃষ্টি হোক,...চুল-গন্ধ সারারাত্রি পাই!
আমার ভ্রমণ তুমি,—পাহাড়, সমুদ্র কিছু নয়;
গ্রিসের প্রসিদ্ধ জ্যোৎস্না, তাও নয়; প্রিয় কেন্দ্র তুমি!

তুমি জানো কিছু নেই; তোমার বয়স্ক ছেলে আজও
দয়ার ওপরে বাঁচে! উপেক্ষিত; শত্রু চারিদিকে।
ফ্ল্যাট নেই, পা'য়ে হাঁটে, তবু তার পরিত্রাণ নেই;
বুকের ভেতরে রোগ, আজ আছে, কালই বুঝি ঝরে!
জীবিকাও চলে গেছে বহুদিন হ'লো, কিন্তু মা গো
যেই শোনো বহুতল বাড়ি হয় স্টেনোদের; তুমি হাসো,
বউকে গণিকা ক'রে কারখানা, কত কিছু হয়;
কিন্তু কবি হয় শুধু, ছন্নছাড়া, তোমার ছেলেই!

নিদ্রিতা
হায়াৎ সাইফ

হেতম খাঁর শীতল জমিনে আমার মা এখন ঘুমোচ্ছেন।
তালাইমারি থেকে প্রেমতলি বোসপাড়া থেকে সিরোইল
শুনি এখন প্রায় দশ লক্ষ মানুষের বসবাস।
কিন্তু আমার মাকে আর কখনো দেখিনা।
তিনি এখন আমার মনের ভেতরে স্মৃতির ভেতরে
অধিষ্ঠিত আমারি মানসে গড়া এক অনন্য প্রতিমা।

যেমন বরেন্দ্র-প্রসূত এই জনপদ আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসের
অপম্রিয়মান স্মৃতির ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা
একটি ধারণা। এখনো কায়াময়। এবং
আপাতত কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এখানে
যূথবদ্ধ এসেছে মানুষ। আদিবাসী
কবেই ঘেঁষেছে কোণে ম্রিয়মাণ।
পারস্যের কবি হাফিজ "রূপসী বাংলায় আনা
পারসি মিঠাইয়ে"র কথা বলেছিলেন।
এক পরিব্রাজক জানিয়েছিলেন যে,
এ মাটিতে আসার অনেক পথ খোলা
কিন্তু বেরোবার সব পথ বন্ধ।
এমন চুম্বক নাকি এ মাটির গহীন গভীরে।

অথচ আমরা দেখেছি যে, যায় সবই চলে যায়
রাজা রাজ্যপাট পরিব্রাজক দরবেশ শ্রমিক মানুষ।
কেবল চিরস্থায়ী থেকে যায় মাটি মাঠ মানুষের শ্রম
হা-হা পদ্মা পরিব্যাপ্ত বরেন্দ্র। প্রকৃতি তবুও থাকে
মানুষেরা চলে যায় মানুষেরই অবশ্যম্ভাবী
চলে যেতে হয়। কায়া চলে যায়।

আমার পেছনে থাকে আমারি বিমূঢ় ছায়া
স্মৃতি সঙ্গ অনুভব মন্দ্রিত জনপদে ঘোরে।
মানুষেরা চলে যায় যেমন গেছেন মাতা।

জনপদ থাকে। মাটি থেকে যায়।
স্মৃতি থাকে মাটির গভীরে।
শূন্যের দেউলে থাকে প্রতিমার কায়া।

আমার বুকেও থাকে পঞ্চাশের ছলচ্ছল
সত্তরের মানুষের ঢল তরুণের বজ্রমুষ্ঠি।
এখন কি সমস্তই স্মৃতির শিশির হয়ে ঝরবে টুপটাপ
শেষ অঘ্রাণের প্রত্যুষ-প্রদোষে নিভৃত কুয়াশা?

মা চাইতেন সন্তানেরা সুখে থাক। থাক দুধে ভাতে
মা তো নিদ্রিতা এখন। আর আমার চতুর্দিকে বিপর্যস্ত বরেন্দ্র ঘুমায়।

আম্মা

আবদুল মান্নান সৈয়দ

তোমার পায়ের নীচে পড়ে আছে বেহেশত নীরবে—
মাটির বেহেশত। মুঠো-মুঠো মাটির হিরায়
স্বপ্নে, অর্ধালোকে জীবনের সব ক্লান্তি আরামে জিরায়।
তোমার আহ্বানে যে-শিশু এসেছিলাম একদিন পৃথিবীতে কবে,
আবার কমলা ভোর, শ্রাবণের মেঘ, ফলশা-মাখা বেগনি ঘাসের
শৈশবে ফিরিয়ে নেয়,
কৈশোরের বাহুবন্ধে, খেলা-শেষে ফেরা সন্ধ্যায়
তোমার আহ্বানে এই ধ্বস্ত শতাব্দীর নীড়
শেষ শুদ্ধতম বিশ্বাসের।

আম্মা শব্দে মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠে ঘাস।
আম্মা শব্দে ভরে ওঠে অফুরান নক্ষত্রে আকাশ।
আম্মা শব্দে দিবালোক পাতাল অবধি চলে যায়।
আম্মা শব্দে অন্ধ রাত্রি জ্বলে ওঠে বারেক আভায়।
আম্মা শব্দে নিভে যায় হাবিয়া দোজোখ।
আম্মা শব্দে বেহেশত থেকে মর্ত্যে নামে অমল আলোক॥

অনন্ত প্রতিমা

আল মুজাহিদী

মা
তুমি আমার জন্মের পর থেকে আমাকে কেবল আকাশ দেখাতে
প্রগাঢ় ভালোবাসায় এ চান্দ্রবীথির তারাফুল তুলে দিতে
মনের মুকুরে, কতো ফুট্‌তো স্মৃতির স্বর্ণ চাঁপা।
মা
তোমার হৃদয়-ভূমে অসংখ্য উজ্জ্বল আগামী পৃথিবী : নক্ষত্র-নেবুলা
নিসর্গের নিকট কুটুম হয়ে নেমে আসে মাছরাঙা পাখির ঠোঁটের মতো
এক রুপোলি উঠোন। তবু স্বপ্নেরা ভাঙে না চিত্রার্পিত তুমুল প্রহর।
মা
মানবজাতির প্রাচীন চাতালে জাগে নবতর জন্মরেখা। এই ভিটেমাটি,
বাস্তুভূমে নক্ষত্রেরা কেঁদে কেঁদে ফেরে—
জোনাকের স্তূপের ভেতর জেগে থাকে, আহা, সুপ্রাচীন সমতট-হরিকেল আমার স্বদেশ।
মা
তোমার চোখের পাতায় জেগে থাকা হাজার হাজার বছরের
হিজল-তমাল কাঁঠালি চাঁপার মতো সৌগন্ধময় বাংলাদেশ;
আমি এই জন্মভূমে সুবিনীত তোমার সন্তান।
আমি করতলে তুলে নেবো চিরকাল
তোমার মৃত্তিকা এ অতি মৃত্তিকা।
জন্ম মৃত্যু এ-জাতিসত্তার প্রজ্জ্বল আগুন ও অঙ্গার জ্বলে ওঠে
ফিনিক্সের ডানার নীচের ভস্মস্তূপে।
মা
আমার জন্মের পর থেকে তুমি আমাকে কেবল আকাশ দেখাতে
আর করতলে তুলে দিতে সোনালি মৃত্তিকা।
আমি এই মাটি তুলে নিই প্রাণের কন্দরে। উদার প্রান্তরে
এক মায়াবী প্রহর জ্বলে ওঠে যেন কোনো শাশ্বতের সৌরবিভা।
মা
তুমি তাপসী রাবেয়া বসরীর মতো ধ্যানমৌনী একা একা
অলৌকিক তসবির দানা টিপে টিপে 'সুমহান কারুর' নৈকট্য থেকে
পৃথিবীর বুকে উৎকীর্ণ কারো আমার কল্যাণ।
মা
আমি আর অনন্তের কাছে যাই না এখন।
তুমি-ই আমার অস্তিত্বে আনন্ত্যের স্মৃতিগাথা : অনশ্বর।
মা
তুমি আমার অস্তিত্বে এক অবিনাশী ছায়া-স্বর্গমর্ত্য কিংবা
অন্তরীক্ষ অতিরেক। তুমি আমার 'অনন্ত-প্রতিমা'
সান্দ্র স্নিগ্ধ বিশ্বলোক, অনিঃশেষ।

ব্রহ্মাণ্ডের মৌল গ্রহদূত

রবিউল হুসাইন

পাথরের দেশে উঁচু ওই হিমালয় পাহাড়।
সবুজ গ্রামের মধ্যে জল-কুম্-কুম্ নদী,
একটি গানের ভেতর মগ্ন সুরের সজল সঙ্গীত,
পাখির ডানার সঙ্গে দুটি পাতার মধুর বন্ধুত্ব

প্রাগুক্ত পংক্তির ভেতর মায়ের চেহারা কোথায়?
মা-কে বলে লোকে প্রত্যেকে দেশ কিংবা প্রকৃতি,
আচ্ছা, তাই কী হয়? কোথায় প্রকৃতি কোথায় দেশ।
মা মা-ই, এর কোনো বিকল্প শব্দ নেই, ছবি নেই

একটি নারীর মধ্যে জলে-পথে ছিলাম খুব নিরাপদে
ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে, সেই মধ্যপুকুরে মাছের সাহসে
সাঁতরে পাড়ি দিয়েছিলাম জীবনের গভীরতম সমুদ্র,
কোথাও আকাশ ছিলো না, শুধু ছিলো লোহিত প্রাচীর

চৌদিকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আকুল-অকূল হা-শূন্যতা।
মা-ই ছিলো পৃথিবীর প্রথম নভোযাত্রী, আমি সাক্ষী,
নাভি-রজ্জুর সঙ্গে বেঁধে তিনি ছুড়ে দিলেন শূন্যের সাগরে,
এরপরে আমিই চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম পা রেখেছিলাম, শনিতে

মঙ্গলে, বৃহস্পতি আর অনতিদূর নেপচুন বলয়ে,
মা যেহেতু এক পৃথিবী-কন্যা, আমি তার প্রথম সন্তান
অগত্যা তারই সঙ্গে ঘুরে ফিরে চলে এসেছি
জল-বায়ু-অগ্নি-মাটি আর সুখ-দুঃখ-মৃত্যুর টানে

এই পৃথিবী নামক নাগরিক গ্রহে, অন্ধকার আর
শৈত্য ছিলো সত্য পরিচয়, সূর্য এসে নষ্ট করেছে প্রভূত
তার প্রকৃত চরিত্র ও স্বভাব। কৃত্রিম এই পূত-প্রতিবেশে
বেঁচে-ভেসে আছি প্রবল। মা সেই ব্রহ্মাণ্ডের মৌল গ্রহদূত

জননী বৃত্তান্ত
আসাদ চৌধুরী

আপনার কালো ফ্রেমের একটি কাচ কালো,
বছর পনেরো আগে
ছানি পড়ায় সেই চোখটি তুলে ফেলা হয়েছে,
অন্য কাচটি ভারী,
অস্ত্রোপচারের পর আপনি সামান্যই দেখতে পান।

অবেলায় ঘুমিয়ে পড়লে
রোদের আঁচ লাগলে
নিজের শরীর দিয়ে জানালার রোদ আটকান।
দুর্বল হাতে সরিয়ে দিতে থাকেন আমার শরীর।
আমার ঘুম ভেঙে গেল
উত্তর শাহবাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায়
(এ-ভাষায় কেবল আপনি কথা বলেন
এই এপার্টমেন্টে)
শরীর খারাপ কি না শুধাতে থাকেন।

ইদানীং কানেও বেশ কম শোনেন,
জিভের স্বাদও পাল্টে গেছে,
খেতে বসলে
আপনি তো সদানন্দময়ী
আপনার কপালেও বিরক্তির চিহ্ন ফোটে
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে,
শুক্রবারে,
মসজিদে যাবার জন্য তাগাদা দিতেন—
বাসায় বন্ধুরা আসেন,
গপসপ হয়—
খাবার টেবিলে যেতে বেশ দেরি হ'য়ে যায়।
বিড়-বিড় ক'রে বলতে থাকেন,
'কী এমন রাজকাইর্য তামাম দিন।
খাওয়া নাই, দাওয়া নাই'... ... ...

আপনার বিয়ের দশ বছর পর
একটি মৃত ভাইকে আগের বছর কবরে পাঠিয়ে
কার্তিক মাসে
বামনপৈতা নিয়ে জন্মেছিলাম,
ত্রিশের দশকের গোড়ায়, রাজার আমলে
বড়ো হিস্যার ছোট বউ হায়
'আম্মা' ডাকটি কারণে অকারণে শুনতে অভ্যস্ত
আমার কণ্ঠে এই উচ্চারণ নিশ্চয়ই
রবি-প্রয়াণের পর
লাহোর প্রস্তাবের আগে পরে
(ঠিক সনটি আমার জানা নেই তো, আপনারও না)
আমি আপনার সেই ছেলেটিই তো,
আমার জন্য খালাম্মার কাছে রেখে গেলেন কিছু গয়না,
উত্তাল একাত্তরে
আমার সম্পর্কে আপনার অঙ্ক অনেক বেশি নির্ভুল ছিল।

বিয়ের পর তুই থেকে পদোন্নতি,
কিন্তু আমার সন্তানেরা কেড়ে নিলো
আপনার কোল থেকে আমাকে
হাজার বার শোনা কেচ্ছা এখন আমার
ছোট ছেলেও জানে।

ফ্লাটে ফিরতে দেরি হ'লে
ক্ষীণদৃষ্টি নিয়ে
আপনি এখনও জানালায় দাঁড়িয়ে থাকেন,
রাতের বেলায় কোথায় সূর্য
আপনেও এমন কিছু সূর্যমুখী নন।

আপনার পায়ের নীচে আমার বেহেশ্‌ত্‌।

আমার মায়ের চোখ
রফিক আজাদ

আমার পিঠের ঠিক মাঝখানে সর্বক্ষণ আমি
অশ্রুজলে-ভেজা দুটি চোখ টের পাই—
চোখ দু'টি আমার মায়ের :
যখন যেখানে যাই যুদ্ধ ও শান্তিতে—
নগরে-বন্দরে-গ্রামে শত্রু বা মিত্রের ঠিকানায়
উদ্বেগে আকুল, সিক্ত ঐ দু'টি চোখ
আমাকে আগলে রাখে, চোখে-চোখে রাখে!

২

আমার মায়ের ভয় তার এই বিহ্বল বালক
কখন কী ক'রে বসে
না-জেনে না-শুনে এই অচেনা নগরে!

সর্বদাই ভয়ে-ভয়ে থাকে ভীরু মায়ের হৃদয় :
যদি বা তৃষ্ণার্ত হ'য়ে অচেনা নদীতে ঝাঁপ দিই,
ভাসাই আমার নৌকো সন্দেহজনক কোনো জলে—
মোহনীয় স্বর শুনে নেমে যাই ডাকিনীর দ্বীপে!
হাত দিয়ে ফেলি কোনো অচেনা আগুনে—
অবুঝ শিশুর মতো জাপ্টে ধরি কেউটের ফণা,
দুই হাতে ধ'রে ফেলি আগুনের লেলিহান শিখা!

৩

সন্তানের জন্যে তার অনিবার তৃষ্ণা জেগে রয়,
বুক ভ'রে থাকে তার সর্বক্ষণ, টনটনে ব্যথা.....
দুইটি সন্তান তার মারা গেছে আগুনে ও জলে—
সেই থেকে এই দুই শক্তিকে বিষম ভয় তার;
এখনো সে অশ্রুভেজা দুই চোখে বাঁচিয়ে রেখেছে
আমার জন্মেরও আগে অপমৃত দুইটি সন্তান।
ভয়ে-ভয়ে থাকে সে সর্বদা

পাছে তার এই কনিষ্ঠ সন্তান যদি ঝাঁপ দ্যায়
মৃত দুই সন্তানের মতো ঐ জলে বা আগুনে!

তার তো জানার কথা নয়—আগুন আমার ভাই,
আর জল?---মাছেদের মতো আমি জল ভালোবাসি!

সর্বশেষ সন্তানের জন্যে তার অসম্ভব ভয়—
যেন সে এখনো শিশু, হামা-দেয়া, কোলে-করা শিশু
হাঁটতে না-জানা
সাঁতার না-শেখা
হিসেবে অপটু এক শিশু
ভালোমন্দ, ইষ্টানিষ্ট এখনো যে বুঝতে শেখেনি!

সন্তানের জন্যে কাঁদে অহোরাত্র মায়ের হৃদয় :
সন্তানের মঙ্গলের জন্যে আর্দ্র, ব্যথিত দু'চোখে
শূন্যে দুই হাত তুলে মোনাজাত করে পাঁচবেলা!

৪

আমি তো সর্বদা তোর চোখের আড়ালে যেতে চাই—
মুর্গির বাচ্চার মতো কেন আগলে রাখিস আমাকে
পাখার আড়ালে?
সারাটি জীবন ধ'রে মাতৃক্রোড়ে থেকে যাবো নাকি?
তোর কোল থেকে নেমে হামা দেবো, হাঁটতে শিখবো না?
হামা-দেয়া শিশু নই, আজীবন শিশু থেকে যাবো?
বয়ঃপ্রাপ্ত হবো না কখনো, তোর স্নেহ-কোল থেকে
পড়বো ঢ'লে সরাসরি অনিবার্য অপর কোলটিতে?

এ্যাত্তোটুকু ছোট্ট শিশু মা গো তোর কোন কাজে লাগে?

বৈশাখে নিজস্ব সংবাদ

মহাদেব সাহা

মা আমাকে বলেছিলো—যেখানেই থাকিস তুই
বাড়ি আসবি পয়লা বোশেখে। পয়লা বোশেখ বড়ো ভালো দিন
এ দিন ঘরের ছেলে বাইরে থাকতে নেই কভু, বছরের এই একটি
দিনে
আমি সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ে দিই

ফুলজল, কে বলবে কী ক'রে কার বছর কাটবে,
বন্যা, ঝড় কিংবা অগ্নিকাণ্ড কতো কি ঘটতে পারে, তোর তো কথাই
নেই
মাসে মাসে সর্দিজ্বর, বুকব্যথা লেগেই আছে, বত্রিশ বছর বয়েস
নাগাদ এইসব চলবে তোর, জানিস খোকা, রাশিচক্র তোর ভীষণ
খারাপ,
যেখানেই থাকিস তুই বাড়ি আসবি পয়লা বোশেখে। সেদিন সকালে
উঠবি ঘুম থেকে, সময়মতো খাবি দাবি, ভালোয় ভালোয় কাটাবি
দিনটা
যেন এমনি মঙ্গলমতো সারাটা বছর কাটে, তোকে না ছোঁয় কোনো
ঝড়-ঝাপটা, বিপদ-আপদ
আমি নিজ হাতে একশো-একটি বাতি জ্বালিয়ে পোড়াবো তোর
সমস্ত বালাই।

মা তোমার এসব কথা মনে আছে, এমনকি মনে আছে
বছরের শেষে ছুটিছাটায় বাড়ি গেলে পয়লা বোশেখ না কাটিয়ে
তুমি
কিছুতেই আসতে দিতে না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময়
আমার বুকের মধ্যে পুরে দিতে ভালো থাক তুই শুধু এইটুকু
বিশেষ সংবাদ, আমার

গন্তব্যে তুমি ছড়িয়ে দিতে দুর্ঘটনা, রোগ, শত্রুর উৎপাত থেকে
নিরপত্তা, হায় এই
সংসারটা যদি মায়ের বুকের মতো স্বাস্থ্যবান হতো,
তখন আমার বৈশাখগুলি

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কাটতো না এমন বিষণ্ণ;
এখন আমার বৈশাখ কাটে ধূলিঝড়ে জানালা দরোজা সব
বন্ধ ঘরে অন্ধকার শবাধারে শুয়ে, মাথার সমস্ত চুল
কেটে নেয় ভয়ের বিশাল কাঁচি, সকালে খুলিতে বুলায় হাত মেসের
গাড়ল বাবুর্চি এসে
দেয়ালে তাকিয়ে দেখি এমনি ক'রে বছর বছর ক্যালেণ্ডারে পাল্টে
যায়
আমার বয়স, গোঁফ দাড়ি পুষ্ট হয়, কিছু কিছু পরিচয় ঘটে
তথ্যকেন্দ্রে ব'সে জেনে নিই দু'চারটে নতুন খবর, আবার ঘষে মেজে
উজ্জ্বল করি আমার নেমপ্লেট;

শোনো মা, তোমার সমস্ত কথা মনে আছে, বৈশাখে দোকানে
হালখাতা
মহরৎ হ'তো, বাড়ির উঠোন ভ'রে খেতে দিতে কলাপাতায় ঘরের
মিষ্টান্ন, আমার জন্যে বানিয়ে রাখতে স্বস্তিক, মা তোমার হাতের
দেয়া
স্বস্তিক আমি এমন লোভী দেখো নিঃশেষে খয়ে ব'সে আছি,
আমার মনের
স্বস্তি আমি আজ খেয়ে ব'সে আছি;
এখন আমার বছর কাটে বিদেশ বিভুঁয়ে

নানাস্থানে, বেশির ভাগ হোটেলের ভাড়াটে কামরায়, স্টেশনের
ওয়েটিং রুমে, বছরে দু' একবার হাসপাতালে, কখনো কখনো
পুলিশ-ফাঁড়িতেও যাই
ইতস্তত ভবঘুরের মতো ঘুরি, ইদানীং সংবাদ সংগ্রহে
বড়ো বেশি ব্যস্ত থাকি কেবল আমার সংবাদ আজ আমার
কাছে নিতান্ত অজ্ঞাত;
আমার বছর কাটে ধার-ঋণে, প্রত্যহ কিনি একেকটি দেশলাইর বাক্স
আমিই বুঝি না কেন আজকাল এতো বেশি দেশলাই কিনি আমি
হামেশাই বৈদ্যুতিক গোলযোগে জ্বালাতে হয় নিজের বারুদ
আমার এখন বুঝি ভালো লাগে প্রতিদিন নিজের করতলের গাঢ়
অন্ধকারে

জ্বালাতে আগুন, কেননা এখন আমাকে বড়ো বেশি কষ্ট দেয়
আমার
নিজের আঙুলগুলি, আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ভীষণ আঁধার;
এখন প্রায়শই মতবিরোধ, ঝগড়াঝাটি

ক'রে কাটে আমার সময়, কোনো কিছুতেই দুঃখও পাইনে বড়ো,
বুকের
ব্যথাটাও বোধ হয় না আজকাল আর, আমার বুকের ওপর দিয়ে
ক্রমাগত
তুষারঝড় হ'য়ে গেছে, বুঝি ভূমিকম্পে ম'রে গেছে
বুকের সমস্ত শহরতলী;
মা তুমি বলেছিলে পয়লা বোশেখে
বাড়ি আসবি তুই, আমার মনে আছে —আমারও
ইচ্ছে করে পয়লা বোশেখ কাটাই বাড়িতে প্রতি বছর মনে
ক'রে রাখি সামনের বছর পয়লা বোশেখটা বাড়িতেই কাটিয়ে
আসবো, খুব সকালে উঠে দেখবো পয়লা বোশেখের সূর্যোদয়
দেখতে কেমন, কিন্তু মা সারাটা বছর কাটে, ক্যালেণ্ডার পাল্টে যায়,
আমার
জীবনে আর আসে না যে পয়লা বোশেখ।

যে লাবণ্যময়ী....

আবু কায়সার

এ ধাতব ধড় থেকে খসে পড়া ব্রোঞ্জমুণ্ড
স্থির ছবি হয়ে কাঁদে
রাস্তার ওপর
তেলসিক্ত দূর্বাদলে পৌর-পিপীলিকা:
বদলে যাবে ভোরের ভূগোল
বিষে, বিস্ফোরণে?
ট্র্যাফি-কের রক্তচক্ষু
জন্মান্ধের মতো একা
টলোমলো নালা বহে যাবে দক্ষিণ থেকে
দক্ষিণে: মধ্যদিনের পর মধ্যদিনের পর মধ্যদিনের
পড়ে থাকে মৃৎমূর্তি জেব্রাডোরা পথে
চেয়ে আছে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী
গন্তব্য দেবে না

মূর্তিটা মানুষ ছিলো এই শব্দে বুক
কেঁপে উঠেছিলো বুক কেঁপে উঠেছিলো বুক কেঁপে...
ওকে জন্ম দিয়ে গেছে যে মানুষী যে-লাবণ্যময়ী
তার স্বপ্নে এক রাত্রে একটি অন্যমনস্ক ফড়িং
রাজমাতা হবি বলে ডানা কেটে রাখে—

এখন রাজার স্বাস্থ্য
মূর্ত হবে রাস্তাব ধুলায়
এখন রাজার রাস্তা মানুষেব চেয়ে মানবিক

মা

মাহমুদ আল জামান

দুঃসহ রাত্রিতে আমি
যখন এখনও গভীর শূন্যতায়
অবিশ্বাসে
আত্মঘাতী হয়ে
ক্ষমার অপার সৌন্দর্যকে ঘৃণায়
দূরে ফেলে দিয়ে
কথা বলতে থাকি বৃক্ষের সঙ্গে
কিংবা
লাশকাটা ঘরে
ছিন্ন ভিন্ন শরীর জুড়ে
দগ্ধ, ঝলসানো বুকে
বিষাদের পটভূমি নিয়ে
যে পিপাসা জেগে থাকে আর্তনাদে
তখনই
নিঃশব্দে এসে দাঁড়ান তিনি। হাতের স্পর্শে
গহীন ভালোবাসা লেগে থাকে
কোনকিছুই পাথর নয়, শিলা নয় এই কথা বলে, তিনি
মৃত্যুর জীর্ণ
ছেঁড়া জামা ফেলে দিয়ে
হাসপাতালের বারান্দার টবে তাঁর হাতে
ফের ফোটান ফুল।
গভীর ইমন কল্যাণের সুরে
রোদ্দুর আর ছায়ায়
এক দৃশ্যের জন্ম নেয়। জনমদুঃখী মা আমার
সর্বনাশ, কষ্ট আর হননের চিহ্ন মুছে দিয়ে
নদী আর স্রোতে
ফিরিয়ে দ্যান আমাকে

কাশবন ও আমার মা
নির্মলেন্দু গুণ

আমার একটি ছোট্ট সুন্দর গ্রাম ছিল। তার নামটিও ছিল
ভারী সুন্দর, কাশতলা। মনে হয় একসময় কাশফুলের খুব
প্রাচুর্য ছিল ঐ গ্রামে। আমি কবিত্ব করে তার নাম পাল্টে
রেখেছিলাম কাশবন;—ভালোবেসে প্রেমিক যেমন তার
প্রেমিকার নাম পাল্টে রাখে। সে-ই আমার প্রথম কবিতা।

ঐ গ্রামটির জন্ম হয়েছিল আমাকে জন্ম দেবার জন্যে,
এ ছাড়া ঐ গ্রামের আর কোনো উল্লেখযোগ্য অর্থ নেই।
প্রতিটি গ্রামই কাউকে না কাউকে জন্ম দিয়ে চলেছে,
সেদিক থেকে আমার গ্রামটি এমন কিছু করে নি যাতে
তাকে পাগলের মতো মাথায় তুলে নাচতে হবে শিবনৃত্য।
তবু নবকবিত্বের উন্মত্ততায়, এই জীর্ণশীর্ণ দেহেও, আমি
আমার আদুরে গ্রামটিকে মাথায় নিয়ে বেশকিছুদিন নৃত্য
করেছি। যত ছোটই হোক, মেয়ে মানুষেরও ওজন আছে;
আর গাছগাছালি ভরা একটা সম্পূর্ণ গ্রাম, ভেবে দেখুন।
নগরবাসীরা আমার কাণ্ড দেখে মুচকি হেসেছে, তা হাসুক,
আমি তাদের সব উপহাস সহ্য করেছি প্রেমের জোরে।

কিন্তু আজকাল কী যে হয়েছে আমার। আমিও কেমন যেন
তাদের মতোই হয়ে যাচ্ছি। ভুলে যাচ্ছি আমার গ্রামটিকে,
আমাকে জন্ম দেবার জন্যেই একদিন যার জন্ম হয়েছিল।
মাথায় নিয়ে তো দূরের কথা, আজকাল কোমড় জড়িয়েও
আর নৃত্য করি না। আমাকে টেনেছে এই নগর নটিনী।
অথচ নিশ্চিত জানি কাশবন এখনো আমার অপেক্ষায় বসে
অনিদ্র প্রহর গোনে বেহুলার মতো। এই তার একমাত্র কাজ।

এক-একবার ভাবি. যাবো। চলে যাবো। ফিরে যাবো....।
কিন্তু যাওয়া হয় না। কেন হয় না? নানা কারণেই হয় না।
মা আমাকে জন্ম দিয়ে মরে গিয়েছিলেন মাকড়সার মতো,
তাকে ধন্যাবাদ। কাশবন কেন যে আমার মায়ের মতো নয়!

বত্রিশ নাড়ির টান
শামসুল ইসলাম

বত্রিশ নাড়ির টান ছিন্নকরা এতই সহজ।
সন্তান প্রবাসে রেখে তুমি চির অপ্রবাসী হ'লে।
মেথিগন্ধা নারকেল তৈলসিক্ত কোঁকড়ানো চুল
স্নেহমাখানো দু'টি টানা চোখের সান্দ্রছায়া থেকে
যেন ঘণ্টাটাক হ'ল এই আমি বেরিয়ে এলাম
সি ডি জি সেন্ট্রুমে এই সাব্রুকেন; প্রত্নশহরে
মহাযুদ্ধের ক্ষত সঙ্গোপনে ধরে রাখা, প্রথম প্রবাসে
বত্রিশ নাড়ির টানে টনটন পুত্রের নিশীথ।
আমজেল পাখি কাঁদে পাহাড়ের লেয়াশিয়া ঝোপে
সিক্ত বহতা মেঘমালা যায় আলগোছে কঁকিয়ে
জানলার কাঁচ ছুঁয়ে তোমার সান্নিধ্যে এলোমেলো।
সেন্ট্রাল হিটার তাপে ঘর্মাক্ত কলেবর আমার
এই বুঝি জুড়োবেই তোমার হাতের স্পর্শ পেলে।
তোমার টিকালো নাক, সুশুভ্র শাড়ির চেনাঘ্রাণ
আমাকে উদাস করে, আমি শুধু আত্মহারা হই।
আমি তো প্রবাসমগ্ন, তুমি ধন্য চিরঅপ্রবাসী
আমার জন্মের প্রধান গন্ধচন্দন মৃত্তিকায়
আমাদের ধর্মপুরে, মা তোমার অনন্ত সদনে।
বত্রিশ নাড়ির টান ছিন্নকরা এতই সহজ!

বাড়ি ফেরা হলো না আমার

শাহনূর খান

বাড়ি ফেরা হলো না আমার—
অথচ ফিরব বলে বুকের ভেতরে আকুলতা
আমাকে জাগিয়ে রাখে সারাক্ষণ।
মাইলের পর মাইল হেঁটেছি।
স্বপ্নের ভেতরে কেঁপে ওঠা ঘর-বাড়ি,
আগ্রহের সবুজ সীমানা,
আমার চোখের সীমানা,
আমার চোখের স্তব্ধ জল,
সব যেন ঘন কুয়াশার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে...
আমি পথ ভুলে গেছি, বিশাল প্রান্তরে
শুধু হাহাকার নিয়ে পড়ে আছি,
নিঃসঙ্গ চাতাল...
বাড়ি ফেরা হলো না, কেবল
স্মৃতির ভেতরে জেগে থাকে এক দুরন্ত কিশোর।

একদিন বায়ান্নের খুব ভোরে
পাহাড়পুরের এক অজগ্রামের বালক
হাঁটু অব্দি ধুলো আর শিশিরে ভেজা পা ফেলে
নিজের বাড়ির পথ খুঁজতে হারিয়ে গেল বিস্তীর্ণ
অতীতে।
নিশি পাওয়া মানুষের মতো অবশ মুগ্ধতা
দিশেহারা জীবনের গ্লানি নিয়ে তার কেটেছে সমস্ত দিন-রাত্রি
প্রত্যাশার মিড়ে মিড়ে কেঁপেছে ব্যাকুল স্বর
বাড়ি ফিরব...বাড়ি ফিরব... বাড়ি ফিরব...
বাড়ি ফেরা হলো না আমার।

মাকে বলেছিলাম
বাড়ি ফিরব আগামী ফাল্গুনে—

প্রতীক্ষায়—আগ্রহের নীচে মা আমার
দুঃখ জাগানিয়া নকসী বুকে নিয়ে বসে থাকে
প্রতিটি দিনের আয়োজন
তাঁর কাছে বিষাদের চিহ্ন হয়ে যায়
তবু বাড়ি ফেরা হয় না আমার...

আমার বাড়ির পথ হালটের—
দু'পাড়ে বাঁশের ঘন ঝাড় মমতায় নুয়ে থাকে
পথের ধুলোর সাথে কানাকানি হয়—
কখনো কাশের বন, কাঁটা-ঝোপ, বেতঝাড়,
ফসলের ভারে নত মাঠের সীমানা,
কখনো বাড়ির পাশে লতানো লাউয়ের ডগা
কিশোরীর শরীরের মতো দুলে ওঠে।
পচানো পাটের গন্ধ, মাতাল বকুল,
গন্ধ ভাদালের লতা
আমার বাড়ির পথ সারাদিন আগলে রাখে
আমি বাড়ি ফিরব...বাড়ি ফিরব...বাড়ি ফিরব

বাড়ি ফিরব বলে একদিন হাঁটতে হাঁটতে
দেখেছি ধলেশ্বরীর পাড়ে
আমার বোনের নগ্ন লাশ, তার
দেহের প্রতিটি লজ্জা
বিধ্বস্ত জংঘা ও উরু
বেয়নেটে বিদ্ধ স্তন;
আমার ক্রোধের সীমা বিদ্রোহের পতাকা তুলেছে
আমি সেই পতাকায়
বোনের লাশটি ঢেকে দেব বলে
স্টেনগান তুলে নিয়েছি নীরবে
ও লাশ আমার বোন—আমার মা—
বাড়ি ফেরা হলো না আমার—

আমার হাতের স্টেনগান
গ্রেনেডের ক্রোধ, গর্জে উঠেছে এ্যাম্বুশে
ক্ষিপ্র প্রত্যাশায় বোনের কাতর মুখ—মা আমার
রক্তে, উষ্ণ আন্দোলনে দ্রাবিড় তনয়া
হাজার বছর শেষে জীবনের প্রলুব্ধ গোলাপে
বলেছে, এ যুদ্ধ শেষ হল বাড়ি ফিরে আয়
মরলা মাছের ঝোল, ঢেঁকিশাক,
বুনো পিপুলের ছায়া, বাতাবিলেবুর কোয়া,
সযত্নে রেখেছি তুলে, বাড়ি আয়—বাড়ি আয়।

মনে নেই

সমুদ্র গুপ্ত

অশ্বত্থের শিকড়ের মতো পাতাল স্পর্শী তোমার নাড়ীর টান
কবে ভুলে গেছি, তা-ও ভুলে গেছি।

তোমার ক্ষুধার্ত শিকড় আমার
পিতৃভূমির অখণ্ড মৃত্তিকায় শুধু জল খুঁজেছিলো?
বৃক্ষের শিকড় সে যতদূর গভীরেই থাক, জানি
সে কখনো আশ্রয় খোঁজে না শুধু
খোঁজে প্রিয় জল।
তোমার নাড়ির টান আমাকে এখন আর স্পর্শ করে না
আমি তো জলধি নই,
কতোদিন এ জিহ্বায় দুগ্ধস্পর্শ নেই
কতোদিন জলস্পর্শহীন, মনে নেই, মনে নেই

শিশির পতনের মতো নরম কিন্তু অনিবার্য তোমার নাড়ির টান
কবে ভুলে গেছি, মনে নেই

মা

মুহম্মদ নূরুল হুদা

স্মৃতি ও স্বপ্নের অববাহিকা জুড়ে কোলাহল উঠেছিলো কাল সারারাত
কাল সারারাত আমার অগস্ত্য যাত্রা তোমার শিথানে
কাল সারারাত তোমাকে মন্থন করে পান করেছি হন্তারক হলাহল
নারী কি রমণীর অনাবশ্যক আবরণ খসিয়ে, তার নগ্ন স্তনে মুখ রেখে
মগ্ন-স্বরে ডেকে উঠেছি 'মা'
কাল সারারাত আপন জনকের খড়্গতলে আমি ছিলাম নিঃশঙ্ক
নচিকেতা;
দেখলাম, পঁচিশ হাজার বর্গমাইল দীর্ঘ সেই লোকশ্রুত সাপের মতো
এক লোহিতাভ নদী
পেঁচিয়ে ধরেছে আমার বিজন-বৃহৎ স্বপ্ন-বিশ্ব
কাঁপছি আমি কাঁপছো তুমি কাঁপছে লক্ষ জীবনের অনুচ্চারিত
শব্দাবলী;
না, সীমানা-সীমান্তহীন কোনো সাগরে গিয়ে মেলেনি
সেই লোহিতাভ স্রোত
মানস সরোবরের নভোনীল পরিধিতে সমর্পিত হয়নি তার সলিল-
শরীর;
ইচ্ছে হয়, অধ্যাত্মবাদী ওঝার মতো তার দিকে ছুটে যাই
যেতে যেতে ভারী মজা পেয়ে যাই, শীত-সকালে ঘুম-ভাঙা কিশোরের
মতো
ত্রস্ত পায়ে এসে দাঁড়াই সেই বৈতরণী তীরে:
ঘুরছে তোর ঘুরছেই
চলছে তো চলছেই
বাড়ে না কমে না তার জল
খল খল করে না সে জোয়ারে-হিন্দোলে
ভাঁটায় তার ভরন্ত শরীর পড়ে না ঢলে;

সহসা তীব্র লয়ে বাজে বিষাণ ঈশানে
বসন্তপ্রাতে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের মতো টলমল করে আমার শরীর
হাওয়া লাগে, হাওয়া লাগে জীবনে-যৌবনে; আর
সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে যে অঙ্গ সুবাসিত হয়েছিলো জীবনের প্রথম
ওঙ্কারে

তার গন্ধ পেয়ে যাই আমি;

মনে হয় নদী যেন নদী নেই, সে হয়ে উঠেছে শবে-বরাতের কার্নিশ
তার বাঁকানো শরীর জুড়ে জ্বলছে সারি সারি লোবান;
আর কী আশ্চর্য, সেইসব লোবান-মিছিল ছুটে আসছে আমার দিকে
বখতিয়ারের অঠোরো অশ্বের মতো, শক হুন আর্য ও দ্রাবিড়ের
মার্-মার্ কাট্‌কাট্ ধ্বনির মতো, তিতুমীরের চির উড্ডীন
বাঁশের ফলার মতো;

"হঠ যাও! হঠ যাও!"
—কে তুমি আমার শোণিতস্রোতে সুবর্ণরেখার জলে
কলরোল তুলে আমাকে শাসাও
কে তুমি আমার পলিময় ব-দ্বীপ জুড়ে জননীর জননেন্দ্রিয় জুড়ে
হাউকাউ করো—
আমি বৃদ্ধ গৌড়রাজ নই, সর্বশেষ নবাব নই, আমি পালাবো না;

আমার সৌধপ্রতিম অস্তিত্বের সমুখ দিয়ে ওরা চলেছে
নৌকাগুলো ছুটে চলেছে নিঃসঙ্গ আরোহী নিয়ে আলোর বেগে
যে ঘাটে নক্ষত্রেরা স্নান সারছে, মুখ লুকাচ্ছে অস্তগামী সূর্য
সেই অন্তিম অনন্তকে ভেদ করে ছুটে যাচ্ছে তারা, ছুটে যাচ্ছে;

আমি চীৎকার করে ডাকলাম, 'কথা বলো, কথা বলো'
নিঃশব্দ দাঁড়গুলো দুলে উঠলো দ্বিগুণ বেগে;
আমি চীৎকার করে ডাকলাম, 'তোমরা কারা?'
হাওয়ায় লোবানের গন্ধ বাড়লো;
আমি চীৎকার করে ডাকলাম, 'আমাকে নাও'

মুহূর্তে অদৃশ্য হলো নৌকাগুলো
স্তব্ধ হলো সচল নদী
জলের রং গেলো পাল্টে
আর খুব নীচু স্বরে খুব ধীর লয়ে ঝাউকান্নার মতো
বেজে উঠলো ঝিঁঝির সানাই;

দেখলাম, স্তব্ধ নদীর বুকে জেগে উঠেছে চর
চরে এক খড়ো কুটির
কুটির থেকে হাত বাড়িয়ে এলোচুলে বেরিয়ে আসছো তুমি
হে আমার বাহান্ন-বাহিত সন্তানহীনা বঙ্গজননী।

কবির মা

আবুল হাসান

একজন কবির মাকে কতটুকু জানো?
হৃদয়ের পাশে তার থরথর করে কাঁপে সন্তানের মুখ
চির দুঃখে আনত কাতরা!
কাঠের বউনি ঘ্রাণ, মানকচুর মৃত্তিকা শায়িনী শৈবাল
এলোমেলো করে দেয় আঙ্গিনায় ছড়ানো যে
ভাতের ঢাকুন, নুন, নোনামাখা চাল!
মাথার ভিতরে কত মেঘ জমে
কালো মেঘ, কালো বৈশাখের বোবা মেঘ!
হাতের তেলোয় তার তৃণ যেন ভিনদেশী কেউ

করুণ তরুণ জানে কত যত্নে শিশির জমায় তার
চোখে ভাসা হেমন্তের মৌ!
কঞ্চি, কাঠ, শস্য, প্রাণ মেলে না তেমন,
দূরে দূরে ছড়ানো রতন!
কেউ কাছে নেই। শুধু সকাল বিকাল
পোষা হাঁস, বনের শালিক তোলে বিবেকের ঢেউ
ছোলা দিতে মন দিয়ে দেয়!
কবির মায়ের মুখে মানুষের মমতা ক্ষমতা বেড়ে ওঠে
সেখানে লুকোয়
একে একে অমানব অশুচি প্লাবন!
জেগে ওঠে চর
নতুন বসতি ফের ফুল, পুষ্প, পথের প্রান্তর!
কবির মায়ের তবু নেই কোনো ঘর!
সে উদ্বাস্তু তার সন্তানেরই মতো।

দুখিনি মা জনমদুখী

সানাউল হক খান

দুখিনী মা জনমদুখী, আছে সে এক ঘরে
অন্ধকারে হাতড়ে ফেরে জং ধরা এক সুঁই
পেছন থেকে চোখ ধরো তার কানামাছির সুরে
ঘোমটা খসায় তপ্ত হাওয়া—কি ক'রে তা ছুঁই!

দুখিনী মা জনমদুখী, ছিকেয় তুলে রাখে
চোত্ত-বোশেখের কাসুন্দি আর লাল ভাদ্রের তাল
মধ্যরাতের চোর তাড়ানো চৌকিদারের ডাকে
ভবিষ্যতের থালায় জমে ভাবনা চিরকাল!

দুখিনী মা, জনমদুখী, ছিলো সে কোন কালে
সবুজ ঘরের পাটরানী মা, আলতা রাঙা পা'য়
খুঁটতে খুঁটতে জড়িয়ে গেছে কাঁটার জঞ্জালে
আমরা তবু আগুন ঢেলে দিয়েছি তার গা-য়।

দুখিনী মা, জনমদুখী পুড়তে পুড়তে বাঁচে
গলায় বাঁধে ক্ষিপ্ত আঁচল, তাকে তোলো বুকে
এই শতকের সন্তানেরা নগ্ন হয়ে নাচে
সে ভাঁড়ামি বোঝেও না বেহায়া উজবুকে!

দুখিনী মা, জনমদুখী, তাকে দেখাও বালি
মল-খসানো চরণে যার ঝাঁঝরা পোড়া মাটি
তাকে দেখাও আম্রবিহীন কুঞ্জ ফালি ফালি
উষর ধূসর মরুর মাঝে বসত পরিপাটি।

দুখিনী মা, জনমদুখী, আমার পদ্য শোনো,
মন্ত্রহীনের ছন্দহীনের দগ্ধ দিনের ফাঁদে—
আটকে দুপা কজন কাঁদে এক-এক করে গোনো
আমার কোনো ঠিকানা নেই, তোমার চরণ বাদে।

যৌবন

সাযযাদ কাদির

সঙ্গে কিছুই নিই নি
পরিচয়টুকুও নয়
আলপথ ধরে মধ্যরাতে
কুয়াশায় ডুবে
স্টেশনের দিকে আসতে-আসতে
অনেক কিছুই ভাবতে চেয়েছি
কিন্তু কিছুই মনে পড়ে নি

আমার ভাই বা সন্তান হতে পারতো
এমন কোনও শিশুর আবদার
আমর স্ত্রী বা প্রণয়ী হতে পারতো
এমন কোনও রমণীর সোহাগ
আমর বন্ধু বা শত্রু হতে পারতো
এমন কোনও যুবকের উক্তি
আমার পিতা বা প্রভু হতে পারতো
এমন কোনও ক্ষমতাবানের শাসন
এবং আমার মা-জননী হতে পারতো
এমন কোনও দুঃখিনীর সম্বোধন

না, এ-সব কোনও কিছুই মনে পড়ে নি

সম্ভবত সকল বিষয়কেই আমি ক্ষমা করেছিলাম

শুধ স্টেশনে পৌঁছে দেখি
আলপথ ধরে হেঁটে আসা দু'টি পা
ভিজে আছে শিশিরের জলে!

আমাদের মা

হুমায়ুন আজাদ

আমাদের মাকে আমরা বলতাম 'তুমি', বাবাকে 'আপনি'।
আমাদের মা গরিব প্রজার মতো দাঁড়াতো বাবার সামনে
আর কথা বলতে গিয়ে কখনোই কথা শেষ ক'রে উঠতে পারতো না,
আমাদের মাকে বাবার সামনে খড়কুটোর মতো এমন তুচ্ছ দেখাতো
যে মাকে 'আপনি' বলার কথা আমাদের কোনোদিন মনে হয় নি।
আমাদের মা আমাদের থেকে বড়ো ছিলো, কিন্তু ছিলো আমাদের সমান,
আমাদের মা ছিলো আমাদের শ্রেণীর, আমাদের বর্ণের, আমাদের গোত্রের।
বাবা ছিলেন অনেকটা আল্লার মতো, তার জ্যোতি দেখলে আমার সেজদা দিতাম
বাবা ছিলেন অনেকটা সিংহের মতো, তার ডাকে আমরা কাঁপতে থাকতাম
বাবা ছিলেন অনেকটা আড়িয়ল বিলের প্রচণ্ড চিলের মতো, তার ছায়া দেখলেই মুরগির
বাচ্চার মতো আমরা মায়ের ডানার নীচে লুকিয়ে পড়তাম।
ছায়া স'রে গেলে আবার বের হয়ে আকাশ দেখতাম।
আমাদের মা ছিলো অশ্রুবিন্দু, দিনরাত টলমল করতো
আমাদের মা ছিলো ফুলের পাপড়ি, সারাদিন ঝ'রে ঝ'রে পড়তো
আমাদের মা ছিলো ধানখেত, সোনা হয়ে দিকে দিকে বিছিয়ে থাকতো
আমাদের মা ছিলো দুধভাত, তিন বেলা আমাদের পাতে ঘন হয়ে থাকতো
আমাদের মা ছিলো ছোট্ট পুকুর, আমরা তাতে দিনরাত সাঁতার কাটতাম।
আমাদের মার কোনো ব্যক্তিগত জীবন ছিলো কি না আমরা জানি না
আমাদের মাকে আমি কখনো বাবার আলিঙ্গনে দেখি নি।
আমি জানি না মাকে জড়িয়ে ধরে বাবা কখনো চুমো খেয়েছেন কি না।
চুমো খেলে মার ঠোঁট ওরকম শুকনো থাকতো না।
আমরা ছোটো ছিলাম, কিন্তু বছর বছর আমরা বড়ো হ'তে থাকি।
আমাদের মা বড়ো ছিলো, কিন্তু বছর বছর মা ছোটো হ'তে থাকে।
সিক্সে পড়ার সময়ও আমি ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতাম
সেভেনে ওঠার পর ভয় পেয়ে মা একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে।
আমাদের মা দিন দিন ছোটো হ'তে থাকে।
আমাদের মা দিন দিন ভয় পেতে থাকে।
আমাদের মা আর ফুলের পাপড়ি নয়, সারাদিন ঝ'রে পড়ে না
আমাদের মা আর ধানখেত নয়, সোনা হয়ে বিছিয়ে থাকে না।
আমাদের মা আর দুধভাত নয়, আমরা আর দুধভাত পছন্দ করি না।
আমাদের মা আর ছোট্ট পুকুর নয়, পুকুরে সাঁতার কাটতে আমরা কবে ভুলে গেছি
কিন্তু আমাদের মা আজো অশ্রুবিন্দু, গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত
আমাদের মা আজো টলমল করে।

আমার মা

মাকিদ হায়দার

ফিরে তোদেরকে আসতেই হবে, যেখানে
যাবি বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলি সকাল বেলা
তোরা এখন নিজেরাই ফিরে আসতে
ব্যস্ত বিধায়
তোকেও ফিরে আসতে হবে।

আমার সহোদরেরা সকলেই ঘরে বসে থেকে
সারাদিন ফেলে আসা স্মৃতির ভেতর দিয়ে
হেঁটে গিয়ে
পৌঁছে যায় অন্যতটে
ঠিক তক্ষুনি,
আমার মা ডাক দেয়, খোকা তোরা
সব ঘরে আয়।

চারদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলো।

বাঙালি মায়ের মুখ
মাহ্‌বুব সাদিক

মা পড়াতেন স্কুলে আর পড়তেন ক্রূর জীবনের পাঠশালায়, কখনো তাঁর মুখের দিকে তাকালে মনে হতো স্মৃতির জটিল রেখার মতো চৈত্রের মাঠ—কিন্তু মৃদু হাসির তুলি সঙ্গে সঙ্গে রক্তরঙ বুলিয়ে মুছে নিতো ফাটলের বুনো অন্ধকার; ঢাকা পড়তো দুর্বিপাক; তখন তাকে সুচেতাই মনে হতো, হয়তো কোথাও ছিলো ললিত জীবনরস—ছিলো প্রাচ্যজীবনকাঁথায় মিহি জোড়াতালি; ভর-বিকেলে ঘুমকাতর মানুষকে তিনি ঘুম-পাড়াতে পারতেন—পুরো জাগিয়ে তুলতে পারতেন মধ্য বা শেষরাতে; কতোবার কালো সময় ঘিরে ফেলেছে আমাদের, মা সেই কালাকুষ্ঠি সময়ের গায়ে গেঁথে তুলেছেন নক্ষত্রের কণা; একদিন তিনি সাদা কাপড় বিছিয়ে বসলেন মেঝেয়—হাতে নিলেন ইস্পাতের সুঁই আর রঙিন সুতো, কাপড়ের গায়ে ফুটিয়ে তুললেন অগণন নক্ষত্র আর কিছু কৃষ্ণগহ্বর;

আমিও পড়াই আর নিজে পড়ি এই বাংলার ক্রূরতর বিশ্ববিদ্যালয়ে, মখমলের মতো ঘাসে শুয়ে গৌড়জন স্বস্তির শ্বাস ফেলবে—এরকম কোনো মাঠের কথা আমার স্বপ্নেও উঁকি দেয় না; অন্ধকারের ভেতর থেকে এক ভুতুড়ে আঙুল সামনে এগিয়ে এসে আমর পঙ্গু মস্তিষ্ক এফোঁড়-ওফোঁড় করে আমার কাপড় নেই—সুঁই-সুতো নেই; কোথায় যে কি লিখবো কিছুই জানি না;

*

সুকোমল নীল ঘুম ডানা নেড়ে মাকে কোন সুদূরে নিয়েছে?
তাঁর কথা মনে হলে রাত্রির প্রগাঢ় পটে তুলি-হাতে পিকাসোকে দেখি
কখনো মাতিস তাঁর পুরোনো কাঁথায় আঁকে পাহাড়ি ময়ূর,
শৈশবের রাঙা পথে মা কবে দেখেছে হাতি—হাতির শাবক
কতো-না সুতোর রঙে তার সাদা কাঁথার কাপড়ে
মায়াপাশে বেঁধেছে মা মাতা ও সন্তান—দৃপ্ত ঘোড়া, হরিণের লাফ;
মায়ের সুনীল চোখে আঁকা ছিলো বাংলাদেশ—মা কিছু ভুলেনি:
নক্ষত্রের তলে নদী, নৌকা, বেতরঙি মাছ, নীল কাচপোকা
অতসীর সোনাফুল, বাঁকা ধানছড়া আর ময়নার চোখের কাজল
তাঁর কাঁথার কাপড়ে বোনা বাংলার ঘাসবনে নেচে গেছে বেনেবউ;
কাথার বাইরে দোলা কপিশ আঁধার থেকে মানুষেরই পাথরহৃদয়
উঁচুমুখ কিষাণের অনাবৃত বুকে গেঁথে গিয়েছে বল্লম;

এইসব আঁকা আছে মায়ের কাঁথায়;
তখনও মানুষ ছিলো বাংলাদেশে, তবু ছিলো মানুষের পাথরহৃদয়
গরিবের ক্লিষ্টমুখে স্তব্ধ পাথরচোখে তাকিয়েছে ধনীর দুলাল
গরিব জীবন নিয়ে কানামাছি খেলেছে মানুষ,
আমার মায়ের হাত সেইকালে বুনে গেছে কিশোরীর হাসি,
শাণিত ক্ষুধার পাতে ভাত-বেড়ে মা আমার ছড়িয়েছে জীবনের তাপ;

*

তখন মুক্তিযুদ্ধ, বিস্মৃত শস্যখেতের মাঝখানে সবুজ আঁচল উড়িয়ে মা দাঁড়ালেন; আমরা সব ভাইবোন শকওয়েভের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম শত্রুর বাঙ্কারে; মায়ের ঘর পুড়লো, প্রাণ দিলো সন্তানেরা, রক্তে ভিজলো বাংলার সোঁদা মাটি; বাংলার জনসমুদ্র অবিরাম ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়লো শত্রুর বাঙ্কারে; মা তাঁর সবুজ আঁচল দুলিয়ে দিলেন বাতাসে—তাঁর সন্তানের রক্ত-মাখার সূর্য ফুটলো সবুজ আঁচলে; মা তাঁর কাঁথায় লিখলেন বাংলার জয় আর নতজানু শত্রুর পরাজয়, লিখলেন দোয়েল আর জয়নুলের কাক; আঁকলেন পাতাকুড়োনি আর টোকাই, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, জেলো-কামার-তাঁতি আব তুচ্ছ মানুষ ; তাঁর কাঁথায় আড়মোড়া ভেঙে বসলো ভখিরি-বাউল, গ্রেনেড আব বেগুনি জারুলের গোছা-হাতে মুক্তিযোদ্ধা; আমরা মাঝে মাঝে মায়ের কাঁথা খুলে দেখি— সেখানে সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে এক গরীয়ান বাঙালি মেয়ের হৃদয়;

*

মা আর কোথাও নেই—কোন শূন্য নক্ষত্রের দিকে
ডানা মেলে উড়ে গেছে তাঁর মৃদু হীরে-জ্বলা হাসি,
উল্লাসের বর্শা তবু ছুড়ে মারে এখনো মানুষ
চিৎ হয়ে শোওয়ার স্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়ে কুঁজো—
দম্পতিরা ছিঁড়ে খায় মধুচন্দ্রিমার চাঁদ;
তাঁর কথা ভেবে আমি কেঁদে কেঁদে প্রগাঢ় জ্যোৎস্নার
অনেক গভীর রাত ঘননীল কৃষ্ণগহ্বরে
চালান করেছি—
কখনো নক্ষত্র তাঁর নাকফুল হয়ে অন্ধকারে
জ্বলেছে নিভেছে; কখনো শেফালি মৃদু
সৌগন্ধের সুতো দিয়ে শেষরাতে রাঙা স্বপ্নে
নতুন মায়ের বুকে বুনে গেছে তাঁর গাঢ় মহান হৃদয়।।

অগ্ন্যুৎসব

হেলাল হাফিজ

ছিল তা এক অগ্ন্যুৎসব, সেদিন আমি
সবটুকু বুক রেখেছিলাম স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রে
জীবন বাজি ধরেছিলাম প্রেমের নামে
রক্ত ঋণে স্বদেশ হলো,
তোমার দিকে চোখ ছিলো না
জন্মভূমি সেদিন তোমার সতীন ছিলো।

আজকে আবার জীবন আমার ভিন্ন স্বপ্নে অঙ্কুরিত অগ্ন্যুৎসবে
তোমাকে চায় শুধু তোমায়।

রঙিন শাড়ির হলুদ পাড়ে ঋতুর প্লাবন নষ্ট করে
ভর দুপুর শুধুই কেন হাত বেঁধেছো বুক ঢেকেছো
জুঁই চামেলি বেলির মালায়,
আমার বুকে সেদিন যেমন আগুন ছিলো
ভিন্নভাবে জ্বলছে আজও,
তবু সবই ব্যর্থ হবে
তুমি কেবল জুঁই চামেলি বেলি ফুলেই মগ্ন হলে।

তার চেয়ে আজ এসো দু'জন জাহিদুরের গানের মতন
হৃদয় দিয়ে বোশেখ ডাকি, দু'জীবনেই বোশেখ আনি।
জানো হেলেন, আগুন দিয়ে হোলি খেলায় দারুণ আরাম
খেলবো দু'জন এই শপথে
এসো স্ব-কাল শুদ্ধ করি দুর্বিনীত যৌবনেরে।

মা তুমি ঘরের মধ্যে

আলতাফ হোসেন

মা তুমি ঘরের মধ্যে আছো বলে বাইরে আমার ঘোরাফেরা

বাইরে আমার আর ভয়-টয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, লজ্জা-টজ্জা কিছুই থাকছে না

বাইরে এখন খুব সময়ও গিয়েছে চলে জানো মা

কেউ আর কাউকেই ভাই বলে বোন বলে বন্ধু-শত্রু বলে আর চিনতেই পারছে না

কে কবি কে বলেছিল চলিষ্ণু মেঘের কথা সেই মেঘ এখন থমকে থাকে

আইমুর এক স্তনে হাত রেখে অন্য হাতে দোচোয়ানি খেতে তবু কার কোন বাধা

এসবই ফুরিয়ে এলে লোকেদের-যন্ত্রদের শ্যাওলা সরিয়ে এক তারাপুঞ্জ খুঁজে বার করি

তখনই তো শুনি কারা বলে যাও যাও ঘরে ফিরে যাও

আমি হাসি। ভাবি, মা-তো ঘরে আছে। আমার কিসের এতো তাড়া?

স্বপ্ন জরিপের খসড়া

খুরশীদ আনোয়ার

এক টুকরো জমিন হবে মাগো?
মধ্যিখানে চাঁদ দাঁড়ানো ঠাঁই
দুই পাশে দুই স্বপ্ন নদী
পিতামহের খোড়লে ঝড়
বনে এখন ব্যাঘ্র-প্রহর
একটু নিশ্বাস দাও না গিরিদিদি।

সীমা ভাঙার লোক ঢুকেছে মাগো
রাজার মহল জলের তলায় ডুব্কি
তবুও হাল আকাশ-জমিন চষে
ত্রিশূলটা কই? হাত কি গেছে খোয়া?
গিরি-করোটি আস্ত আছি নাকি?
হৃদ জোড়নের রাংতা হাওয়া
কমণ্ডলু বিষের কলস, রুদ্রাক্ষের মালা
শিকল প্রায়
নগর-চিতা ঝোপের মানুষ খায়।

সাদা কাঠের একটু প্রাচীর
ছনের সঙ্গে শিমের ছায়া ধীরে
আনন্দমঠ রসেরই ঘট
ভালোবাসার পাঠশালা এই দেখো
বনের দেহ জোছনা নেবে মুড়ে।

এক টুকরো আকাশ হবে মাগো?
মধ্যিভূমে সরল একটি লোক
ব্রহ্মক্ষণে আলোক ছড়ার কথা,
না থাক সমর্থনের রাজটিকা
শাল পিয়ালের ঘোর আঁধারের ছায়া
বর্তমানের বিশাল হবে ছাতা।

এক টুকরো আলো যেন

আবুল মোমেন

মা—এক টুকরো আলো যেন,
যেন বা স্মৃতির মেঘ। আলো ছায়া দিয়ে
খেলাঘরে ধরে রাখে সারাক্ষণ।
কখনও ছায়া বেশি, কখনও আলো।

ব্যস্ততার অগ্নিবিবরে ঢুকে
ভুল হয় ছায়া-আলো নিয়ে,
বিস্মৃতিও ঘটে। আলো
কিংবা ছায়া পারে একতরফা দিতে
আলো ও ছায়া।
বিস্মৃতি অবশ্য তাতে আরও বল পায়।

বিস্মৃতের মনে নানান মাতৃ আদর্শ
জমা দেয় বই—সাহিত্য ও ইতিহাস।
প্রথমেই মনে পড়ে
গোর্কির মাকে, চকিতে ব্রেখট :
মা সাহসিকা।
মুগ্ধতার সম্ভ্রমে ধরা দেন আনন্দময়ী—
গোরা বিনু অচলার মা।

শৈশব ফিরিয়ে দেন সর্বজয়া—
মাতৃময় শৈশবের স্মৃতি
বাষ্পাকুল চোখে স্বপ্নে ভর করে।
নিঃসন্তান বিন্দু আনে মাতৃত্বের
নতুন চমক। শরৎচন্দ্রের আরও
বড় বিস্ময় নারায়ণী,
নিজের একটি মাত্র ছেলে, তা সত্ত্বেও
মাতৃ অধিকারে তার জেদ
সে ফেরাবে রামের সুমতি!

হিংসা দ্বেষ যুদ্ধের হাহাকারে
শুশ্রূষার শিখা যেন
'আওয়ার লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প';
প্রবল ধারালো ঝড়
কিশোরী-মা সন্ত জোয়ান।
আর আর্ত এই পৃথিবীতে
সান্ত্বনার মত অকম্প শিখা
মা তেরেসা। এখানে স্বদেশে
রুদ্ধ ক্রুদ্ধ সমকালে মাতা স্নিগ্ধা
সুফিয়া কামাল।

ইতিহাস ও সাহিত্য খ্যাত মায়েদের ভিড়ে
মা বেচারি ঘরে ঘরে বিস্মৃতির গোধূলিতে
নিঃসঙ্গ বেঁচে থাকে।
আলো ঠিকই দেয়, ছায়া
অবশ্যই।

'তোমার মা'

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

তাঁর ছায়া তাঁরই মতো থাকে
উঠোন, বাগান, শান বাঁধানো ঘাটে
সন্ধ্যা যখন নামে
হাতের মুঠোয় কমলালেবু, কমলালেবুর ঘ্রাণে
দীর্ঘ চুলে গন্ধ-বাতাস খেলে
আমার তখন কী-ই এমন বয়স! রাত পোহালে
একটি কোয়া যত্ন ক'রে খাবো—
পাতে যখন পড়বে মাছের পেটি
নাকের ডগায় ঘামের বিন্দু মুছে
'জল্‌দি বাবা, বেলা অনেক হলো!'

বেলা অনেক হলো। এখনো তাঁর চোখে
কতোই বড়ো আমি—
চশমা খুলে আঁচলে কাচ ঘসে
'তোমার চুলেও পাক লেগেছে'
হাসির সঙ্গে মিলিয়ে ঠাণ্ডা ব্যথা
হাতের সুতো আলগা হ'য়ে আসে
ওড়া পাতায় সূর্য শেষের আলো
'তোমার ভুরু বাবাজানের মতো।'

'তোমার শখ, তোমার স্বাদ আর কে জানে বেশি,—
অনেক দূরে এসে—মেঘে-মেঘে আকাশ নিচু হলে
পানের পাতা ফোঁটার ভারে কাঁপে,
মোহ এবং মায়ার টানে
শোক-দুঃখ এক জীবনে উঁচু-নিচু হ'লে
প্রতীক্ষা তার জ্যোৎস্না নিয়ে হাঁটে;
সংকটে আর নিঃসঙ্গতার ষোলো তলায় ব'সে
আমি কেবল চিঠির পাতা খুলে
ভারী চোখে পড়ি : 'তোমার মা'!

মা

অসীম সাহা

সময় হয়নি, তবু দূরের আকাশখানি ঢেকে গেলো ঘন কালো মেঘে।
বছর ঘুরতে না ঘুরতেই
সবুজ পাতা হলুদ হয়ে খসে পড়তে লাগলো ঘাসে,
অসংখ্য কাক 'কা-কা' শব্দে ডেকে উঠলো হাওয়ায়।
তখনই আকাশ থেকে চাঁদের রুপালি ছায়া নেমে এলো দিগন্তের কোলে।
উষ্ণ আগুনে দগ্ধ হলো পৃথিবীর মাটি
বিপদের আশঙ্কায় আমার চোখের পাতা নড়ে উঠলো একবার।
ঠিক তক্ষুনি তুমি এসে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়ালে শিয়রে,
তোমার কম্পমান হাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে উঠে এলো মাথার উপরে;
তোমার মধ্যে আমি দ্বিখণ্ডিত মৃত্তিকার স্পষ্ট ছায়া দেখলাম।

মাত্র কদিন আগেই তুমি গেলে অশ্রুসজল চোখে একাকিনী
তোমার অভিমানী মুখে ফুটে উঠলো না-ফেরার গান
যেন যাবার জন্যেই তুমি এসেছিলে।
অথচ আর কটা দিন পরেই ঘুরে আসবে সেই দুঃখময় রাত
তোমার ছায়ায় আমরা সবাই পাখির ছানার মতো
মুখ লুকোবার জন্যে ছুটে যাবো প্রাচীন আঙিনায়,
যেখানে তোমার নিঃসঙ্গ দিন কাটে—ভয়ার্ত রাত কাটে একা:
ঘরের পাশে গাছপালাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে
প্রবল বেগে ছুটে যায় দূরের বাতাস;
তোমার চোখের জল হয়ে ওঠে নদী।
আর তোমার শরীর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরে পড়ে।
তোমার সেই রক্তকণিকার ভেতর থেকে জেগে উঠি আমি।
বারবার মনে হয়, তোমার রক্তে জন্ম নিয়ে
যে পৃথিবী ও প্রকৃতি আমার ভেতরে লুপ্ত হয়ে গেছে
যে ঝর্নার উৎসমুখ খুলে গিয়ে পতিত হয়েছে স্রোতস্বিনীতে
তারই আর এক নাম বুঝি রক্তগঙ্গা।

সেই নদীর তলদেশ থেকে উঠে আসা আমি তোমার অবুঝ সন্তান
আর তুমি আমার মা
মৃত্তিকার উপমায় আমার চিরকালের জননী
সর্বংসহা পবিত্র রূপের মতো জ্বলে উঠছো গভীর উপমায়।

আমি তাই নতুন করে তোমার ভেতরে জন্ম নেবার জন্যে
মৃত্যুকে বারবার আলিঙ্গন করছি;
আমি তাই মৃত্যুর ভেতর থেকে তোমার রক্তের মধ্যে
প্রস্ফুটিত হবার জন্যে জন্মকে আলিঙ্গন করছি।

তুমি আমাকে আর একবার জন্ম দেবে না, মা!

আম্মা

জাহিদুল হক

আম্মাকে ডায়াল করি, মনে হ'লো যেন কত যুগ
তাঁর কণ্ঠ শুনিনি; দেখিনি মুখ তাঁর অপরূপ;
তাঁর থান, আঁচল ছড়াতো গন্ধ, জ্বালাতো যে-ধূপ
শুঁকিনি কী দীর্ঘ কাল; স্মৃতিগুলো যেন সোনামুগ
হ'য়ে জ্বলে, তারকা খচিত করে প্রাণের আকাশ!
আম্মা, আমি ভালো আছি; এ দেশও তো মাতৃভূমি এক,
হোমসিক নই আমি : কোলোন ভোলাচ্ছে পরবাস
কী উষ্ণ আদরে; আম্মা, আপনি ভালো?

তখনি বারেক

দুঃখরা শনাক্ত করে অনিকেত আমার জীবন,
যার কোনো দেশ নেই, গ্রাম কি মহল্লা নেই যার;
কী করে, কোথায় যায়, ইতিবৃত্তহীন জমে ক্লেশ:
টেলিফোনে তাঁর কণ্ঠ আর্দ্র করে আমার ভ্রমণ,
বৃষ্টি পড়ে এ শহরে, পৃথিবীতে জমায় তুষার;
আমি জানি আমার আম্মার মুখই আমর স্বদেশ।

সতত মা জননী তুমি

কাজী রোজী

হে সন্তান সম্ভবা নারী
সতত মা জননী তুমি
তোমাকে অভিবাদন।

তুমি এমন শিশুর জন্ম দাও
যে খোলা জানালার রোদ কেড়ে নিয়ে
ক্রমাগত বেড়ে উঠতে পারে
মাতৃদুগ্ধ পান করে
বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট হতে পারে
মনন মেধায় শক্তি বৃদ্ধির সহায়তা পেতে পারে।
চলতে পারে নদীর মতো
ভাঙতে পারে
গড়তে পারে
পলে পলে লড়তে পারে।
ডানে বায়ে তাকিয়েই অতীতকে তুলে নিতে পারে
ঋজু প্রজ্ঞার আড়ালে লুকানো
ঐতিহ্যের মতো।

হে সন্তান সম্ভবা নারী
যদি সে জন্ম নেয় পীত বর্ণ নিয়ে
ওর পাশে রেখো এক কৃষ্ণকায় শিশু
কালো রং সয়ে সয়ে
ভুলে যাবে ক্লেদাক্ত বেদনার রং।
বৃষ্টিতে ধুয়ে নিও
রৌদ্রে পুড়িয়ে নিও
বানের শব্দে ওর দু'কান ভরিয়ে দিও
অসীম সাহস নিয়ে
সদর্পে এগিয়ে যাবে শিশুটি তোমার

শিশুটি পেরোবে তার
শৈশব
কৈশোর
যৌবনকাল।
খুঁজে নেবে প্রেমিক সৃজন
খুঁজে নেবে মিছিলের মুখ
খুঁজে নেবে রাস্তার মোড়
ভেঙে দেবে সন্ত্রাসী ঘোর বিদ্রোহী সুত হয়ে।

হে সন্তান সম্ভবা নারী
এখন থেকেই তুমি কথা বলো শিশুটির সাথে
একটু একটু করে জানাও ওকে
আগামীতে পৃথিবীর কতটা শান্ত রবে
কতটা ভরিয়ে দেবে মানুষের হাহাকার।
গর্ভাবস্থায় ওর চোখ খুলে দাও
যতটা আঁধার পাবে বাড়িয়ে দুহাত
ততটাই আলো পেতে চাইবে
যতটা কষ্ট পাবে হৃদয় ভরে
ততটাই আনন্দ পেতে চাইবে
যতটা যত্ন দিতে পারবে এখন
ক্রমাগত ফুরোবে সে ক্ষমতা তোমা'র
শিশুটিকে জানতে দাও
বুঝতে দাও
বাঁচার উৎসটুকু অনুভবে রাখতে দাও ওকে।

হে সন্তান সম্ভবা নারী
সতত মা-জননী তুমি
তোমাকে অভিবাদন।
তুমি এমন শিশুর জন্ম দাও
যা এতদিন বলা হয়নি
তা যেন সে বলে যেতে পারে
হাজার বছর পরেও যা বলা হবে একদিন
তা যেন সে বলে যেতে পারে।

বাড়ি যাবো, বাড়ি

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো, বাড়ি...
পথ ছাড়ো অন্ধকার, পথ ছাড়ো দূরত্বের দূরগামী পথ
বাড়ি যাবো, বাড়ি...

বৈশাখের বটবৃক্ষ তালুতে কপোল রেখে বলে, 'হায়,
এ-ছেলেকে কিছুতেই ফিরতে দেয়া চলবে না', নগরীর পথ
দালানের পরভৃত কোকিলের পঞ্চস্বর ডেকে বলে, শোন
তোর কোন বাড়ি নেই,
অন্তরঙ্গ উচ্চারণে যাকে বলে হোম
সুইট হোম সে আজ ভেসে গেছে বিস্মৃতির যমুনার জলে।
তোমার আসার জন্যে কেউ নেই হাট করে ঘরের দরোজা,
পলাতক সময়ের ঝুঁটিবাঁধা কাকাতুয়া
দাঁড় ছেড়ে পালিয়েছে সেই কবে : ঘাটলার কাঠগুলো
কবে কোন চোর
নিয়ে গেছে অন্তঃপুরে, চুলোর হৃদয় জুড়ে শান্তি দেবে বলে।

তবু বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো, বাড়ি...
পথ ছাড়ো সুসময়, প্রতিশ্রুত সুখনিদ্রা, নিমগ্ন বালিশ,
পথ ছাড়ো জীবনযাপন ব্যথা, পথ করে দাও।
আজ যাবো
ঝিনাই নদীর জল হাঁটুতে কাপড় তুলে পার হবো,
মধ্যরাতে ডাক দেবো
মা মাগো এসেছি আমি। সেই কবে গভীর নিশীথে
তোমার নিমাইপুত্র ঘর ছেড়েছিল, আজ কাশী বৃন্দাবন
তুলোধুনো করে ফের তোর দীর্ণ চৌকাঠে এসেছি।
আমার কিছুই হলোনা, মা, লোকে বলে আমি ভীষণ নারাজ
জীবনের তপ্ত গালে চুমু খেতে,

আমি ভিতু জীবনের দ্রুতগাড়ি বৃদ্ধাঙ্গুল তুলে কেন থামাতে পারি না,
হিচহাইকিং করে কত লোক চলে গেলো দূরতম গন্তব্যে, তবুও
আমি একা এখানে দাঁড়িয়ে আছি,
বাসভাড়া হয়েছে লোপাট অন্য কারো কলাবতী আঙুলের হাতে,
তবু আমি বাড়ি যাবো, বাড়ি
এ বিশাল পৃথিবীতে এ মুহূর্তে অন্য কোন গন্তব্য তো নেই।

পথ ছাড়ো অন্ধকার, পথ ছাড়ো দূরত্বের দূরগামী পথ
বাড়ি যাবো, বাড়ি...

মাতা বসুমতী শ্রীচরণেষু

আবিদ আনোয়ার

ডাকিনী প্রৌঢ়ার মতো
এত কেন খিটমিটে তোমার স্বভাব?
অতৃপ্তির ঘুণপোকা ঢুকেছে কি বুকের ভেতরে?
এখন প্রকাশ্যে তুমি ভয়ানক শব্দ করে তৃষিতের চোখের কাছেই
ছুড়ে দাও জলের গেলাস, সাজানো ফুলদানি, মায় আমিষের গন্ধমাখা
ভাতের বাসন। সারা মুখে রেখাঙ্কিত পাপের দ্রাঘিমা অশুভ চিহ্নের মতো
দিনে দিনে বাড়িয়ে চলেছো; কপালের বলীরেখা এতটা কুঁচকে রাখো—মা ব'লে
ডাকবো তারও সাহস পাচ্ছি না। অপার শূন্যতা-ঘেরা নীলিমার বৈতরণী মিছেমিছি
পাড়ি দেয় এ তোমার ভুল-পবনের নাও;
কখনো সিংহীর মতো
চোখ তুলে
এমন

যেন
জীবন্ত
অগ্নিগিরির
গনগনে জ্বালামুখ ফুঁড়ে এখনই বেরুবে
অন্তস্থিত আক্রোশের লাভা—নাকি সেই দূর-প্রাচ্যের
অশান্ত আকাশে ধূমায়িত দুই ভয়াল কুণ্ডলী মা তো চোখের
মণিতে এসে ঢুকে পড়েছিলো, **পোড়ামুখী**, কখনো কি হাসবি না আর?
নাকি শেষে তছনছ করে দিবি সাজানো সংসার! পাপিষ্ঠা মায়ের
মতো গলা টিপে হত্যা করে প্রতিটি সন্তান নিজেও ঝুলবে তুমি
অর্থহীন সৌরবিশ্বে অনাগত কালব্যাপী
নিস্পন্দিত গ্রহের মণ্ডলে?

মা

আতাহার খান

আমার মায়ের শাড়ির আঁচলে পাতা ছোট আর
সাদামাটা কোলে কী অদ্ভুত এক মোহ, মিষ্টি মায়া,
শুধু টেনে নেয় কাছে; ওমের ভিতরে সবকিছু
ক'রে দেয় একাকার। সেই ছোট কোলে শিশু হ'য়ে
বসবাস করা এখনো আমার কাছে খুব প্রিয়।
কতটুকুই বা তার আয়তন, বেশি নয়, দৈর্ঘ্যে
মাত্র দুই ফুট আর প্রস্থে দেড় ফুট। এতো ছোট
পরিসর, তবু তার আশ্চর্য ক্ষমতা, গাঢ় এক
চুম্বকের মতো শুধু পিছু থেকে টেনে ধ'রে রাখে,
কিছুতেই বের হ'য়ে আসতে পারি না, যাবতীয়
ঝড় আর রোদ আঁচলে আগলে এই ছোট কোলে
সারাক্ষণ পাতা থাকে না শীত না উষ্ণ জলবায়ু;
জায়গাটি সবচেয়ে নিরাপদ অভয় আশ্রয়।

তার দু'হাত তালুর রেখায় দেখো মিশে আছে
আদিগন্ত সবুজ শস্যের কচি পাতার বাতাস,
মা যখন সেই দুই হাত মেলে আমাকে বাঁধেন,
ছোট দুগ্ধ—শিশু ভাবেন তখন আমি প্রান্তরের
অবারিত ধানের শীষের স্পর্শ জড়িয়ে সামনে
আরো দূর, জীবন্ত নদীর ঘভীর পানির ঘ্রাণে
খুঁজে পাই উপদ্রবহীন এক নতুন পৃথিবী;
বলি, আর কত তুমি অবাধ স্নেহের খরস্রোতে
খুব ছোট শিশু ভেবে আর্দ্র ক'রে রাখবে আমাকে?

আমার মায়ের চোখ মমতায় পুণ্য হ'য়ে আছে
বিশাল নীরব মেঘমুক্ত সাদা আকাশের মতো!
আমি যেখানেই যাই, এক থাকি, তার দুই চোখ
সন্তানের মঙ্গলের জন্য থাকে মগ্ন, ভারাক্রান্ত।
মা কিছুতে বুঝতে চান না তার ছেলে বেশ বড়,
বয়ঃপ্রাপ্ত, হেঁটে পাড়ি দিতে পারি ব্যস্ত রাজপথ,
অবলীলাক্রমে জেব্রাক্রসিং পেরিয়ে উল্টোমুখী

ফুটপাথ ধ'রে মিছিলের আগে পৌঁছে যেতে পারে
গন্তব্যের শেষে। তবু মা থাকেন ভীষণ উদ্বিগ্ন;
সারাক্ষণ আমাকে রাখেন ধ'রে শুধু চোখে-চোখে!

মা কি ক'রে জানবেন তার মতো ভালো মানুষেরা
কেন এ নগরী থেকে দ্রুত নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে?
কেন ভালো মানুষেরা এতো কম আয়ুপ্রাপ্ত হয়?
এক বুক ভালোবাসা বিকোয় অর্থের বিনিময়ে?
তার মোটে জানা নেই কেন তিলোত্তমা নগরীর
প্রত্যেকেই প্রাণহীন যন্ত্র? কেন ব্যস্ত শব্দ তুলে
তারা কংক্রিটের মতো শক্ত বাক্য ব্যবহার করে?
আমার মায়ের তো এসব জানবার কথা নয়,
তার কাজ ধ্যানে-জ্ঞানে সন্তানের মঙ্গল কামনা।
তিনি তার সুতি শাড়ির আঁচল পেতে শুভ্র কোলে
আছেন বিছিয়ে ন্যাশনাল পার্কের দূষণমুক্ত
বাতাসের ঘ্রাণ। মায়ের কোলের মতো কোথাও কি
নেই জ্যোৎস্নাপ্লুত নেই নিরুদ্বিগ্ন শিশুর আশ্রয়?
এখন কোথায় পাবো ফিরো স্নেহের উৎস থেকে
উঠে আসা শৈশবের ভয়হীন প্রিয় দিকগুলি,
মা, তুমি আমাকে ফের তুলে নাও, রক্তপাতহীন
অভয় ওমের মধ্যে, শীতল আঁচল পাতা কোলে!

আমার মা

জেরিনা আখতার

আমার মা-কে তো আমি বাঁচিয়ে রেখেছি প্রতিদিন
অমোঘ প্রান্তর জুড়ে আলো আর হাওয়ার
মাটির অনন্ত প্রাণ কুসুমের সঘন আধার
জুঁই চারা প্রিয় মা-যে ক্রমে বেড়ে ওঠে অমলিন।
বন্দীর অতীত সীমা তার মুক্ত সতেজ দিগন্তে
নিঃসঙ্গ স্বাধীন সত্তা জীবনের সমূহ সন্ধিতে—
খুব দীর্ঘ আর ঋজু আমার মায়ের এভাবে স্থিতি
বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ আণবিক ঝড়ের ভ্রূকুটিতে।

হাজার ঘাতক থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা ধন
গোপন ভুবনবাসী আমার মায়ের কিছু ভুল
যদিও অলক্ষ্যে থাকে, পৃথিবীর কুটিল বাতাসে
নুয়ে পড়ে কেঁপে ওঠে যুগপৎ তীক্ষ্ণ শান্ত মন।
হাতে তবু বদ্ধ নয় হাতের বাইরে শুভ্র প্রাণ
সূক্ষ্ম মূল্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে বাজে তার শব্দহীন গান।

এক মা স্বপ্ন

রবীন্দ্র গোপ

মা এক ডিঙি নৌকো দুগাছি আমি তাঁর বুকে বসে
নদীতে ঢেউ বিপরীত স্রোতে মার বুকে ভাসছি
ঝড় শন শন নদীতে হাওয়া হুহু আর্তনাদ
উলঙ্গ নাচছে জলের রাক্ষুসী রক্তাক্ত নখরে।
মায়ের বুকে করুণ শিশু, মা দুলছে অন্ধকারে
মা কাঁপছে ঝড়ের তাণ্ডবে, চারদিকে আহাকার
মায়ের আঁচলে লাগছে হাওয়া স্নেহের পাওয়া
কাঁদছে মা ডাকছে আগামী ভালোবাসা সূর্য লালে।
আজ মা আমার হলদে পাতার দেখছে বয়স
মৃত্যুর রক্তিম চোখেব দাপট অসুখের তেজ
দেখে দেখে কুকড়ে মুকড়ে স্মৃতির পাতায় দুলে
নগ্ন শিশু এক বসে আছি বুভুক্ষু মায়ের কালে
সভ্যতা বিমুখ আঁধারে বিলীন যৌবনের কাল
রক্তলাল এব মা সূর্যের স্বপ্নবুকে শুধু ছুটি।

মায়ের চোখে

দাউদ হায়দার

আমার মায়ের চোখে আমি ছাড়া যেন পৃথিবীর কোন সুন্দর-ই
সহজে লাগে না আর তাঁর কাছে।
দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল ভালবাসা সমস্ত শরীরে রেখে
বেঁচে থাকেন পরম তৃপ্তিতে—
কখন তাঁর সোনালী প্রহর গড়িয়ে যায়; দৃষ্টি নেই সে দিকে
অথচ মায়াবী চোখে আমাকে নিয়ে খেলা করেন সারাদিন
এবং
মেলে রাখেন আত্মীয় পাড়াপড়শির কাছে!

আমার মায়ের চোখে কোন দুরন্তপনাই ধরা পড়ে না কখনো; যেন
বিরাট গুণের অধিকারী
সুবোধ বালক আমি
ঠোঁটস্থ সকাল বিকাল তাঁর আমার সমস্ত কাজ-বুঝি তাই
পরম স্নেহে চোখে মুখে ছুঁয়ে যায় আশীর্বাদের নরম হাত!

আমার মায়ের চোখে আজীবন দুধের শিশুই রয়ে গেছি আমি—
এখনো রাত্রিকালে তিনি সেই শিয়রে বসে দেখে যান; গেয়ে যান
ঘুমপাড়ানিয়া গান!

একটি সবুজ তারা

শিহাব সরকার

মা আছেন আকাশে নক্ষত্রের মেলায়
কেউ জানে না, আমি জানি কোন তারাটি
আমার মা,
ঐ তারার আলোতে আমি পথ চলি
অন্ধকারে, ঝলমলে, দিনের ধন্দে

তারাটি ফুটেছে আটান্ন সালে,
মধ্যরাতে করাচির মার্টিন রোড ভরে গিয়েছিলো
অসহায় কান্না আর হতাশ্বাসে
হতবুদ্ধি পিতা চেপে ছিলো ঘুমভাঙা
বালকের হাত
বিছানায় নিস্পন্দ শরীর
সহসা মা হয়ে যান সবুজ শিখা
মা নেই চোখের সম্মুখে আমার
মা উঠে গেছে আকাশে,
বালকের কানে সমুদ্র গর্জায়
সেই থেকে কেবলি ঝড়, ভূমিকম্প, বাঘনখ।
আশ্চর্য, প্রতিবার বেঁচে যাই
ঘাতকের হাত থেকে খসে গেছে কিরীচ
ছোবল ভুলে গা ঘেঁষে গোক্ষুরে চলে গেলো কতবার
পথ হারাতে হারাতে চেনা দরজায় গিয়ে
নির্ভুল কড়া নেড়েছি।
সবুজ নক্ষত্রের আলোয় বধ্যভূমি
হয়ে যায় পবিত্র বাগান
সকলে জানে তুমি করাচিতে চিরনিদ্রায়
আমি জানি, আম্মা, তুমি আছো আমারই ওপর
অনন্তের গোপন হরিৎ তারা।

শিকারি হৃদয়
মুজিবুল হক কবীর

কুয়াশা, নদীর পাড়;
টুকরো চাঁদের মাংস কাশবন, জল;
জলের গভীরে ছায়া ঈষৎ হেলানো,
নক্ষত্র-কাঁপালো সমুদ্র-আকাশ,
শীতার্ত হাওয়ার ছুরি
কাটে শিশিরের নিদ্রিত কুয়াশার নাড়িভুঁড়ি,
জ্যোৎস্না লেহন করে যুবতীর দেহ,
ঘাতক জানেনা
কোন্ শিল্প নিয়ে এসেছে নদীর পাড়ে?
মধ্যরাতে
যখন ঈশ্বর নেমে আসেন ঝুলন্ত চাঁদে,
তখন কে তাকে বয়ে নিয়ে আসে
মুখরা নদীর পাশে?
হয়তো বা ঘাতক, নয়তো অন্য কেউ।
যুবতীর দেহে গোধুলি-রঙ-ছোপানো শাড়ি,
মুখ
বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির মতো আবিলতাহীন,
চোখ দুটো ঝিনুকের মতো খোলা, একেবারে স্থির;
জমেছে ওখানে ঘোলাটে শিশির;

যুবতী এখন একা কবিতার ঘরে
কার্য ও কারণরহিত, কল্পিত-সংসারে,
তার
চোখের তারায় বসেছে নিঃশব্দে মন্দাক্রান্ত 'অদ্ভুত আঁধার'
শিকারি হৃদয় তার
দেয় কি সাড়া বহুল ব্যবহৃত উপমায়?
জ্বলন্ত নক্ষত্র পরেছে খোঁপায়।

সমীকরণ

ফারুক মাহমুদ

তোমার মুখের মত সুস্থির কোন মুখ
আজো আমি পাইনি। কারুকার্যহীন
স্থিত মেজাজের অতি সাধারণ; তবু অবিকল্প ব'লে
তোমাকেই দেখেছি নারী— প্রশ্রয় প্রশ্নাতীত।

স্বদেশের মাটি ছাড়া এমন পাইনি কারো
সর্বংসহ। বুকের জমিন। কে আর দেবে বল
স্বার্থপরতার জটিলতাহীন ছায়ার সৌরভ
তোমার করতল আর মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নমন্ত্র ছাড়া।

শুধু একবার বিষপাত্রে নেমে ছিল জাঁকে।
সক্রেটিসের ঠোঁট (তা'তেও বোধ করি
প্ররোচনা ছিল প্রজ্ঞার), তুমি নির্বিচারে
বহুবার; আমাকে দাও শত বিষাদের উপশম।

মা আমার ছায়াবৃক্ষ

বিমল গুহ

সমস্ত কর্মের শেষে ক্লান্ত দেহ নুয়ে পড়ে ঘাসে
চোখ বুজে আসে ঘুমে, সোহাগ-কাতর এই
বিশাল বৃক্ষের ছায়া ঢেকে রাখে দুপুরের রোদ।
ডালপালা হাওয়া দেয়, পাতা নড়ে
মায়ের আদরে আমি সিক্ত করি নিদ্রাচ্ছন্ন দেহ
এই হেমন্তের রোদে।
দুপুর ঘনিয়ে এলে সন্তানের প্রতীক্ষায়
মায়ের দু'চোখে ভাসে বরষার মেঘ,
মেঘে ও দুপুরে মিলে মায়ের দৃষ্টি মেঝে গড়াগড়ি যায়।
চৌকি-বারান্দায় বসে আকাশের সিঁড়ি গোনে মা
দীর্ঘশ্বাসে ঘরময় কম্পমান ধীর হাওয়া বয়,

আমার মায়ের মুখ—সেই ছবি
আমার জাগ্রত সত্তা অস্তিত্বের গান।
মা আমার পল্লবিত বৃক্ষ—এই মাথার উপরে
পেতে আছে স্নিগ্ধ ডালপালা
সমস্ত ঝঞ্ঝায় রোদে ঝড়োমেঘে
দু'হাতে আগলে রাখে সন্তানের সমস্ত আপদ।
মা আমার ছায়াবৃক্ষ—আমার উন্মেষ।

মানব-খণ্ড

মাহবুব বারী

মা আমি চললাম
আমাকে তুমি বেঁধে রেখেছ, আষ্টেপৃষ্ঠে
তোমার জটাজালে। আমি মুক্তি চাই
আমাকে দাঁড়াতে দাও পৃথক করে
স্পষ্ট করে নিজের ধড় নিজের মুণ্ডু নিয়ে
দাঁড়াতে দাও। আমাকে আর আটকে রাখতে পারবে না
তোমার নাড়ির জাল ছিন্ন করে
তোমাকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে রক্তাক্ত করে
মা, আমি চলেছি তোমার গর্ভের আমূল
কম্পিত করে, তোলপাড় করে, ছিন্নভিন্ন করে
মা, আমি চলেছি তোমার এই শ্বাসরুদ্ধকর
বিপুল অন্ধকারময় বেদনা থেকে পরিত্রাণ পেতে
মা, আমি ছুটে চলেছি তোমার গর্ভ-পিণ্ড থেকে
আর এক অন্ধকারময় পৃথিবীর গর্ভের ভেতরে দিয়ে
আলো হাতে আমি এক মানব-খণ্ড।

মা

আবিদ আজাদ

'মা', এই একটি শব্দ ছাড়া তোমাকে ধারণ করতে পারে,
আর কোনো শব্দ নেই মানুষের ভাষার অভিধানে
এই শব্দের মধ্যেই আমার হাসি ও কান্নার নীলিমাময় আশ্রয়
এই শব্দের মধ্যেই বার বার ঘূর্ণি তুলে দাঁড়ায় আমার মুক্তি ও স্বাধীনতা

ছিলে শিশু, ভোরের বয়সের মতো নতুন, একদিন
কিশোরী হয়ে একদিন মেলে দিয়েছিলে তুমিই সবুজ ডালপালা
যৌবনে, তোমারই কল্পনার রঙধনু পরিয়ে দিয়েছিলে তুমি আমার কোমরে
তোমার আঙুলের ফোঁড়ে সংসারের ছিন্ন তেনাতাগায় ফুটে উঠতো ঝকঝকে তারা
কালো কাইতনে তুমি আমার কোমরে গলায় বেঁধে দিতে সাদা কড়ি আর তামার তাবিজ
আমার নবাগত পা দুটির জন্য কণ্টকমুক্ত একমাত্র পৃথিবী ছিলো তোমারই নিরাপদ
দুটি করতল
আর অজ, তোমাতেই সম্পূর্ণ তুমি তুমিই প্রকৃত ঘর, তুমিই স্বদেশ, মা আমার —

তোমার অপরাহ্নের আলো শুষে নেয় আমার জ্বর ও ব্যাধির উত্তাপ
তোমার উপস্থিতির মধ্যে আমার তরঙ্গক্ষুব্ধ পৃথিবীর অস্তিত্ব
মা, তোমার মুখ আমার আবহমান নিসর্গ, আর আমি তোমার একান্ত নির্ভর।

মা বলতেন

নাসির আহমেদ

মা বলতেন—মৃত্যু এক তৃতীয় দরোজা
তার ওপারে রয়েছে এক বিপুল বিস্ময় জীবনের।
যারা নির্ভীক জীবনবাদী তারা যায় বীরদর্পে মাথা উঁচু
হাস্যোজ্জ্বল ঝরে নক্ষত্রের মতো অকস্মাৎ।

এবং সগর্বে তিনি বলতেন আরো
মৃত্যুকে লঙ্ঘন করে যারা এই নশ্বর জগতে
মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে যায় বন্ধুর মতন
তারা পারে ছিঁড়ে আনতে অতল দিঘির সেই
লাল পদ্ম আর—
দৈত্যের পাহারা থেকে
জীবনের প্রিয়তম ফুল—স্বাধীনতা।

নক্ষত্রের মৃত্যু নেই; অনন্ত অসীম সৌরলোকে
তারা শুধু এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যায়।
মানুষেরও মৃত্যু নেই—যারা মৃত্যু ভয় মুছে ফেলে
মৃত্যুঞ্জয়ী ছবি আঁকে জীবনের
দৃশ্যত আড়াল তারা
চিরকাল বেঁচে থাকে মানব অস্তিত্বে।

তবে কি আমার মা-ও ওই দূর দিগন্তে নক্ষত্র?
বিশ শতকীয় কালো চিতার থাবার মুখে
সন্ত্রস্ত সন্তান তার মৃত্যুভয় ভয়ে কতটুকু সমর্পিত
অন্ধকারের কাছে—তাই দেখে দেখে
দীর্ঘশ্বাসে আষাঢ়ের আকাশ কাঁপান!

উনুন

ত্রিদিব দস্তিদার

উঃ উনুন, আঃ উনুন
তোমার বুকের রক্ত নিয়ে
নাম রেখেছি আগুন।

আগুন-বেদি নিয়েই আমার তাপ
যেথাই অন্ন রক্ত বাড়ে
মধ্যবিত্ত সংগ্রামে যার
নুন-পান্তার চাপ।

আঃ উনুন, উঃ উনুন
তোমার কাছেও ঋণ যে আমার
মা-জননীর নুন।

মা যে আমার তোমার পাশে
কালি-ঝুলি মুখে
তোমার উষ্ণ আবেগ খোঁজেন
সন্তানদের দুখে।
উঃ উনুন, আঃ উনুন
তোমার বুকের রক্ত নিয়ে
নাম রেখেছি আগুন।

মাকে

হাবিবুল হাসান

মানুষকে
প্রকৃতরূপে জানতে গিয়ে
আমি জানতে পারিনি তোমার ও আমার
সম্পর্কের কথা

তুমি
আমার মা
তুমি
কি জলছলছল শব্দ শুধু একটি শব্দ
শুধু একটি শব্দ
নাকি
মায়াময় মা
নাকি
তুমি শুধুই জলছলছল মায়াময়
ও মহিমাময় সহানুভূতিশীল
তা
কি কোরে হয়
তুমিতো রক্তমাংসের মানুষ
মানুষেরই মতো একটি নারী
স্বার্থপর লোভী ও অসহায় মায়াময়
নিষ্ঠুরনীল
প্রতিহিংসাপরায়ণ আদি ও অকৃত্রিম
মা
তুমি কি একটি শব্দ মা
তুমি কি শুধু শব্দ
না
তুমি কাঁঠালিচাঁপার গাছ
একটা শেফালি ফুল
একটা ভালো লাগার দিন

তুমি
কবির লেখা এক অমীমাংসিত
পদ্য
তুমি
প্রকৃতির এক আধখানা
ফল
একটি গাছ
যেখানে প্রতি বসন্তের ফুল ফোটে না
আবার কখনো ফুটে ওঠে
বর্ষায়

তুমুল
বৃষ্টিতে টিনের বাংলোতে একা একা
তুমি এক নীরব কবিকারো কাজে কখনো করোনি প্রকাশ
তোমার
ব্যর্থ প্রেমের গান

বিশ্বাসের বোঁটা

আবু করিম

ফলভারে নতা জলপাই শাখা জানালার পাশে ঝুঁকে আসে
গর্ভবতী নারী যেন সমর্পণ করে মাটির সকাশে স্বীয় ভ্রূণ
সবুজ পাতার ঘেরাটোপে ফ্যাকাশে সবুজ ফল
কিশোরীর কুচযুগ যেন প্রথম প্রণয় স্পর্শে কম্প্র বিহ্বল
বাতাসের আলুথালু ছোঁয়ায় ঈষৎ দোলায়িত কাঁপে পাকা রক্তিম পাতা
ঝরেও বা কিছু নীচে উঠোনের ঘাসে
যেন সূর্যরশ্মি হাসে আশ্বিনের ঈশ্বরী আকাশে
পতিত পত্রে এতো উজ্জ্বল রং শুধু জলপাইয়ে দেখি

বোঁটার বন্ধন বড় দৃঢ়
পাখির আহার হবে পেকে তবু পড়বে না ঝরে
অঝোর বৃষ্টি নামে মাঝে মাঝে হোমনার তিতাসের কোলে
জীবন ক্ষুদ্র হয়ে আসে রক্ত হিম
অন্তর্গত ফল কেবলই ঝরে পড়ে
জলে কুয়াশায় মানবিক ঘুমে
পারি না থাকতে দৃঢ় জলপাই ফলের মতো
বিশ্বাসের নিটোল বোঁটায়॥

ভূমিপুত্র

সমরেশ দেবনাথ

গোর্দাহলুই ডাকে, তার হৃদয় নামক উৎসবে
শহুরে ত্রিভঙ্গ আমি, যাবো—
জলপিপিদের বিপুল ভূ-ভাগে
সেই ছলাৎ জলের গন্ধে—
ভাপাপিঠার মতো ফুলে ওঠা
ভেঁপের মমতায়!

গ্রামীণ হালটে বাকুল্লা এখনো ডাকে—
এখনো ডাকে চিকন চাকন রমণী
ডাকে জয়গুণ আর তার যত ব্ল্যাকহোল!
তারপিন তেল পাছায় মেখে
বাপজান পালানে অর্ধশায়িত—
বিকেলের কোমল রোদ তাকে আরাম এনে দেয়
বিশাল চাটাই পেতে আমার মা—
মেশ্‌তা পাটের গন্ধে ও গৌরবে
ভাত খায় আলুনি : —
আমাদের জন্মের এসব কেচ্ছাকাহিনী—
আঁতুড়ঘর থেকেই পাওয়া!

গিমাশাকের আশ্চর্য লোভে যেতে হবে—
যেখানে ছাগলনাদি
লাল ও কালো সাম্রাজ্য বিস্তার করে আছে—
গোলাপ জামের পেটের ভেতর পড়ে আছে
আমার পিতৃপরিচয়—
নিষাদের পুত্র আমি, বেড়ে উঠেছি
অষ্টিক চাষার জন্মের ভেতর—
এসব কিছু বাবু-সা'বদের কেতাবে পড়ে
দীর্ঘদিন পর এলাম মৃত্তিকা নগরে—
শরীরের চামড়া খুলে মিলিয়ে নিচ্ছি
ঠাকুর কুঁড়ার আঁঠাল মাটিতে—

পোয়াতি বিলের স্নানের গৌরব নিয়ে
আমার মা আমাকে জাগিয়েছে—
কিষান কন্যার হাতে পোয়া পিঠা খেয়ে
এই আমি যৌবন পেয়েছি—
প্রযত্নে-টযত্নে নয়, আমি সরাসরি ভূমিপুত্র।

** গোর্দাহলুই : বালি হাঁস জাতীয় পাখি // ছাগলনাদি : ফল*

আমার আকাশ-৪

মাহবুব হাসান

পালকি এসেছে
এ কি স্বপ্ন! নাকি?
খাকি পোশাক পরা বেহারা খৈনির মতন তারা-জ্বলা চোখ
একি স্বপ্ন! নাকি?

পালকি উঠোনে
ঢেকে দেয় কে তোমার কাপড়ে
ও কে, ও কে! মা?
দাদির নরম কালো রূপ কেন নক্ষত্রের মতো আমায় ডাকে?

কোন ফাঁকে খৈনিখোর বেহারা সকল
প্রচল সমাজে হাই-হুই হেঁকে
তোমাকে নিয়ে চলে যায়

নাইওরি চলেছো কোথায়?
কে তোমার চড়নদার মাগো?
আমি কী যাচ্ছি ভেসে চলেছি কি হেসে মামার বাড়ি?
কাড়িকাড়ি বাতাসে বাহন আমার কোথায়
কোথায় গেলো?

আমি তো চড়নদার
তোমার শামিল
মায়ের মমতা মাখা পাখায় চেপেছি
এ কি স্বপ্ন! না কি?
আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় গেলে
আমার আকাশ!

তুমি আমার মা
লুবনা জাহান

আমি তোমার কণ্ঠ থেকে আমার
ভাষা তুলে নিয়েছি খেলার ছলে.
আমি তোমার দু'চোখের প্রদীপ থেকে
জ্বেলে নিয়েছি অলক্ত আলোক শিখা
অগণিত নক্ষত্রের দীপালি জ্বালাবো বলে,
এক ছড়া অতুল্য সুন্দর মালা গাঁথার অভিলাষে
তোমার অশ্রু থেকে কুড়িয়েছে গোলাপি মুক্তোরাশি
যে মালা আলো ছড়ায় ফাগুনের উদাস বাতাসে
বুকের নিভৃতে; আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে
সে এক ছড়া মুক্তোর হার
আলো ছিটায় বৃক্ষলতা শহরের চূড়ায়।

আমার রাজকন্যা মা––
আমি তোমার শরীর থেকে রক্ত করবীর বীজ
তুলে নিয়ে বপন করেছি আমার রক্তঝাড়ে;
সাজিয়েছি এ দেহে ফুলের কেয়ারি অভিরূপ।

তুমি আমার মা—
আমার প্রথম কান্না ভীরু পাখির ছানার মতন
যার বুকে খুঁজেছিল আশ্রয়,
আমার কচি ঠোঁটে কথার ফুল ফুটিয়ে একদা
যে হৃদয়ে ফুটেছিলো সহস্র লক্ষ ফুল।
যার স্নেহ চুম্বন পাখির ঝাঁক হয়ে উড়ে যায় অনিবার
সুনীল আকাশ অরণ্যে

সে আমার মা—
পৃথিবীর সমস্ত গোলাপের সুঘ্রাণ যার আঁচলে––
এখানো আমি সেই ছোট্ট বেলার মত তোমার আদরে সযত্নে
হাতে বানানো সোয়েটারে কমলার গন্ধ খুঁজে বেড়াই
শীতের ভোরে হলুদ গাঁদা রোদে।
এখনো আমি বৃষ্টি ঝরা দিনে
জানালার কাছে মুখ রেখে বলি একমাত্র
তুমিই পারো আমাকে ফিরিয়ে দিতে
সোনার পালকে মোড়া আমার সোনালি শৈশব।

সে আমার স্নেহময়ী মা—
লক্ষ যে যোজন দূরেও তার গায়ের চন্দন সুবাস
আমাকে স্পর্শ করে অভ্রান্ত,
রাইন ও টেমসের বাতাসেও সুবাস ভাসমান
অগোচরে; পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী, জলেও
দেখেছি সে সুশীতল মুখচ্ছবি।
তুমিই আমার জননী জনম জন্মভূমি
তোমাকে ভালবেসেই মানুষকে ভালবাসতে শিখেছি
ভালবেসেছি টিয়া সবুজ প্রাণ জুড়ানো দেশ এক।
তোমার কবোষ্ণ বুকের উত্তাপ কেড়ে নিয়ে তোমারই
ভুবনে ফুল ফোটানোর খেলা চলেছে নিঃশব্দে,
জীবনের বাঁকে বাঁকে দিন রাত্রির মোহনায়।

সেই তো আমার মা—
যার আঙুলের খেলায় আমার সুখ দুঃখের বীণা
কখনো বেজেছে কখনো থেমেছে বেহাগ বাহারে।
সে আমাকে নিপুণ কারিগরের মতন একটু একটু করে গড়েছে।
এ দেহের কোষে কোষে জমেছে মমতাময়ী জননীর
ভালবাসার শিশির জল;
এ দেহলতা বেড়েছে এক বটবৃক্ষের ছায়ায় দিনের পর দিন
শীত বর্ষা বসন্ত হেমন্তে।
তুমি আছো বলেই মাটি ও আকাশ ভরা ভালবাসা
তুমি আছো বলেই কান্নার পাখিরা আজো
বাতাস ভেঙে উড়ে এসে মাধবী লতায় পালক ঘষে,
তুমি আছো বলেই আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তের
কাঁটাঝোপে নিত্য নুতন ফুল ফোটে অসময়ে।

তুমি আমার চিরশ্যামল মা—
একমাত্র তোমার সান্নিধ্যেই আমকে ফিরিয়ে
দিতে পারে সোনার কৌটোয় ভরা আমার হিরণ্ময় শৈশব।
স্নেহময়ী সে জননীর কাছে বার বার ছুটে যায় তৃষ্ণার্ত এ হৃদয়
রূপকাহিনীর ঝাঁপি নিয়ে সে কি আজো আছে অপেক্ষায়
যদি সোনার ছেলে মেয়েরা তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে?
সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠবে কি তার
নিদ্রামগ্ন শিশুরা অবোধ—
দুহাত বাড়াবে আমার মমতাময়ী দুহাতের সমাধানে?

মা আমাকে ফিরিয়ে নাও
মাহমুদ শফিক

অস্ফুট পাখির শিসের মতো
ব্রিজের ওপর দিয়ে
চলে গেছে একটি ধূসর রেলগাড়ি
মেঘের ওপারে ঘন বিদ্যুতের মতো
চকচকে বল্লম নিয়ে বসে আছি আমি
আমার হাতের দশটি আঙুল থেকে
অবিরাম ঝরছে বৃষ্টিধারা
মা আমাকে ফিরিয়ে নাও
খরশান রাত
দু টুকরো করেছে আমায়
ঘুম আর জাগরণে দু ভাগে আমি
আত্মার দহনে টের পাই
অন্য এক আলোর উদ্বোধন
মা আমাকে ফিরিয়ে নাও।

কাছাকাছি

মাহবুব কামরান

ডুবতে ডুবতে ডুবে যাই।
ডুবে যাই তোমার কাছে।
চারদিক মাপজোখ ঠিক করে
করাতে কাটি প্রতিটি দিন।

দর্পণের নির্ভারের ছায়ায়
তীক্ষ্ণ চাকু দিয়ে রক্তাক্ত করি
আপন প্রতিষ্ঠা
শৈশবে দেখেছো আমাকে
কৈশোরে দেখেছো আমাকে
যৌবনে দেখেছো আমাকে
তিরিশ বছরের এক একটি দিন
নিজেই নিজের ভিতর।

দুঃখ দিও না এই হৃদয়ে
কষ্ট নিও না ভুলের মাঝে
জীবনে-যাপনে খড়-কুটোর মতো
ভেসেছি জলের ঢেউয়ে।
স্মৃতির শরীর খুলে খুলে
হ্যাঙারে রেখেছি কত কথা
চল্লিশ বছর হেঁটে এসেছি
বৃষ্টির শীতল স্বপ্নের বিভোরে।

আমাকে আর কতদিন দেখাবে
নয় এর ভিতর দশ
ত্রিশূলের বাঁকানো ওষ্ঠে ছিন্ন করে
ফেলে দাও, এই অপবিত্র দেহটাকে।
আমি একটুও আড়াল করব না
তোমার কাছে।
যেখানে ভাসিয়ে দেবে
সেখানেই ভেসে যাবো
রঙিন মাছের মতো।

আর কত দেরে যন্ত্রণা
হৃদয়ের সরু চাঁদের ভিতর ভালোবাসায় ধরেছে উলু।
সোজা পথে টুকরো করেছি
অনেক বাথা
বৃক্ষের পতনে দেখেছি নিজের আদল।
চূর্ণ করেছি ভয়াবহ অন্ধকার।

আমাকে এখন বলতে পারো
পবিত্র মেঘের মতো
আমাকে এখন বলতে পারো
সব কথা নিজের মতো।

একটি সজল ছায়ামূর্তি

ইকবাল আজিজ

এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোনো ছায়াপথ থেকে
একটি সজল ছায়ামূর্তি ভেসে আসে—
হেঁটে আসে মহাশূন্য পার হয়ে।
মহাশূন্যে জটিল নক্ষত্রপুঞ্জ—
সৌরমেঘ সৌরঝড় প্রতিনিয়ত।
এখানে ওখানে কৃষ্ণগহ্বর আর কিছুদূরে
দু একটি ম্রিয়মাণ সাদা বামন নক্ষত্রের পাশ দিয়ে
একটি সজল ছায়ামূর্তি হেঁটে আসে পৃথিবীর দিকে

সন্তানের মঙ্গল কামনায় আজো জোছনার রাতে
গড়াই নদীর চরে সেই সজল মানবী হেঁটে বেড়ায়।
গড়াই ব্রিজের পাশ দিয়ে হুহু করুণ বাতাস
বয়ে যায়—
অনেক অনেক রাতে কুষ্টিয়া স্টেশন থেকে ট্রেন
মোহিনী মিলের পাশ দিয়ে মিশে যায় তেপান্তরে।
সেই মানবী হেঁটে বেড়ায়—
কখনোবা অতিশয় খেয়ালি সন্তানের জানালার পাশে
দাঁড়িয়ে থাকে
চারিদিকে গোলাপ আর হাস্নুহানার সুগন্ধ...
এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরের
কোনো ছায়াপথ থেকে ফিরে
সেই সজল মানবী একা একা হাঁটে—
পৃথিবী নামক গ্রহে তার সন্তান
আজ বড় বেশি মাতৃহীন—আজ বড় বেশি কষ্টে আছে।

সেই ছায়ামূর্তি আজো তার সন্তানের ছায়ার পাশে ঘোরে
স্নেহময় ছায়া হয়ে—
নিঃশব্দে কাঁদে তার সন্তানের জন্যে—
সেই ছায়ামূর্তি আমার মা!

মা

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

১

স্বপ্নের ফুল দিয়ে যে মালাটি গড়ি
সেটি মা তোমাকে দিলাম।
জন্মের নাড়ি কেটে একা করে
জীবনে দিয়েছ;
এই জীবনের স্বপ্নটুকু
মা-য়ের সমান দেশমৃত্তিকার পদতলে
রাখিয়া গেলাম।

২

তুমি চৈতন্যের তারাবাতি জ্বেলে জ্বেলে
শেষ হয়ে যেও না এখনি
অপরূপ সন্ধ্যায় অপেক্ষায় থেকে
জ্বলে যেও না একাকী
উৎসবের প্রাণ ছুঁয়ে আলো
তোমাকেই জ্বেলে দিতে হবে।

কিনে দেবে কত দামে

মোহাম্মদ সাদিক

বলেছিলাম সব কিনে দেবো. যা যা চাও পৃথিবীতে
সবই অর্থের বিনিময়ে লভ্য
তুমি বলেছিলে রাত্রি কিনে দেবে, বৃষ্টি অন্ধকার ভালবাসা আলো
বলেছিলে আমার শৈশব কিনে দেবে
আমার কৈশোর জোছনারাত, মা'র স্মৃতি
কিনে দিবে রৌদ্র ও শিশির শেফালিকা ভোর
বলেছিলে রাত হলে কিনে দেবে শেয়ালের ডাক, বেতবন
নাড়ার আগুন শীতের সকাল স্মরণীয় সন্ধ্যা

কিনে দেবে কান্না রক্ত কিনে দেবে মুক্তিযুদ্ধ দেশপ্রেম
দু'কূল ছাপানো ভালোবাসা, সালাম সালাম হাজার সালাম
কিংবা জয় বাংলা বাংলার জয় মা'র সেই
রাঙা দু'খানি পা
একটি মাছের চোখে চোখ রেখে জলের শিয়রে বসে থাকা সেই
অবিস্মরণীয় শিশুর সকাল
কিনে দেবে মাতৃদুগ্ধ
আম্মু আম্মু ঘুম কিংবা হলুদ বরণ হাত
এক চিলতে আকাশের নীল
আকাশ আকাশ তুমি আকাশটাও কিনে দেবে আমার আকাশ?

সন্তানের প্রতি মা

হাসান হাফিজ

উৎকণ্ঠা সেলাই করে
বুনেছি কাপড়, স্বপ্ন তার জমি
শ্রম দিয়ে
রক্ত জল ভালোবাসা দিয়ে
অনিদ্রাসুতোয়
বুনেছি মসলিন,
চাঁদের স্নিগ্ধতা থেকে
জলের প্রবাহ থেকে
ভোরের সৌরভ থেকে
ছিনিয়ে এনেছি রোদ
জীবনগৌরব
রেণু রেণু সুখ-পরমাণু
বুনেছি মিহিন পাড়
অস্তিত্বের সবটুকু
সুন্দর উপুড় ঢেলে
ইচ্ছার অস্ফুট পাপড়ি
ফুটিয়ে তুলেছি যত্নে
স্নায়ুরক্তে শুদ্ধতা দিয়েছি
তুমি পরো সে কাপড়
দীর্ঘকাল আয়ুষ্মান সুস্থ ও সুন্দর বেঁচে থাকো।

জননী

অঞ্জনা সাহা

একবার 'আমি' বলে দরোজায় দাঁড়ানো
জননীর অশ্রুভেজা চোখ ছুঁয়ে
পদ্মার ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে চলে এসেছি কঠিন শহরে।
পেছনে পড়ে রইলো রোরুদ্যমান গর্ভধারিণী
পড়ে থাকলো বুনোগাছে বসে থাকা বউকথাকও পাখি,
মজা পুকুর, প্রান্তরের জোড়া দিঘি
সবুজ ধানের কচিচারা আর ভাজনের ধুলোমাখা মুখ
ফসলের মাঠে কলমিলতার কান্না মিশেছে মাটিতে
তবে কি সন্তপ্ত হয়ে আছে
ছোট ছোট ঘাসফুলের সেই বিচিত্র শরীর?
খেজুরগাছের তলায় পাকাফল খুঁটে খাওয়া
নকশিকাটা ছোট্ট লাল পোকাটির
সরুদুটি পায়ের প্রকৃতি আজ হয়ে আছে বিষণ্ণ-মন্থর
স্বাদু ফল তার কাছে লাগিতেছে অতিশয় কটু,
ফিরে আসিবার কথা আমি বলি নাই তারে
মাটি আর ঘাসের গন্ধমাখা বিবর্ণ হৃদয়ে
রুদ্ধবাক জলভরা নত চোখে আমি একা এসেছি চলিয়া।

মা, তোমাকে কেবলি পড়ছে মনে
দিলারা হাফিজ

তোমাকে কেবলি মনে পড়ছে মা
আমাদের দূর অন্তহীন অশেষ গ্রামের কোনো এক কোণে,
নিঃস্ব একা পোড়া ভিটে মাটির মতো
পড়ে আছো তুমি যত্নহীন, আগাছায় আপাদমস্তক
সময়ের শপ্ত হাতে শনকরা রেখে
বাবাও গেলেন চলে তাঁর হাজার-দুয়ারি মহল ছেড়ে
বৈধব্যের শ্বেতশুভ্র সুতোয় তুমি আজো বুনে চলেছো
স্মৃতির জ্যাকেট—
দু'চোখে মরার জল নিয়ে তবু আঠারো বছর
আঠারো বছর তুমি অপেক্ষায় আছো
আমরা তোমার সেই লোকোত্তর বাসনার শ্যামল শস্য
এ যুগের তুলনায় নেহায়েত মন্দ নেই
তবু শূন্য বিছানায় দুঃসহ প্রান্তরে তুমি একা
ঘুমহীন ঘুমের ভেতর
সন্তানের সুসহ নবীন মুখ, মুখের কনক
খোকন সোনার বায়না নিয়ে তোমার কোলে আসে না ফিরে—

আমরা সবাই সময়ের জটিল নদী পার হতে গিয়ে
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছি আরব-উদ্বাস্তুর মতো
আমরা জানি মা, একটি সন্তান মারা গিয়ে তবে
তোমার বেঁচেছে অপরটি
জীবনপণ-করা একটি পুত্রের জন্য মাসাধিককাল
নিজেকে সঁপেছো প্রাক-ঐতিহাসিক উপোসের অনন্ত বিশ্বাসে
কখনো আবার তুমি পীর-ফকিরের দরগায়
মোমবাতি আর কাঁচা রসের সিন্নি মানত করেছো তুমি—

পুত্র সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনায়, এমনকি,
মাঘের বরফ-শীতল জলে ধারানি দিতে ভুল করোনি
আলোহীন গাইগুই—অন্ধকার শেষ ভোরে—
অঙ্গে তাই অলঙ্কারের বদলে তাবিজ-কবজ আর মাদুলিতে

উঠেছে ভরে কণ্ঠের হাড়—হাতের বাজুরেখা
এতোটাই ক্ষরণের হাওয়া বইছে তোমার চারপাশ ঘিরে—
সন্তানের মায়া তোমার চেয়ে আর কে বোঝে ভালো।

এখনো আমরা যারা বেঁচে আছি—নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত বড়ো
তোমার কথা ভাববার মতো এতো সময় কোথায়, মা,
তোমার মেজো ছেলের কথাই ধরো না
পৃথিবীর ভূস্বর্গে পাঠিয়েছিলে যাকে
তোমার জন্যে কুড়িয়ে আনতে একটুখানি স্বর্গ সুখকণা
কই, সে তো এখনো ফিরলো না,
শুনেছি সে খুব ভালোই আছে
দারিদ্র্য সিঞ্চিত আটপৌরে এই জীবনযাপন ছেড়ে গিয়ে—
ঘন লাল আপেলের হৃদয় সন্ধিক্ষণে
বিচ্ছুরিত বিভা তার কাচের মিহি গুঁড়োর মতো
লেক জেনিভার মুদ্রিত নীলজলে—শুনেছি শীতের রাত
গণিকাব মতো ডেকে নেয় কাছে;
উন্নয়নশীল দেশের ছেলেরা এভাবেই ভুলে থাকে তার অর্জিত অতীত
মোহন মোহনীয় মুদ্রার স্বপ্নজাল;
মুগ্ধবোধ তার দিন কাটে, হিরের আয়নার মুখ দেখে-দেখে;
বিধবা মাকে চিঠি লেখার সময় আদৌ জোটে না তার মোটেও
পড়শির শ্রমিক ছেলেটি যখন যাকাত আর দান-ধ্যানে
প্রতি ঈদে সৌদি রিয়াল পাঠায় বাবা-মাকে
তখন তোমার ছেলে একটা শুষ্ক ঈদকার্ড পাঠিয়ে
মায়ের নয়মাস দশদিনের গর্ভচুক্তির দায় সারে—
তখন তোমার চোখেরজলে নামে দ্বিগুণ ধারা

বড় ছেলে?—সে তো তোমার প্রত্যাশার নামাঙ্কিত নটরাজ
লেটার প্রেসের উত্তরাধিকার যাতনায় পিষ্ট হতে-হতে
ক্লান্ত, অরসন্ন হতশ্রী—যখন আর কিছুই হলো না
এমনকি রথের একটি প্রজাপতি
তখন পুরানো পোশাকের মতো পরিত্যাগ করে
এদেশ ও ভূগোল তোমার অসংখ্য সন্তানের মতো—
ভাগ্যের সঙ্গে খুনসুটি করে বিদেশ-বিভুঁয়ে পথে-পথে আজ

ঘুরছে কেবলি ঠিকানাবিহীন
আপাতত, প্রতি মাসে তার অন্তত একখানা চিঠি আসে
শিরাওঠা মায়ের হাতের প্রার্থনা দাবি করে;

ছোট ছেলে—সে তো তোমার জন্মদাগের মতো
আজন্ম ললাটে ধরে আছে পীড়া
উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভারী দরোজায় কড়া নেড়ে নেড়ে
অবশেষে আসন্ন সন্ধ্যার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে অন্ধকার
সময়ের সমন কাঁধে নিয়ে—
তোমার চোখের জল আরো বাড়ে, চোখের ভেতরে
ঝরনার মতো নেমে আসে—
পাথুরে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতল আজ প্লাবিত করে,
আমার যে যেখানেই যত দূরেই থাকি না কেন
তোমার নতমুখ চোখের জল আজ এই দিনে
আমাদের দিকেই ধায়, শুধু ধায়... ...

তাদের মাতা, জগৎমাতা

জাহিদ হায়দার

চুল্লির গায়ে লেপছো মাটি
"চুল্লি" কথাটা বল না তুমি,
বলছো বরং : বানাই আখা।

তোমার শিশুরা ঘিরে বসে আছে
দেখছে ক্ষুধার দৃষ্টি মেলে—
ব্যস্ত রয়েছে আখা নির্মাণে
তাহাদের মাতা জগৎমাতা,
আখা-সভ্যতা গড়তে যেয়ে
জননীযুগের কাল হতে আজও শ্রমিক মাতা।

ময়দার মতো মৃত্তিকা গড়ে শিল্পকলা
ঈষৎ পরেই আসবে চুলোয় স্বপ্নের রুটি—
শিশুরা এমন ভাবলে এখন কোনো ক্ষতি নেই
: সব পারে সব তাদের মাতা।

চুল্লি বানায় বানায় রুটি
আখা-সভ্যতা যুদ্ধ করে,
যুদ্ধ করছে তাদের মাতা।

ভোরের আলোর মতো মার হাত

মোহন রায়হান

কোন অসুখ থাকে না তবু মাঝে মাঝে
খু-উ-ব অসুস্থ হয়ে পড়ি
মার হাতে সাগু-বার্লি খাওয়ার কথা শুধু মনে পড়ে
বুকের মধ্যে নিয়ে মা আদরের বিলি কাটত চুলে
নরম আঙুলে মুছে দিত সব অসুস্থতা
মার আদরের জন্যে হাহাকারে ভরে ওঠে বুক
কোনো অসুখ থাকে না তবু মাঝে মাঝে
খু-উ-ব অসুস্থ হয়ে পড়ি।

চোখের পাতায় অবিশ্রান্ত ঘুম, ঘুমাতে পারি না
মার বুকের মতন কোমল আশ্রয় আর কোথায়ও নাই
কোনো অসুখ থাকে না তবু মাঝে মাঝে
খু-উ-ব অসুস্থ হয়ে পড়ি।

সর না পেয়ে উল্টিয়ে দিয়েছি দুধের হাড়ি, রুইয়ের মুড়ো না পেয়ে
তরকারির পাতিল, খেতে দিতে এতটুকু দেরি হলে লণ্ডভণ্ড করেছি সব,
মার খুব অবাধ্য ছিলাম তবু আঁচলে আড়াল করেছে বাবার প্রচণ্ড রাগ
অথচ কি ভীষণ ক্ষমাহীন এখন সবার কাছে সব ত্রুটি
কোনো অসুখ থাকে না তবু মাঝে মাঝে
খু-উ-ব অসুস্থ হয়ে পড়ি।

বিপুল যমুনা জাগে মাঝরাতের বেদনার্ত কার্নিশে
ভোরের আলোর মত মার হাত ডাকে—
আয়-আয়, বুকে আয় খোকা
কত রাত ঘুমাস্‌নি!

কোনো অসুখ থাকে না তবু মাঝে মাঝে
খু-উ-ব অসুস্থ হয়ে পড়ি।

মা-র কাছে ফেরা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

ওখানে ভীষণ খরায় ফসলের চরাচরে পাখা মেলে বোসেছে এক
বন্ধ্যার বাজপাখি, তার ঠোঁটের বিষ আমার রক্তের শহরে ঢুকেছে
শত্রুসেনারা যেমন বিজয়গর্বে ঢোকে পরাধীন দেশের ভেতরে।
মা, এই পরাধীন শরীরে কোথাও মুক্ত আকাশ নেই, মাঠ নেই—
রক্তে মাংসে খরার পতাকা উড়িয়ে রেখেছে ভিন্ন শাসক সেনারা।

কতোদিন ঘুমোই না মা! সেই কবে কৈশোরের প্রথম সকালে
সংসারের গন্ধে ভেজা তোর সোঁদা বুকে মুখ লুকিয়ে নির্ভাবনায়
ঘুমিয়ে যেতাম স্বপ্নের নিরাকার সমুদ্রের ঘোলা লোনা জলে
সেই কবে, কতোদিন আগে—কিচুক্ষণ বুকে রাখ. বুকের শান্তিতে।
কতোদিন ঘুমোইনি, নিদ্রার মতো জেগে আছি নিদ্রিত চোখে
কতোদিন, সেই কতোদিন...

ওখানে অভাব, মারী, দীর্ঘশ্বাসে আগুনের বিপুল জলোচ্ছ্বাস,
দেবদারুর শীর্ণ পাতাগুলো ঝ'রে গেছে মাটির হৃদপিণ্ডে।

সারারাত পথের নির্জনতা সরিয়ে সরিয়ে মানুষের মৃত হাড়
কান্নার কঙ্কাল দেখে আমি আর কোনোদিন কবরের পাশে যাইনি
সড়কের জীবন্ত কবর এসে বুকের ভূমিতে জেগেছে
সম্মিলিত মৃত্যুর উৎসব।

জানালাগুলো এখোনো খুলিস নি মা?
কতোদিন আকাশ দেখিনি, অনায়াসে পাখা মেলে উড়ে যাওয়া
পাখিদের পালক ঝরে পড়া, রঙিন প্রজাপতি, নক্ষত্র, মেঘ
কতোদিন ঝড়ের পূর্বাভাসে সঞ্চিত কালো মেঘ দেখিনি।

এ-দুটো অনিদ্রায় পোড়া পাথর চোখে
তোর মাতৃত্বের চুমু দিয়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দে
কতোদিন ঘুমোই নি মা, কতোদিন ঘুমোই না...

তুই বল্‌লি মানচিত্র আমার হবে
নাসিমা সুলতানা

তুই বল্‌লি ওই বাড়িটা আমার হবে
কালো রাস্তা হলুদ বাড়ি, ঘরে ঘরে নীল পর্দা, নিয়ন আলো
ফ্লাওয়ার ভাসে টাট্‌কা গোলাপ আমার হবে
তুই বললি ওই জমিটা-খেত-খামারটা-পানা পুকুর আমার আমার
দাওয়ার পাশে লাউয়ের মাচা দুধেল গাভী
শিউলি তলায় ঘুমিয়ে থাকা রাত্রিবেলা শুধুই আমার
কেন বল্‌লি?

কেন বল্‌লি নোনা হাওয়ায় চুল উড়বে?
ভুবনডাঙার ছলোচ্ছালো নদীর পাড়ে
বসে থাকবো পা ঝুলিয়ে, স্মৃতিবদ্ধ, কথা ক'বোনা

কেন তবে কালো রাস্তা হলুদ বাড়ি হয় না আমার
... কেন হয়না

কেন তবে চুল ওড়েনা ভুবনডাঙার পিছল হাওয়ায়
চুল ওড়েনা
গোলার ধানে হাত ডুবিয়ে মুখ ডুবিয়ে বালকবেলা খেলা করেনা
আপন মনে....

আমার এখন খিদে পাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে
ঘাম-রক্তে মুঠোর ভেতর ভিজে যাচ্ছে মানচিত্র
তুই বল্‌লি মানচিত্র আমার হবে
কেন বল্‌লি?

শহিদ জননী
কামাল চৌধুরী

মা আমার পথে হলো দেরি
ষড়ঋতু ঘুমিয়ে কেটেছে
গোলামেরা আছে দুধেভাতে
নদীতীরে আসে নাই ফেরি।

মা আমার পথ হলো বাঁকা
তাজা রক্তে লেখা ইতিহাস
পাণ্ডুলিপি তবু সাদা খাতা
মা আমার চক্ষুকর্ণ ঢাকা।

এই দেশে অদৃশ্য তুষারে
হিম ঠাণ্ডা শীত ঠাণ্ডা রাত
দিন শুধু ভয়ে ভীত ভোরে
প্রতিদিন আমাদের মারে।

মরে গেলে মানুষেরা হাড
হাড় থেকে তীব্র তাজা ফুল
এই দেশে অনেক বকুল
মুক্তি চেয়ে মরণে অসাড়

কিছু মুখ প্রিয় ত্রসরেণু
কিছু মেঘ আকাশ দুহিতা
মিশে আছে মাতৃ চরাচরে
আজ তারা আগুনের ধেনু।

নাম লিখি তাঁদের খাতায়
ভাই লিখি দিবস রজনী
বোন জানে এই দেশ ঋণী
ক'জনের আঁখির পাতায়

মা আমার পথে হলো দেরি
সব ভাই ফিরে নাই ঘরে

বোন সব বিপন্ন থাবায়
মা তবুও আজ যুগভেরী

লাল রক্ত স্রোতে ধেয়ে আসে
আলো দেখি—নদীর পারানি
মাঝি বসে ঢেউ গুনে সারা
পার হবে—যারা ভালোবাসে।

পার হবো—প্রেতকুল নাচে
কালো জন্তু রক্তপায়ী দাঁত
মা তবু যে বর্ম দিলে তুমি
তার তেজে লক্ষ রুমি বাঁচে।

জননীর পটভূমি

মাহমুদ কামাল

স্নিগ্ধ কেশরাশি মেলে ফুল হয়ে ফোটো
যদি তুমি সকালের স্নেহ হয়ে ওঠো।
চিন্তক মনের কর্ষে ভুল হয়, ভুল
তুমি যদি হও মেয়ে দুপুরের ফুল।
গীতিময় রোদ মাখা ভালবাসা আছে
তুমি যদি যাও স্পর্শ বিকেলের কাছে।
সন্ধ্যার গোধূলিতে ছায়াচিত্র স্থির
মেঘ কেটে চাঁদ ওঠে হৃদয়ে আবির।
শরীরের রোমকূপে আসে রাত যদি
নিরাতঙ্ক নিরবধি স্রোতস্বিনী নদী।
জননীর পটভূমি চিত্রকন্যা তোর
এইভাবে ক্রমান্বয়ে ফিরে আসে ভোর।

এলিজি মায়ের জন্যে
আসাদ মান্নান

যে-বয়সে মেয়েদের হাতে থাক বই-খাতা বালিকা পুতুল
চোখে থাকে পূর্ণিমার লকলকে ঢেউ আর অরণ্যের শ্যামল গম্বুজ
তার প্রিয় পুতুল কন্যার ঘরে অন্ধকারে সানাই বাজিয়ে
মেহেদি-বন্ধন হাতে সে-বয়সে মা আমার বাস্তবের ধাতব শয্যায়
পাথরে জীবন ঘষে জ্বালালেন সংসারের বিষণ্ণ আগুন।

আমার খেয়ালী আর চারণস্বভাবী ধর্মভীরু আড্ডাপ্রেমী বাবা
বৈষয়িক জ্ঞানবুদ্ধি লোভ ঈর্ষা যার মধ্যে কখনো ছিল না
আমৃত্যু ছিলেন যিনি সত্য আর সুন্দরের একান্ত সেবক
খোদার রসুল আর নবীদের পুণ্যবতী বিবিদের কথা ও কাহিনী
আমাদের প্রায়দিন শুনাতেন যিনি, তিনিও আমার ক্ষীণাঙ্গিনী
আজন্ম দুঃখিনী মাকে কোনদিন ভালোবেসে অন্তরঙ্গ সময় দেন নি—
সারাটা জীবন তাকে দিয়েছেন শুধু এক বুক
আততায়ী নিঃসঙ্গতা অই দূর উদাসীন বাউল নীলিমা।

বৈধব্য আসার আগে—বহুদিন আগে মা আমার বিধবা হলেন
তার বুকে একদিন বাসা বাঁধে এক দুঃখী চাতক-যুবতী
অপেক্ষার নির্জন গুহায় একা একা কাটে যার নিষ্ফল প্রহর
সারাক্ষণ পড়ে থাকতেন সেজাদা দিয়ে বিরহের জায়নামাজে এবং কেবল
এ অধম সন্তানের মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কোনো
প্রার্থনা ছিল না তার পরম করুণাময়ী পৃথিবীর কাছে :

কী এমন অভিমান ছিল তার যার জন্যে স্বামী ও সংসার
দ্বিতীয় নারীর হাতে ছেড়ে দিয়ে নির্বাসনে গেলেন স্বেচ্ছায়
সংসার অরণ্যে একা বনবাসী মা আমার জননী জানকী।

কী নির্মম উপেক্ষার অন্ধকারে গৃহকোণে মাদুর বিছিয়ে
মা আমার পড়ে থাকতেন একটা অচল পরিত্যক্ত আধুলির মতো
দুঃখ ছাড়া আর কেউ তার পাশে শয়ন করে নি:

জন্মের দোহাই দিচ্ছি এটা কোনো কল্পকথা নয়
পৃথিবীর সব দুঃখ অশ্রুরাশি সমুদ্রের তরল নিখিল

আমার মায়ের বুকে জমতে জমতে হিমালয়ে পরিণত হলো
বাবার মৃত্যুর পর তবু তাকে অশ্রুহীন কাঁদতে দেখেছি

আমিও বাবার মতো মাকে ছেড়ে ছুটে গেছি বন্ধুদের তুমুল আড্ডায়
কখনো ফিরেছি ঘরে কখনো বা দীর্ঘদিন নিখোঁজ ছিলাম
রোগে শোকে জরাজীর্ণ মায়ের আঁচল ছেড়ে বহুদূরে
ফেরারি খ্যাতির লোভে কবিতার সঙ্গে বাঁধি ঘর
অথচ কখনো মাকে কাছে টেনে পরম আদরে
গোয়ালে গাভীর পাল মাছভরা পুকুরের জল আর শস্যমগ্ন উদাস জমিন
এইসব আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যাবলী কোনদিন দেখাতে পারি নি
শুনাতে পারি নি তাকে সুখ ও স্বপ্নের কোন রূপকথা।

মায়ের নিরক্ত মুখ প্রায়রাত ভেসে ওঠে আমার দু'চোখে
ঘুমোতে পারি না আমি জেগে থাকি সারা রাত একা
আমাকে বিদ্রূপ করে অনাত্মীয় শ্রাবণের নগ্ন বুনো মেঘ
মেঘের আড়ালে কাঁদে আদিগন্তব্যাপ্ত এক নদী
একমাত্র পাপ ছাড়া আমার সঞ্চয়ে পুণ্য বলে কিছু নেই
আমার এ পাপ আমি কোথায় লুকাবো? কতদিন নদীকে বলেছি
আমাকে দু'ফোঁটা শুধু দু'ফোঁটা নির্মল জল দাও
এই গ্লানিকর কুক্কুর জীবন
তুমি ধুয়ে মুছে শুদ্ধ ক'রে নাও
অই দয়াবতী নদী ছিন্নমূল মানুষের আর্তনাদে কোনকালে হয় নি বধির
ফিরিয়ে দিয়েছে সব জমি-জমা উদিতদের হারানো সংসার
অথচ আমাকে শুধু চিরচেনা তাই প্রিয় দয়াময়ী নদী
ভিক্ষাহীন খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে... ...

বহুদিন বহুরাত মনে হয় হাজার বছর
নৈঃশব্দ্যের অন্ধকারে খুব একা থাকতে থাকতে
অবশেষে একদিন সূর্যোদয়ে
আমার মায়ের চোখে সূর্য নিতে যায় :
কবরে যাবার আগে মা আমার বহুদিন বহুরাত কবরে ছিলেন।

মাতৃ-লেখা

তুষার দাশ

এই তো মাতৃ-লেখা!
অন্ধকার গর্ভের গুহায় তুমি বেড়ে ওঠো
সুনিশ্চিত নও যতক্ষণ তোমার বিস্তার বায়ুঘূর্ণি
অতিক্রম করে জলপাশ, আলোর ফোয়ারা
ফুটিয়ে ফাটিয়ে ছুটে আসে পৃথিবীর প্রকৃতির দিকে,

আনন্দে আহ্লাদে আছো সর্বক্ষণ ভুলে
মাতৃ-ডোর সর্বত্র রয়েছে, এমনকি মৃত্যুর পরেও
একটি টিয়ার মৃত্যু যে মানুষকে আসলে কাঁদায়
তার হাতে মৃত্যু-লেখা—অস্ত্রের সজ্জায় আসে বিভিন্ন মুখোশে।

মুখোশের পথ ধরে এগুলে হয়তো মিলে যাবে
হাজার খানেক ধরো নকল পৃথিবী,
প্রান্ত-ছেঁড়া সীমাহীন এইসব অলৌকিক আপাত খেয়ালে
তোমার সকল প্রাপ্তি পূর্ণ মনে হবে
নিজের কুয়োর দিকে একবার তাকিয়ে একবার সত্য-শূন্য নিজেকে দেখলে
তুমিও ফিরতে পারো পরিশুদ্ধতার বশে
জন্মান্তর মাতৃ-লেখা শৈশবে আবারও।

মাতৃশোক

আসলাম সানা

মাগো তুমি অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিলে
পর করেছ সবারে যে আপন যাদের ছিলে।

কোথায় তুমি চলে গেছ, লুকিয়ে আছ কেন
আমরা তোমার পর কি গো মা, ভুলেই গেছ যেন?

তোমার বুকের মানিক ছিলাম, প্রিয় ছিলাম কত
তুমি যেন আকাশ ছিলে আমরা তারার মতো।

যেতে হবে জানি সবার সুদূর পরবাসে
সবাই তো যায় এমনি চলে যখনই ডাক আসে।

কিন্তু মাগো তুমি কেন এত তাড়াতাড়ি
চলো গেছ, রাগ করে কি? নিয়ে গেছ আড়ি।

মাগো তোমার সোনার ঘরে একলা সবাই থাকি
তুমি বিনে এ সংসারে সবই যেন ফাঁকি।

যাবার বেলায় অবহেলায় দুঃখ নিয়ে বুকে
মাগো তুমি কেমন আছ, দুঃখে না-কি সুখে?

প্রভুর কাছে প্রার্থনা এই স্বর্গবাসী থেকো
ভুলে যেতে দিও না মা একটু বুকে রেখো।

জন্ম অনুভূতি

[নম্রতা ও পূর্ণতা]

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

যেন দুলছে কি এক পেন্ডুলাম ঢন ঢন
আত্মার ধ্বনিতে কি এক শব্দ উল্লাস
মঙ্গল আর শুভাশুভ একাকার
আমার নিস্তরঙ্গ কোলে সাদা ফুল হয়ে ফুটে থাকলে

আমার শ্রেষ্ঠ কবিতা কি লেখা হয়ে গেল?
এরপরেও কি বাকি থাকে কিছু হিসেব নিকেশ
নুন কাটা জল, চিনি গোলা ঝোল, বিষাদ, মৌনতা

মগজের অন্ধকার ফুড়ে ফুটে থাকবে
আমার এ সাদা ফুল
দৃষ্টিতে লেগে থাকবে তো অনন্তকাল
রহস্যময় পৃথিবীতে জন্ম দেবে তারা
অপার রহস্য।

মায়ের শরীর

দারা মাহমুদ

মা বলেছেন অন্ন দেবেন এনে
আমরা ক'জন ঘন হয়ে বসি
চোখের পাতায় শস্য দানা হাসে
বুকের নীচে অনন্ত রাক্ষসী

রাত গাঢ় হয় আকাশ মরুভূমি
আমরা ক্রমেই ছোট্ট হতে থাকি
এই বুঝি হই পুতুল মানুষ হই
আর্ত স্বরে মা মা বলে ডাকি

গভীর রাতে মাতৃদেবী ফেরেন
সঙ্গে কিছু জ্বালানি খড়কুটো
কোথায় খাবার, শস্য দানা কই
মা এনেছেন আগুন কয়েক মুঠো।

চিতার মতো সাজিয়ে কাঠগুলো
মা বসালেন বিশাল অগ্নিসভা
সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মা বলেন
ভয় পাসনে আমি পুনর্ভবা

অগ্নিস্রোতে মায়ের শরীর পোড়ে
মা হেসে কন যারে খোকা যা
আমার অস্থি তোর উদরে গেলে
তোরা বাঁচবি আমি মরবো না

আমরা ক'জন নম্র হয়ে খাই
ভাজা মাংস খাদ্য পরিপাটি
তামসিক সেই রাত্রি কেটে গেলে
বমন করি পরম লৌকিক মাটি

প্রকাশ করো কৃতজ্ঞতা
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

আমিই শুধু নই কৃতজ্ঞ, ভিন্ন ভাবে ভেবে দেখো
চশমা খুলে উল্টো থেকে তাকাও চোখে—
চোখের ভেতর মাত্রা-নতুন   চোখের ভেতর অর্থ-শর্ত
প্রকাশ করো কৃতজ্ঞতা।

যদি তুমি এ দুলালকে না-ইবা পেতে অপূর্ণতায় তাহলে তো
স্বপ্ন-জীবন, এবং তোমার
রাত্রিগুলো থাকতো কালো রাত্রি হয়ে
নষ্ট-কষ্ট অন্ধকারে
ফুটতো না তো দিন-দিগন্তে মুক্তাকাশ,
এখন তুমি পূর্ণ-পাখি—
দুঃখ এখন দুঃখ নয় আর দুঃখগুলো স্বর্ণলতা রবীন্দ্রগান;
আমার জন্য ধন্য জীবন প্রকাশ করো কৃতজ্ঞতা।

আমায় তুমি না পেলে ঠিক সেই সাহারায় সারা জীবন
ধুধু শুধু একটি খেঁজুর গাছের কাছে থাকতো উটের
কৃষ্ণা এবং নিঃসঙ্গতা।
পৃথিবীতে নাইবা এলে
কেমন করে যুদ্ধ একাত্তরে?
থাকতো কোথায় মাতৃভাষা, মাতৃভূমি এবং তুমি
তোমার প্রিয় লালসবুজের ভালোবাসা!

বৃক্ষস্বভাবী
ফরিদ কবির

মাটিরও শিকড় আছে, যদিও সে নয় বৃক্ষভুক্ত
যারা বলে বৃষ্টির প্রস্তুতি মেখে
মিথ্যে বলে তারা
সবকিছু আদতে মৃত্তিকাগামী, জীবনে মৃত্যুতে
ঘোর পূর্ণিমায় যদি কেঁপে ওঠে মাটি
জানবে একথা—নদী তারই সখ্য
কামনা করেছে।

পূর্ণ চন্দ্রে দৃশ্যমান যে নৌকার ছায়া
আমিও প্রথমে ভুল ভেবে তাতে চড়তে গিয়েছি

যদিও মাটিই সব, দাঁড়াবার মতো শক্ত, নম্র
ঘন বৃষ্টিতেও ঠিক বৃক্ষ স্বভাবের।

জীবনের ভুল প্রান্তে
আবু মাসুম

জীবনের ভুল প্রান্তে প্রাঙ্‌মুখী এ কোন্ জননী
হলুদ রেখার মাঝে অপলক চেয়ে আছে একা
বিষণ্ণ ব্যথার রেখা আঁকিবুকি সারা অবয়বে
তারও তো কামনা ছিল সুখপাখি স্বামী-সন্তান।
তবে কেন সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় এসে
খসে গেছে লাল ডুরে শাড়ি পরনের,
কাজলের সুনিপুণ রেখা মুছে গেছে দীর্ঘদিন!

এখন সে মানুষের ভিতর ইতর দেখতে পায়,
চারদিকে নষ্ট জল; পরিবেশ পুঁতিগন্ধময়;
তাইতো পবিত্র ঘর শূন্য করে নগ্ন পায়ে একা
সোনাপুর ছেড়ে এসে এ জননী পালিয়ে বেড়ায়।

মানুষের চকচকে মসৃণ পলিশ দেয়া বাড়ি
হাজারো নামের গাড়ি, বাড়াবাড়ি দামি আসবাব
ফুলের খামারে কত ফুল, একটাও প্রজাপতি নেই।

এ জননী চেয়েছিল সবুজ ফসলে ছাওয়া মাঠ
গোয়ালে জাবর-কাটা দুধসাদা গাভী
পেট ভরে পানি পান্তা স্বামীর সোহাগ
সামান্য চাইতে গিয়ে উদোম এখন।

হাজারো প্রশ্নের বান খান খান হয়ে যায়..
ঘরে ফিরে দেখি সব ফাঁকা—হা হা অন্ধকার
আলো জ্বেলে দেখি, এ কি! কারা যেন ভুল বুঝে
ভুল করে আমাকেও নগ্ন করেছে।

প্রাচীন মাতৃছায়ায়

মাসুদ খান

এই ধূলিওড়া অপরাহ্নে
দূরে, দিগন্তের একেবারে কাছাকাছি
ঐ যে খোলা আকাশের নীচে একা শয্যা পেতে শুয়ে আছেন—
তিনি আমার মা।
ঘাস আর ডেটলের মিশ্র ঘ্রাণে রচিত সে-শয্যা।
নাকে নল, অক্সিজেন, বাহুতে স্যালাইন, ক্যাথেটার—
এভাবে প্লাস্টিক পলিথিনের লতায়, গুল্মে ক্রমে ক্রমে
জড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।

শয্যা ঘিরে অনেক দূর পর্যন্ত ধোঁয়া ধোঁয়া
মিথ্যা মিথ্যা আবহাওয়া।

মনে হলো, বহুকাল পরে যেন গোধূলি নামছে।
এইবার কিছু পাখি ও পতঙ্গ
তাদের উচ্ছল প্রগলভতা,
অর্বাচীন সুরবোধ আর
অস্পষ্ট বিলাপরীতি নিয়ে
ভয়ে ভয়ে খুঁজছে আশ্রয় ঐ প্লাস্টিকের ঝোপঝাড়ে
দিগন্ত ঘেঁষে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন মাতৃছায়ায়।

ঋণ খেলাপ
আবু হাসান শাহরিয়ার

যে পুঁজিতে আজ অবধি স্বপ্নচারী
তার আদিবাস—গর্ভবাড়ি।

এক জীবনে এ-ওর কাছে
হাজার দেনাপাওনা আছে
সব হিসেবই বৃত্তে বাঁধা হালখাতাহীন
সব ভ্রমণই নাগরদোলা
জমা-খরচ মিললে থাকে শূন্য গোলা।
আজন্ম ঋণগ্রস্ত, আমি শূন্যতারই
মধ্যে খুঁজে ফিরি আমার গর্ভবাড়ি।

বিরান ভূমি, শূন্য গোলা, বন্ধ ঝাঁপি—
একজনারই কাছে কেবল ঋণখেলাপি।

বাউল কিশোর, তুমি, একটু দাঁড়াও

মিনার মনসুর

তুমি দেখে নিও
একদিন সমস্ত মানুষ ফিরে যাবে
ঠিক সেখানেই—
বিস্মৃতির সেই মেঠোপথ
ভাঙা সাঁকোটির
পরেই হলুদ সর্ষে খেত
পাশে বাঁশঝাড়
গার্হস্থ্য সাপের মতো শীর্ণকায়া খাল
ডানপিটে কিশোরীর মতো
বুকে তার নৃত্যরত স্নিগ্ধ কাশবন
আর সমুখেই?
সেই গম্ভীর থুত্থুড়ে বট
তার চেয়ে দীর্ঘতর এক
চিরায়ত সুশীতল ছায়া
নীরবে অপেক্ষমাণ যেন
প্রখর নিদাঘে শান্ত মরূদ্যান

আত্মভোলা কিশোরের দল
কানামাছি ভোঁ ভোঁ
সকাল-দুপুর
একটানা অন্ধ খোঁজাখুঁজি
কেউ নেই সম্মুখে-পিছনে

সেই যে কিশোর তার হারিয়েছে নিজের ঠিকানা
হারিয়েছে অস্তিত্বের সুরক্ষাকবচ
তার চোখের বাঁধন তাই আজো তো খোলেনি কেউ
আজো তো মেলেনি তার পথের সন্ধান

বাউল কিশোর, তুমি, একটু দাঁড়াও
এইখানে, দ্যাখো—
অবশেষে সমস্ত মানুষ সারিবদ্ধ ফিরে যাবে
ঠিক খুঁজে নেবে তার হারানো নিবাস
ব্যস্ততায় খুলে নেবে চোখের বাঁধন।

শামুক মা

কাজল শাহনেওয়াজ

শামুক মা শামুক মা আমি যে তোর মূক ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকিস না
তোর সোয়েটার বোনার কাঁটা আমার চোখে ঢুকে রয়েছে আজ আমি যে কিছুই দেখিনা।

কেঁচো মা কেঁচো মা স্বপ্ন কি তোর আজ
আজান শুনে তাকাস, আমি তো আর বিশ্বাসীটি নইরে পাগলী
কি আর হবে

ঘড়ির গোল মুখটি নেই আর যে তোকে দেখবো
আমার বোতামও আর ছেঁড়ে না, তোর ঐ সুঁই লাগবে কিসে?

আমি বাদুড় পুষি কিন্তু খাঁচা লাগে না কোনো
বধির মন্ত্রে হেটে কার্নিশে বড়ো জোর পাই নিজের ছায়াকে

কোথায় হে আশ্চর্য মানুষ, আমার দোজখ
মা তুমি দেখে নিও, ঠিকই খুঁজে পাবে। আমি বিচার বসার আগেই
তুমি যাতে লজ্জা না পাও সর্ব সমক্ষে আমি আশ্রয় হারালে

আমার কালো ডেরায় ও মা তুই কোথায় তোকে যে দেখতে পাই না
তোর ছেলেকে ধরেছে যে বিষাক্ত পাথর
বাবার মৃত মুখে কি আজো পরিজের গন্ধ পাস

দুধ-স্মৃতি

ফখরে আলম

কার মনে থাকে দুধের অতীত, প্রেম পুষ্টি
আমার সন্তান শিশু সে কি ভুলে থাকে স্তন?
কিভাবে চুইয়ে পড়ে দুধ, চিনির চামচ
অবিকল ভুলেছি রাত্তিরে মায়ের সম্মুখ।

যদিও স্মৃতিতে আছে চাঁদের মতন কাসা
প্রভাত শিউলি ভাত তরল প্রবাহ/আঠা
আঠা নীলাভ দুধের জ্যোতি মনে আছে কিছু
প্রবীণ তৃষ্ণার স্মৃতি কচি ঘাসের সে দুধ।

যখন কিশোর আমি বাড়ছি বায়ুর বেশি
দেখি চেয়ে আছে অনুজের সজল নয়ন
হিংসায় জন্মের অধিকারে। শক্র আমি তার
করেছি কি পান জননীর রক্ত কিংবা দুধ?
কার মনে থাকে দায়বদ্ধতা ঋণের গল্প
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি মার রুগ্ণ স্তন দু'টি।

মা

বদরুল হায়দার

"দেখিলে মায়ের মুখ
মুছে যায় সব দুখ"

মাকে নিয়ে বহুবার লিখতে চেয়েছি
তাকে শব্দের অক্ষরে আটকাতে পারিনি কখনো।

মা প্রতিটি শব্দার্থের গোপনে একটি
গতিশীল সকাল। সমস্ত দিনের শরীরে
যা গড়িয়ে যায়। আর আমি দিনের বেদনা ভুলে
ঘুমিয়ে ছিলাম মাতৃগর্ভে।

চাঁদ মামার গল্পের ঝুড়ি থেকে
একবার পূর্ণিমাকে আবিষ্কার করলাম
মা বল্‌লো তুমিই আমার গোলচাঁদ।
সেই থেকে আমি গোল ব্যাসার্ধের
অভ্যন্তরে গেঁথে দিই মা শব্দের বীজ।

মা তুমি আলোর বনে ফুটে থাকা
প্রিয় মুখ। যাকে ঘিরে তৈরি হয়
ইচ্ছার প্রতিটি শবনম।

রূপকথার আকাশে শিশুরা খেলা করে।
আর মা অনন্ত সম্ভাবনা দিয়ে শিশুদের
ছায়া দেয়। অগণিত স্নেহের টুকরো হিরে
খসে পড়ে পৃথিবীতে। আর মা তাঁর
প্রবাহমান আঁচলে ঢেকে রাখে
আগামী পিতাকে।

তুমি তীর্থ—জননী আমার

জাহিদ মুস্তাফা

জীবনের বাহুডোরে খুব ভোরে নিমগ্ন ছিলাম কালঘুমে
সে ঘুম ভেঙেছে এক নাড়ি ছেঁড়া নোনা যন্ত্রণায়
প্রথম প্রসবক্লিষ্ট বেদনার্ত কিশোরী মায়ের চোখে
জীবনের পরমার্থ নেচে উঠেছিলো
আজো আমি সুমহান সেই অনুভব
রক্তস্রোতে স্পষ্ট টের পাই।

মা, আমার তোমাকে কি শব্দাম্বরে
সঠিক সাজাতে পারে পৃথিবীর কোনো কবি
যথার্থ প্রতীকে উপমায়।

তাবৎ শিল্পীর আঁকা খ্যাতিমান কোনো ক্যানভাসে
দেখিনি তোমার মতো সহিষ্ণু জননী
যে নিজেকে অনাহারী রেখে
ক্ষুধাতুর সন্তানের আশাহীন অবয়বে আঁকে
মানবিক আনন্দ কুসুম।

হয়তো তুমিই সেই অনন্ত তৃষিতা
কুমারী জননী—মাতা মেরি
বহুজন্ম পরে হয়ে এসেছো আবার
হয়তো বা রাবেয়া বসরী, মহিয়সী রোকেয়ার বেশে
কিংবা তুমি সন্তান বাৎসল্যে ভরা শরৎবাবুর মেজদিদি,
সেবাব্রতে নিয়োজিতা মাদার টেরিজা!

আমার তো মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ জননীর তীর্থ তুমি—
অমল নির্যাস

মা, আমার—তুমি এই বেদনার্ত বঙ্গদেশ
দুনিয়ার দুয়োরানী যেন
তেরোশ নদীর ধারা বহে যার অশ্রু অঝোরে।

কত দূরে থাকি আজকাল
সিকান্দার ফয়েজ

আমার বুকের মধ্যে অনাবিল আনন্দ আশ্রম
স্মৃতিচিহ্ন, দিকচিহ্ন, পাথর খোদাই ভালোবাসা
বন্দিচোখে তাঁর মুখ হেসে ওঠে পূর্ণিমার চাঁদ--
একাকী নিঝুম রাতে চুম্বনের ঘ্রাণে জেগে থাকি।

আমার মায়ের মুখ বাতাসের চোখ হয়ে ভাসে,—
কানে কানে বলে,—বড় খোকা, কাছে আয় বড় খোকা!
আমি জেগে উঠি, অকস্মাৎ রাত নামে চারদিকে,
আমি জেগে উঠি, শরীরে কাঁপন লাগে!
আমি জেগে উঠি, বিদঘুটে অন্ধকার সিঁড়ি হয়ে নামে—
কত দূরে থাকি আজকাল!

রাতেও ঘুমের ঘোরে কি যে এক মায়া মায়া মুখ
বসে থাকে সিথানে এলিয়ে হাত গোটারাত একা,
পাহারায়; খোকা তাঁর বড় ভিতু ছেলে!
ভূতে ভয়, জিনে ভয়, অন্ধকারে খুব বেশি ভয়!
আমিও উড়াল দেই, উঠে যাই আকাশের ছাদে
মা আমার পাশাপাশি হাওয়া হয়ে হাঁটে,
সহসা বাড়ায় হাত—নেমে আয় বড় খোকা! ইশারায় ডাকে—
কতদূরে থাকি আজকাল?

মনেতে বাঘের নাচ

জুয়েল মাজহার

উচাটন অরণ্যের দিন!
কাখিয়াছড়ার দিকে লাফিয়ে চলেছে এক
ডোরাকাটা ব্যাঘ্রকুমার;
তার ডোরায় রৌদ্র আর বিদ্যুতের দ্রুত চলাচল।
বহু বহু ফসফরাসে .আকাশ বানিয়ে নিয়েছে তার চাঁদ
—যেন চীনা কৃষকের গোল টুপি।

চাঁদ আর চিতার নাচন দেখে
ফিরছি মায়ের কোলে একা সদাগর!
দূরে বন-মোরগের ডাক;
খরগোশের লোমে তৈরি নরম সুন্দর ওই দক্ষিণের টিলা!
টুসুগানের সুরে গুন্‌গুন্‌ পথে হেঁটে চলেছেন
আমাদের গণেশ মাইতালিয়া।
আরো দেখি, বুড়বুড়ি নদীজলে ভেসে চলে লাল জবাফুল
—কালপুরুষের তরবারি জ্বলে আজ আকাশে আকাশে।
কাশের ভাস্কর্য আর খাগড়াবন দুই তীরে যেন বা যমজ
দেখি, সাদা সাদা বক
—উড়ে যাচ্ছে প্রাণপ্রিয় জঙ্গলের নীড়ে

এই বন পার হয়ে
পিশাচ-প্রেতের দ্বীপ, রক্ত আর ঘন কালোজল
লাফিয়ে ডিঙিয়ে আমি যাবো মাতৃক্রোড়ে

মনেতে বাঘের নাচ
মাগো, আমি ফিরিতেছি ঘরে!

অকল্যাণ

তসলিমা নাসরিন

কল্যাণীকে ধরে নিয়ে গেছে কে বা কারা, ঘরে
পড়ে আছে ছেঁড়া শাড়ি,
আলুথালু বিছানা বালিশ,
ভাঙা চুড়ি,
মেঝেয় রক্তের ফোঁটা, ক'জোড়া জুতোর দাগ, পোড়া সিগারেট
কল্যাণী হয়তো এরপর পড়ে
থাকবে বাংলায়, অন্ধকারে, একা, ফুলে ওঠা উলঙ্গ শরীর
শুঁকবে কুকুর ঝাড়জঙ্গলের, ঝাঁক বেঁধে
নামবে শকুন খেতে ঠুকরে ঠুকরে মাংস।
কল্যাণীকে দেখে লোকে মুখে চেপে রুমাল বলবে—আহা।
বলবে মেয়েটি বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল, সাত চড়েও রা
করত না, বিষম লাজুক।

আর যদি ক্ষত, রক্তাক্ত, খুবলে নেওয়া
ছেঁড়া ছিন্ন শরীরে সে এসে
দাঁড়ায় ঘরের দরজায়, তার
শোকাকুল মা কি স্নেহে আর শুশ্রূষায় স্পর্শ করবে কন্যার
পুরুষ-ঘাঁটা গা?
অথবা আত্মীয়, প্রিয় পড়শি, বন্ধুরা? কেউ?

নাকি চোখের তারায় খেলা করবে কৌতুক,
কেউ মুখ টিপে হাসবে, বলবে কেউ
মেয়েটি অলক্ষ্মী ছিল, ছিল বেহায়াও খুব
বুকের কাপড়খানা যখন তখন সরে যেত বুক থেকে
ঠোঁট লাল করত সে পানে, অথবা হাসত
হেসে এমন গড়াত যে পুরুষ মানত না।
আর কারও তো এমন
হয় না কেবল তার বেলা এই হাল কেন
নষ্ট ছিল নিশ্চয় মেয়েটি।

কল্যাণী এখন নষ্ট বটে
আর যারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল
সে সুযোগ্য সন্তানেরা, তারা
আজ এই বিকলাঙ্গ দেশের সম্পদ।

মাকে নিয়ে কয়েক লাইন

সরকার মাসুদ

রান্নাঘরের সামনে ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে আছে
এক যুবতী মহিলা
আমি মামুর কাঁধে চড়ে সন্ধ্যাবেলা
কালভার্টের নিচে ছলবলে সাপ দেখতে গেছি
আমার শৈশবে যুদ্ধ—একপলক,
মাছের কাঁটার মতো, সীসারঙ বোমারু প্লেনের
এক ঝটকায় ঘুরে যাওয়া.........
শিমলতার ভিতর অসীম মমতা নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে এক বয়স্ক মহিলা
আমি বই পড়ার ফাঁক দিয়ে লক্ষ করেছি
তার মগ্ন হেঁটে আসা, পিছনে লাল আকাশ!

ঐ মহিলা এখন কথা বলেন গৃহপালিত পাখির সাথে
উষারঙ মেশানো অস্পষ্ট ভাষায়;
শুধু ধূসর রাখাল আর গরুগুলি
তার নিম্নচাপছেঁড়া মনের কথা বোঝে
নাড়ি কাটবার পর থেকে আমি এক ঝামেলাময়
বড় নদীর এপারে আছি, বারো বছর,
আমার কথা মনে হলে নাকফুলখসা ঐ মহিলা
উৎসবের ছবির দিকে চেয়ে থাকেন ভালোবাসায়
অসহায় নারীর আশায় ঘুরতে ঘুরতে
উড়ে এসে পড়ে ছোট্ট এক চিত্রিত পালক...
ঐ লোকজন আসছে দূর দেশ থেকে
ঐ কাঁধে ব্যাগ, আমি আসছি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে
বাগানবাড়িতে.....শুধু দু'দিন থাকবো।

আশ্রয় ভেঙে আসে॥

ফেরদৌস নাহার

বিছানার প্রান্তে স্মৃতিহীন শুয়ে, চোখের কোনায় জল
রুপালি চুলের গোছা চিবুকের তিল
ফর্সা আঙুলে ক্ষীণ কুঞ্চনরেখা, আমার মা আজ একা
বায়ান্নের চৌকাঠে কি ভীষণ একাকী
পাড়ি দেন স্মৃতির সমুদ্র কোন বিস্মৃতির যানে।

উনিশ পঁয়তাল্লিশে জন্ম
বেগম লুৎফুন্নাহার, পিতামহ প্রদত্ত নাম
পিতামাতার প্রথম সন্তান
কলকাতা, ইডেন কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
প্রবল আগ্রহে জয় করেছেন সমূহ সম্মান উপলব্ধি ও সৌন্দর্য...

ইতিহাসের ছাত্রী মা আমার গভীর নিষ্ঠায় পালন করেছেন সংসার ধর্ম
প্রথম সন্তান হিসেবে তুলে নিয়েছেন ছোটদের দায়িত্ব
জীবনের ঘাটে ঘাটে অফুরন্ত পরিচয়ে মা'র হাত ভরে ছিল দায়িত্বের ভারে
আমাদের শৈশব কৈশোর এমনকি যৌবনেও মাকে ছাড়া
পাইনি কোনো নির্ভার আশ্রয়, চিকিৎসক পিতার অসম্ভব ব্যস্ততা
আমাদেরকে মা-মুখী করেছে করবার....
মাকে দেখেছি জীবনের প্রতি আশ্রয়ে উপাসনায় আনন্দ বেদনায়।
তারপর, ঘনিয়েছে সন্ধ্যা, ডুবে যায় আলো
চারিদিকের বিপুল বিষণ্ণ আয়োজনের মাঝে মাকে দেখি
ইতিহাসের পথে হেঁটে যেতে শিক্ষানবিস কোন ছাত্রী যেন
মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেন দিল্লি, আগ্রা, জয়পুরের স্থাপত্য....
দিকে দিকে এত অভিযান এত জয় পরাজয়ের কাহিনী
ইতিহাসের পাতা জুড়ে মহা প্রাণ ধ্বনি
আমার মায়ের নাম সে পাতায় নাই থাক
আমার রক্ত ঘোরে মেদ মজ্জার আলোকে গভীর প্রবাহ আর
রিক্ত দিনে লেখা থাক তার নাম আমার ভেতরে।

স্নেহহীন স্রোতে হাহাকার ভাসে

প্রদীপ মিত্র

মা ছিলেন আমার আপন ও শ্রীময়
আমি তাঁর নিবেদিত নির্মল সন্তান
অমিতাভ যুদ্ধের সৈনিক। তাঁর আঁচলের স্নিগ্ধ
স্নেহ, গভীর প্রেম ও প্রত্যয় আমাকে
উজ্জীবিত করতো সর্বত।
মায়ের গৌরবে আত্মহারা বুক শত্রুর আতঙ্ক!
বরাভয় সাহসে-সৌন্দর্যে দীপ্ত-দৃঢ়।

আহা, সেই মা আমার অকস্মাৎ
খোল-নোলচে পাল্টে
আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন দারুণ চে'
যেন ফারাক্কার মারাত্মক ক্রিয়া
জলহারা খাঁ খাঁ মাটি, পাড়হীন পদ্মা
বিরান জমিন, ধু-ধু শস্যমাঠ আহা!

আমার চেতনা অঙ্গীকার ফানাফানা
স্নেহহীন স্রোতে হাহাকার ভাসমান।

ফাঁসির মঞ্চ থেকে
রেজাউদ্দিন স্টালিন

কেন জানিনা আজ বহুদিন পর কারাকক্ষের অন্তরালে বসে
মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে
মা বলতেন, জানিসতো কবিতা লিখে ভাত হয় না
আমি লজ্জায় অবনত হয়ে থাকতাম
কিন্তু আজ আমার সময় হয়েছে
আমি সাহসী সন্তানের মতো প্রশ্ন করতে পারি
মা যারা কবিতা লেখে না তাদেরও কি ভাত হয়

আমার মা এখন মৃত্যুর দিন গুনছে
আর পূর্বপুরুষেরা শুয়ে আছেন কবরে
জানিনা ক্ষুধা তাদের মৃত্যুর কারণ কি না
আর প্রভুদের বিজ্ঞান তো ক্ষুধায় মানুষের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে না

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আমার ফাঁসি
শেষ সংবাদটি জানবার জন্যে সাথীদের চোখেমুখে
বৃষ্টিগর্ভ বায়ুর উদ্বেগ
আমার মৃত্যু তাদের চোখের আকাশে হয়তো বসিয়ে দিয়েছে
অসংখ্য বেদনার শিশির—যা' ভালোবাসার রোদে
মুক্তোর মতো ঝিকমিক করে উঠবে

আমি সাথীদের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ
আমার যা-কিছু কবিতা সবই তাদের জীবনের সারাংশ
আমি শুধু সাজিয়েছি সত্যের অক্ষয় কালিতে
তাদের ভালোবাসার কথা আমি মৃত্যুর সামান্য বেদনায় বিস্মৃত হইনি
সারাজীবন ধরে যে ভালোবাসা কেউ আবিষ্কার করতে পারে না
আজ মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে তা' আমি অনুভব করছি

এখন আমি এগিয়ে যাচ্ছি বধ্যভূমির দিকে
আমার ফাঁসি হবার মাত্র এক মিনিট বাকি
এরই মধ্যে আমি পতনপ্রবণ এক জাতির জন্যে
অগ্নিগর্ভ মৃত্যুর উদাহরণ ছাড়া কি রেখে যাবো

সম্পর্ক-সাঁকো

মারুফ রায়হান

আত্মজার মুখ দেখে মনে হলো জননীর মর্ম
আমি জানি নাই এতকাল এক বর্ণও
স্বীকার করছি আজ অপরাধ, পাপের পাহাড়

মা আর স্বদেশ কেন এক শব্দ এক হাড়
বুঝবার জন্যে প্রয়োজন ছিলো যুদ্ধ, একাত্তর
যখন নিখোঁজ হলো আমাদের এক সহোদর
সম্ভ্রম হারিয়ে অন্য বোন ব্যথাতুর
আর আমাদের দেশ জননীর আঁচল আগুনে দীর্ণ
আমাদের গর্জে-ওঠা স্টেনগানে ছিন্নভিন্ন
হলো দানবের থাবা, মস্তক, উদর
মা ও দেশ একাকার হয়ে গেলো।

আজকে আমার ছোট্ট মেয়েটিকে মনে হয় মা, মানে স্বদেশ
ওর গর্ভ আমার সূচনা, ওর স্থিতি আমার আগামী
মা, মাটি, আত্মজা এক অনিঃশেষ
সম্পর্ক-সাঁকোর মাঝখানে আমাকে আপন করে নিলো
মানুষ হবার অহঙ্কার বুঝলাম আমি।

মায়ের রূপান্তর
শান্তনু চৌধুরী

কফিন বানানো আমি জেনে গেছি আজ।

যে ছুতোর আমাকে শিখিয়েছিল সর্বস্বতা দিয়ে
তার কফিনের কারুকাজ, আজ তাই একেকটি শূন্য কফিন জন্মের পর
আমি তার দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিই প্রতিটি কফিনে,
চিতাগামী বাহকের স্তব্ধতার কাছে;
যাতে, পৃথিবীর প্রতিটি মৃতের সঙ্গে ভারী যত
দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকে সমগ্র মাটিতে।

মাটির পাজর ফুঁড়ে এতে, যে বিশল ছায়াগুলো
জন্ম নেবে প্রান্তরের সবুজ রহস্যে,
যেন সেই মৌন ছায়াদের উজ্জ্বল স্পন্দন থেকে
কোটি কোটি ছুতোরের শব্দ শোনা যায়।

যেন সেই কফিনের শব্দ শোনা যায়।

বুকের ভেতরে কুয়াশার নীল

[কবিতার মত অনিবার্য মা-কে]

সুহিতা সুলতানা

অন্ধকারের পেটের মধ্যে বসে থাকি দিনরাত
চারপাশে ঘাসহীন রুক্ষ বনস্থালি—

মগজে নড়ে ওঠে কৈশোরের স্মৃতি, বুকের ভেতর কুয়াশার নীল
তুলতুলে নরম মাটি মাড়িয়ে হাঁটতে থাকি
একদা যেখানে আমার নিবাস ছিল
যেখানে ক্রমশ মাটির সঙ্গে একদিন আমার সখ্যতা গড়ে ওঠে
বৃক্ষেরা ছিলো সবুজ প্রগাঢ় পেলবতায় নন্দিত
পাখির গানে মুখরিত ছিলো সমস্ত গ্রাম
মৌসুমে ফসলের ডাক

বৃষ্টির কুয়াশা ঝুলে থাকতো সবুজ বৃক্ষে
দাদা শিল্পিত গ্রীবা নাড়িয়ে স্বরচিত কবিতা পড়তেন
বাবার কণ্ঠ থেকে ভেসে আসতো লোরকার কবিতা

মা প্রার্থনায় দিনরাত্রি নত হয়ে থাকতেন
প্রার্থনার আহ্বান ধ্বনিত হলে আবেগে আমার মন
মৃত্তিকার মত নরম হয়ে যেতো
মায়ের কণ্ঠের উষ্ণতা আমাকে দারুণ স্পর্শ করতো

এখন স্মৃতি শিলায় হাত রাখি
স্পর্শহীন গন্ধহীন অনড়তা আমাকে
ঢেকে রাখে অন্ধ-অন্ধকার

আসনা স্মরণে

রণক মুহম্মদ রফিক

অনন্ত বর্তুলে মা গো স্বর্গে কেন ঝুলে আছো স্বর্গ-প্রতিবেশী (?)
নেমে এসো, জান্তব ফণাময়ী একবার ধূম্রলোক ভেদী মাথা তোল
মাটির চৌম্বক টান নিরীহ বায়ুর মত শাড়ির নকশা ধরে টানে
তোমাকেও টানে...

বাবার কী সাধ্য আছে ফিরে আনে তুমি ছাড়া বসন্তের দিন?

মা খুব হাসিতেছেন, মিটমিট জ্বলিতেছেন—স্বর্গের বাতিরা যেন তাহার রূপক
আমিও বিছানা খাটে শাড়ির আঁচল গন্ধে নুয়ে পড়ি বাল্য-সখা ধ্যানে
কররূহে-করতাড়নায়—চুনভর্তি নারকেল মালা
কখনো ওঠে না কেঁপে
করঙ্গ-পানের বাটা ঠেসারা বিদ্রূপে পড়ে কাঁদে
অনন্ত গোলকে কেন? নেমে এসো প্রাণদাকে ডাকি...

লাউয়ের শুষ্ক খোলে তার বেঁধে বাবা খুব বিকারী পুরুষ
আহ্ তিলাঞ্জলি ব্যথা তুরমান বেগে তাকে ঠেলে রাখে দূরে

হেঁশেলে চুলোর দাহ লেপে মুছে লাল মাটি বহু কষ্টে ঢেকে দেয় বোন
দীনপুণ্য চুলোর আগুনে
কতটা বছর হলো চাল ডাল ফুটছে না বাষ্পময় উনানের জলে
হেঁশেল জমিন মৌন—এই চুলো গোক্ষুরের গর্ত মত লাগে...

রান্না ঘরে বিষ ধোঁয়া নেই। শিশুরা দিয়েছে দিনে শুকোতে মাটির জন্তুকে
পোড়া এক মাটির ঘোড়ায়
ছাইপাশ ভেদ করে বসে আছে আগুনের ফুলকি রূপ দূত...
দূত বলে ভ্রমি তারে জননী গো তুমি
দক্ষিণ-উত্তরে ভাবি মেঘনাদে তুমি
কৃষ্ণপক্ষ চাঁদ কালিন্দী রাতে মনে পড়ে
তোমাকে দেখবো বলে গোপনে দাঁড়ায় শিহরনে
ছবিপক্ষ দেয়ালের পিঠে ঠেকি—
তুমি তবু আসনা স্মরণে (!)
কবর জনম ছেড়ে বৃষ্টির দিকে শুধু মাতৃকুল হাসে
তুমি তবু আসনা স্মরণে...

গোপন রান্না

সরকার আমিন

শিশুদের বেঁধে রেখে মা রান্না করছেন পাথর
শিশুদের ছেড়ে দিন গোধুলিতে
সূর্যাস্তের লালরক্ত আকাশে
তারা মেঘের ভেতর থেকে কেড়ে নিক আহার
দিগন্তের স্তন্য থেকে চুষে নিক শিশুকাল
সূর্যের লালা থেকে খুঁজে নিক লবণ

মা শিশুদের বাঁধন খুলে দিন
তারা তারাদের সাথে খেলা করুক
দুহাতে ধরে চাঁদ লটকে পড়ুক মহাশূন্যে
ভাসুক সমুদ্রের মস্তিষ্কে রেখে আশ্চর্য পা

মা শিশুদের অপেক্ষায় বসিয়ে রেখে
ভাজছেন পাথরের মাছ
পাথরের আনাজ, পাথরের সালুন

মাগো, শিশুরা যদিবা খায় সেদ্ধ পাথর
অসীম রান্নার খবর কিভাবে থাকবে গোপন?

মাতৃমঙ্গল
মিহির মুসাকী

অবধান করো সব করো অবধান
মাতৃমঙ্গল কথা করিব বয়ান।
নহি কোনো ভূস্বামীর আজ্ঞাবহ দাস
আমৃত্যু মাতৃদুগ্ধে রয়েছে বিশ্বাস।
অধম এ কবি শুধু কহে জোড়হাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।

বিশেষণে সবিশেষ কহিতে না পারি
অভুক্ত জীবন কাটে দোষ তো আমারই।
না পাল্টায় গোত্র কভু শোষকের জাত
দুদিকে সমান কাটে লোভের করাত।
বিবেক দর্শন করি কবি ছন্দখোর
দুঃখে দুঃখে কেটে যায় অযুত বছর।

নিরন্নের বারোমাসী, নয় গল্পগাথা
স্বপ্নে ভাসে লক্ষ টাকা সত্য ছেঁড়া কাঁথা।
দুগ্ধশূন্য স্তন আজ ওগো মাতৃকুল
সময় গুনছে শুধু ভুলের মাসুল।
শুধু এই শব্দ ঝরে বুকের প্রপাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

ছাড়ে না রক্তের দাবি তবু মহাকাল
মানচিত্রে নামে ভিন্‌দেশী পঙ্গপাল।
অন্নপূর্ণা মাতা মোর আহা অসহায়
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?
রাজা যদি মরে তবে প্রজা মারে সাথে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

ঈশ্বরী পাটনী তুষ্ট অন্নদার বরে
আমার ঈশ্বর নেই, দুঃখ আছে ঘরে।
চাহিদা মাফিক চাই দুবেলা দুমুঠো
যে দেবে ঈশ্বর সে -ই। হৃদয়টা ফুটো

উঠে আসে রক্তবমি শূন্য হাত পাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

শস্যমাতা দেশমাতা জন্মদাত্রী মোর
কেটেছিলো দশমাস জরায়ুতে তোর।
ভুলেছি ভ্রূণের স্মৃতি সেই রক্তপান
আমরা এখনো তোর অযোগ্য সন্তান।
বাঁচবার স্বপ্ন দেখি ঘাত-প্রতিঘাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

অবধান করো সব করো অবধান
মাতৃমঙ্গল কথা করিব বয়ান।
নহি কোনো ভূস্বামীর আজ্ঞাবহ দাস.
আমৃত্যু মাতৃসত্যে রয়েছে বিশ্বাস।
অধম এ কবি শুধু কহে জোড় হাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

ম্রিয়মাণার গাথা

জেনিস মাহমুন

ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা বরফের শব্দে কাঁদে কালো কালো চোখ
ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা যেতে যেতে আনমন পুনর্বৃত্ত শোক

ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা একটি পথ নক্ষত্র কালো ছাড়ার রৌদ্র
ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা গৌড় রাঢ় বঙ্গ একটি রমণী শূদ্র

ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা গুহা থেকে পাথর কালো থেকে আলো
ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা একটি আলো আমাকে তাকে তোমাকে পোড়ালো

ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা আকাশ এলোমেলো মৃত্তিকা গাঢ় মৃত্যুর নেশা
ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা যূথবদ্ধ জনতা নিঃসঙ্গ প্রশ্নের মতো একা

ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা পোশাকে কোমর নক্ষত্রের পাশে চাঁদ
ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা তোমার কুটিরে আহা ভেঙে পড়া রাত

ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা বরফের শব্দে কাঁদে কালো কালো চোখ
ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা যেতে যেতে আনমন পুনর্বৃত্ত শোক

ম্রিয়মাণা ম্রিয়মাণা আহ্ আহ্ আহা

বিদ্যাসাগরের মা ভগবতীদেবী

মজিদ মাহমুদ

এই বিক্ষুব্ধ ঝড়ের রাত আগুন পানির রাত
ফুসে উঠছে দামোদর নদী
নদীর মধ্যে মহিষ
মহিষের শিং ধরে ভেসে যাচ্ছে
আদিম মেয়োসিস
উঠছে আর নামছে; নামছে আর
উঠছে; এই ভয়াল রাতে অভয়ার কাছে যেতে হবে
অভয়া আমার মা; আর দামোদর
পৃথিবীর আদিমতম নদী
তরঙ্গ-নৃত্যের মধ্যে লুফে নিচ্ছে শরীর
আমি শিশুকের মতো ভেসে উঠছি
ডুবে যাচ্ছি; নদীর সমার্থক হয়ে
মহিষ ধেয়ে আসছে আমার দিকে

আমার রক্তের মধ্যে দামোদর
আমার রক্তের মধ্যে মহিষ
মাগো তুই মহিষাসুর বধের মন্ত্র শেখা
আমি তোর কাছে যাবো
আমার অর্ধেকটা শরীর জলের কাছে রেখে
বাকি অর্ধেক তোকে দেবো; তোর
পুঁইয়ের মাচা লাল শাক
আর আমার দামোদর নদী
নদীর মধ্যে মহিষ
মহিষের শিং ধরে ভেসে যাচ্ছে
আদিম মেয়োসিস।

মাতৃ-অন্ধকার
বায়তুল্লাহ্ কাদেরী

মায়ের আন্ধার বক্ষে নিয়ে বেঁচে আছি
সে-আন্ধার খুঁড়ে জ্বালি অগ্নি
জ্বালায়ে লয়েছি গৃহ, বাস্তুভিটে আর
সন্তানদ্যুতির চারপাশ,
শুধুই ইঁদুর দেখি বলে শীতরাতে কাতরতা
আসে, উঠে আসে
রোমশ শেকড়, পুষ্করিণী-সন্ধ্যা থেকে
হাঁসগুচ্ছ ফিরে আসে নাই বীতস্পৃহ দুঃস্থঘুমে?

একদা বাঁধয়ে ঘর খৈ-সুন্দরী আমার মা
ভেসেছেন দিব্যি এই সফেদ হংসেতে,
যেখানে বাণীর ঘুম আর মৃদু উত্তরণ জলে
শৌখিন তরঙ্গ তোলে তরঙ্গে তরঙ্গে
আজ নাচে আত্মা, স্বর্ণস্মৃতি নাচে, নাচে,
মাতৃ-অন্ধকার।

নক্ষত্রময়ী

ফাতিমা তামান্না

ওঠে দীর্ঘশ্বাস, বাতাস শরীরে—
শেকড় ক্ষুধায় জমে বিন্দু বিন্দু রক্ত
অতঃপর খুলে গেল বন্ধ দরজা
সমুদ্রফণা, বজ্র-কঠিন বীভৎস চিৎকারে
কত কত গ্রহের হাতছানি—
উসখুস জ্বালামুখ, তপ্ত গহ্বর,
ক্রমশ নিঃশেষ ভবিষ্যৎ কাল
শীত-বসন্ত-বৈশাখ; একে একে স্তব্ধ।
জমে ওঠে অতীত পাহাড়
ক্রোমজম ঝড়; দুই-চার-ছয়
বেড়ে উঠছে, উঠছে—
থর্‌থর্‌ কাঁপে ঊর্ণনাভ শরীর, জীবনমমতায়;
এসেছে হেমন্ত সংবাদ—
বিবর্ণ সময়, হলুদ পাতার দিন।
সহস্র তুলতুল পায়ের শব্দে
জ্বলে উঠলো তারা;
উজ্জ্বল নতুন নক্ষত্র এক।

গর্ভস্তব

চঞ্চল আশরাফ

আলোর মুহূর্তগুলি, মনে আছে, আঁটোসাটো অন্ধকার ঋতু
পৃথিবীতে শুধু ধোঁয়া. ধোঁয়ার পোশাক...

যতবার আত্মহত্যা, তোমার বিষণ্ণ বুক থেকে দূরে
জ্বরপোড়া নদী, ডুব. গোধূলির জলে ভেসে ওঠা
ছড়িয়ে থুতুর গন্ধ বাতাসে বাতাসে
যতোবার গায়ে মেখে যাবতীয় দূরত্বের ধুলো
অপেক্ষা আমার সেই নির্জন গর্ভে প্রবেশের;

ততবার আমাকে প্রসব করো তুমি

আঁধারের সোয়েটার

শাহ্‌নাজ মুন্নী

আমার মায়ের হাতে উলের কাঁটা
ধ্রুপদ সঙ্গীতের মতো কড়ি ও
কোমলে উঠা-নামা করে,

মা হাত নাড়ান
সুতো আর কাঁটারা
এ ওকে জড়িয়ে হয়ে যায় সাদা সোয়েটার।

মায়ের হারমোনিয়াম জুড়ে অন্ধ আঁধার
কাটা ঘুরিয়ে মা বুনে চলেন আঁধারের ফুল
আমাকে কি এই শীতে মা দেবেন
উপহার আঁধারের সোয়েটার।

জননী

প্রণয় পলিকার্প রোজারিও

এখন হারিয়ে যেতে চাই
স্বাভাবিক বন্ধন থাকবে যথারীতি
তা সব ফিরিয়ে তোমাদের
আমি চলে যেতে চাই।

ইচ্ছারা স্বাধীন হলে দু'পায়ে পথের ধুলা লাগবেই।
থাকবে সঙ্গীরা পাশে
তবু একাকী পথের নেশা—

সবুজ পোড়াবে খুব আমার দু'চোখ
ঘরের কোনায় বেড়ে ওঠা তন্বী ফার্ন
প্রতিদিন অকারণ দেখে যাব
আর তো হবে না।

মনে হবে দিনক্ষণ মাস কখনো আরাধ্য নয়
সব রঙ মেখে নেবো ডানে আর বাঁয়ে
যেমন প্রকৃতি অবারিত—
তারপর কোথায় হারাবো জানবো না।

ভাল করে চোখ তোলো
তাকাও নিজেকে :
বল পুরাতন শিশু—
কী গৌরব থাকে জননীর কাছে!

প্রজন্ম
তাপস সরকার

এক গভীর বোধে সত্তা যখন নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে কথা বলে
শত শত বছর আগে হিজল অরণ্যে মরে যাওয়া জোনাকির মতো।
কুয়াশায় কুয়াশায় অনাম্নী পাহাড়ের লাল কালো জলে
কাতারে কাতারে খুব নীরবে দাঁড়িয়ে পড়ে পূর্বপুরুষ সূর্যপুরুষ।

যখন আমরা মেসোপটেমিয়া ও মহেঞ্জোদারোর
কোনও ভূ-খণ্ডের উপর স্বপ্নকামী ঘোরে হেঁটে যাই অনায়াসে
আমাদের পূর্বপুরুষের কঙ্কাল মিছিল নিবিড় প্রহরায়
আমাদের গতিবিধি লক্ষ করে একসময়ে কাছে আসে
লালসালুতে আঁকা বিপন্ন শহরের ছবি নিয়ে। রক্তচক্ষু ফিঙের মতো
লাজুক নাচে, কথা কয় দুঃখী শহরের সাথে
যৌবনের প্রগাঢ় ভালবাসায় আমরা শহরের বুকে আঁকি
সাহসী স্লোগান।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা শেষ বিকেলের অস্পষ্ট গোধূলি
আলোয় শুদ্ধ হতেন, আকাশে উজ্জ্বল নিশুতি বিদ্যুৎ
চমকালে ভয় পেতেন আর চকোর হয়ে পান করতেন
জ্যোৎস্না আলো।
আমাদের পূর্বপুরুষেরা গভীর অমাবস্যায়
শরীর ভেজাতেন, দাবানলে আগুন দেখে সন্ত্রস্ত হতেন
তাই সমুদ্রে জোয়ার এলে বা শস্যের ক্ষেত্র পুড়ে
খাক্ হলে আমরা আতঙ্কিত হই।

আমাদের আদিপুরুষেরা প্রতিবাদের উচ্চারণে
ঝম্-ঝম্ একটানা ব্যাপক বৃষ্টি শেষের সূর্য হতে চেয়েছিলেন
তাঁরা দাসত্ব ও ক্লীবত্বের জ্বালাময় দৈন্য ছিঁড়ে
মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সূর্য হয়েছিলেন,
মুক্তি পাননি; কারণ তাঁরা সেবাদাস ছিলেন।
আমাদের পূর্বপুরুষরা কৃষ্ণচূড়া লাল রক্ত হয়ে
রাঙিয়েছিলেন স্বদেশভূমের ঈশানকোণ।
সেই থেকে আমরা মৃত্যুকে ভালবাসার দারুণ রঙে
রাঙিয়ে দিলাম, রঙিয়ে নিলাম।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয়ই শেষ বিকেলের
অস্পষ্ট গোধূলি আলোয় ভীষণ বিষণ্ণ হতেন
আমরা তাই নিবিড় রাতে শ্মশান গোরস্থানের
সবুজ ঘাসে
সাদা চাদরের মতো চাঁদের আলো দেখে গভীর দুঃখে
মূক ও বিহ্বল হই।
নদীর জলে বান ডাকলে বা মায়ের ছেলেরা ভালবেসে
যুদ্ধে গেলে অজানা আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হই।
আমাদের আদিপুরুষেরা দ্রবিড় সভ্যতার বুক চিরে
ছুটে গিয়েছিলেন ভালবাসার আগুন পাখালায়
আমাদের আদি পুরুষদের কোনও পার্থিব পাপ
ছুঁতে পারেনি
কারণ তারা নিঃশঙ্কভাবে প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন
ভালবাসার পঙ্‌ক্তিমালা
সেই থেকে আমরা ভালবাসতে ও নিজস্ব আঁধারে
অগ্নিগর্ভ হতে শিখলাম।

মাকে নিয়ে কবিতা

শৈবাল আদিত্য

আকাঙ্ক্ষার ফ্রেমে বাঁধিয়ে স্বপ্ন; একজন মা
একটি আকাশের মত দাঁড়িয়ে...
নদীর পাড় ভাঙা শব্দের মতন
ডুক্‌রে ওঠা ঢেউ বুকে জিইয়ে একজন নারী
ট্রেনের হুঁইসেল হয়ে যার চোখদু'টোতে
কান্না অবিরত আর কুয়াশাচ্ছন্ন মুখে
মাঙ্গলিক কামনা :
'খোকারে—
যেখানেই থাকিস, ভালো থাকিস'
তার জামরুলের মত ঘোলাটে নির্ঘুম চোখের তলে
অতি সন্তর্পণে পুষে রাখা দুই দলা অন্ধকার।

মায়ের মুখ সে তো, যেখানে অনিয়ম আর
অবহেলার তক্তপোশে সাজানো সংগ্রহশালার
সবক'টি মোহনা জুড়ে বিস্তৃত মমতার চর।
মেঘের গর্জন হয়ে খুব দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া
'কষ্ট' বুকে একজন রমণী
প্রিয় সন্তানের জন্য কোনদিন স্বামীর
অহমের প্লাটফর্মে দাঁড়ায়নি যার
আপোষের বগি। কখনো।

আকাশের মত আজন্মের ছায়া হয়ে
আমার মাথার উপরে একজন আশীর্বাদ।
এই একটি নারীর কারণে আশ্চর্যজনকভাবে
পৃথিবীর সব নারীর প্রতি এক ধরনের
ভালোবাসা জন্মে গ্যাছে আমার।

সাদা শাড়ি
অলকা নন্দিতা

নদীতে ভাসুক সাদা কাশফুল
নীলিমায় যাক শরতের মেঘ
আমার মায়ের সাদা শাড়ি আজ
উড়িয়ে দিয়েছি মৃদু হিম রাতে স্বর্গ পুরীতে;
মৃত বাড়ি হোক আলোকসজ্জা
জোনাকির ঘরে নামুক আঁধার
আত্মারা যাতে ভিড়তে না পারে
এই ফুল বনে নির্জনে নীল ঘাসের মায়ায়;
সঙ সেজে যারা মানুষ ভাসায়
মানুষ কাঁদায় দূরে সরে গিয়ে
তাদের জন্য জোনাকিরা জাগে
কাশফুল হাসে মেঘ ঘুরে ফিরে চিলের সঙ্গে;
শুনবোনা আমি কারো কথা আর
সীমারেখা টানি নিজস্বতার
আমার মায়ের সাদা শাড়িগুলো
পুড়িয়ে ফেলবো চুপি চুপি এক পূর্ণিমা রাতে।

বিস্মরণ

কবির হুমায়ুন

আলনায় জামা আছে, এক পাশে তোমার চুলের ফিতে
কতদিন মাটির উঠোনে আমি নেই, মাকে তাই ভুলে যাই
যখন তখন, জানি দিলের কৌটোয় জমা আছে এখনো আমার
প্রথম আঁতুড় চুল, নিয়ে গেছে কেটে যা নাপিতে।

তোমাকেও বাষ্পের মতন হারিয়ে ফেলেছি সেই করে
আমার বাল্যের বধু, সাঁকো পথে আজ শুধু কষ্টের বাগান,
আমাকে অপর কোন মুখ ডাকেনি ভুলেও আজতক, তবু
হিসাবের ভুলগুলো সকাল বিকেলে জমে বারান্দার টবে।

এই যে আমারে মাতালের সুর দেয় তত্ত্বের সিম্ফনি,
পথ নেই, ঘাট নেই, মিছিলে আজব মুখগুলো ভাসে
আমি তার সবটুকু দেখে নিয়ে চুপ্‌চাপ্‌ বসে থাকি
হাতুড়ির আঘাতে হৃদয়ে ঘাই মারে রাজমিস্ত্রির কর্ণি।

আমি কোন দিকে যাবো তুমি নেই আর কেউ তাও বৃথা
আলতায় আজো কি অপেক্ষা করে তোমার চুলের লাল ফিতা?

অধিকার

জাফর আহমদ রাশেদ

অন্ধকার আমার আত্মার।

পৃথিবীর নাভিসূর্যে জারুলের ফুলবৃন্ত হরীতকী ছায়া।
নিজের মশারি নেই—আমি তো মানুষ!
পূর্বে সবুজ ছিলাম—এখন বেগুনি।
সবুজ ছিলাম পূর্বে—এখন কমলা।

ইতিহাস ভেঙে ভেঙে জরায়ু শরীর
গ্রামজ সরীসৃপ বন্দরের জলে
মনমাঝি বলে—
উজানে নৌকা নিয়ে বাণিজ্যে বসতি;
সলতে জ্বালিয়ে দিই মন-পোড়া তেলে,
নীচে অন্ধকার—
আমার মায়ের দুধে
মরিবার
বাঁচিবার
সুপ্ত অধিকার
—আমার আত্মার।

বাঁচা

শোয়াইব জিবরান

পড়ে আছি দূরে নিঃসঙ্গ অনাথ বালক।

অথচ ছিলাম ডানার নীচে, খুচুমুচু
উষ্ণ সারাবেলা আজ ঝড় ও ঝঞ্ঝার দিনে
পড়ে থাকি, আহত চড়ুই।

ডানা নিয়ে উড়েছিলাম এই শহরে ক্রমে
তীব্র হল্লা ও তাপে পুড়েছে পালক
খসে পড়েছে পাখা, আজ খঞ্জ ও ভিখারিদের-ভিড়ে
ঘুরি ডানাহীন, একা একা
(দুষ্টু বালকেরা কাছে পেলে তামাশায় মাতে)।

কেন তবে ও মেয়ে, এই মিথ্যে ওড়া -শিখিয়েছিলে
শিখিয়েছিলে ডানার নীচে বাঁচা

আজ ডানাহীন বাঁচি অনাথ এই নগরে।

আঁতুড়ভয়
মুজিব ইরম

জন্মের আগেই জন্ম হলো ভয়। তাবিজ কবজ দিয়ে সাজানো পুলি। ভাঙা লাঙল আর ছেঁড়া জাল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী হাসে দরোজার কাছে। কান্নার কাছেই ছিলো পিতার আজান।

ছিলাম পরীর ডানা ক্যানো পিতা ঝরালে পালক?

ভুলেও থাকিনি একা। শিশু ছিলে—টাক্‌রাটুক্‌রি যদি নেয় তুলে? বটের গভীর কাছে যে শিশুরা প্রেতের দোসর, শীতের হাওর জুড়ে মক্কল আগুন—ছিলো সব নিরাপদ দুরে।
রাত হলে বুড়ো সুরে হুতুম! হুতুম! আগুনে দিয়েছে মা শস্যদানা শিশা আর সালন হলুদ। তবু ভয় যদি পায় প্রেতিনীর ছায়া!

পূর্ণিমা উঠোনে মধ্যরাতে আলো খুঁড়ে একপাল অশরীরী ভেড়া। পুবের টিনের চালে ঢিল
পড়ে, গাব গাছ দোষের প্রাচীর। এই ভয় ছিলো মাগো যদি পায় অশুভ আছর! পিতার বাজার থেকে কালিবাউশ হলো না কিনা। শেওড়া গাছের ভূত যদি সাথে আসে? কাটা হলো তেঁতুলের প্রাচীন ছায়া।

কী করে ফেরাবে মাগো! নই শিশু, ঝরে গ্যাছে পরীদের ডানা। শানেবান্ধা ক্ষত নিয়ে সপ্তডিঙা নগরে ভাসে।

পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদনা : জয় গোস্বামী

নিবেদন

জীবনানন্দ দাশ

কবি যশ চাহি না মা, তোমার দুয়ারে
আসিয়াছি মুগ্ধ প্রাণে পূজিতে তোমারে!
        বিগত শৈশবে কবে অরুণের সনে
ছন্দোময়ী উদেছিলে মার বাতায়নে!
        এসেছিলে চিত্তে মোর পুলক সঞ্চারি
নিখিল কবির কাব্যে ঝঙ্কারি ঝঙ্কারি
        মানসে জাগলে মম অপরূপ জ্যোতি!
        দিবাকর জিনি—-তব গরিমা ভারতী
আমারে নিয়েছে ডেকে, কৃতাঞ্জলিপাণি
        তুচ্ছ অর্ঘ্য লয়ে আমি ওগো বঙ্গবাণী,
        এসেছি তোমার রাঙা চরণসমীপে!
            কোটি বরপুত্র যেথা গন্ধে বর্ণে দীপে
        তোমার আঙিনাখানি রেখেছে উজ্জ্বল,
আমি সেথা আনিয়াছি এক ফোঁটা জল,
        নিঃস্ব ব্যর্থ হৃদয়ের ব্যথা-উপহার
            নেবে কি মা? মোর তরে খুলিবে কি দ্বার!

সোনার ঘর

অমিয় চক্রবর্তী

লক্ষ ঘরে দেউটি জ্বলে দোলায় দোলে শিশু,
মা জননী, গান ক'রে ঘুম আনো—
উপরে রাত বুকেতে ধরে চাঁদ।
ঘুমো, ঘুমো, ঘুমো।
নদীর ধারে বাড়ি ছিলো, ভোরে নৌকো ঘাটে,
ছলেছলো আলোর জলে রাঙার রাতের শেষ;
সানাই-শাঁখ ছায়ায় ছায় হাওয়ায় হারা; ঘুমো,
যাবো আবার সোনার ঘরের পার।
ঘুমো, ঘুমো ঘুমো।
জেগে আবার যাবো সোনার ঘর।

মা জননী, মুখ দেখে কার তোমার মুখে আলো,
তারায় তারা কাঁপে লক্ষ মোমের বাতি,
ঘুমের বাতি;
ঝিমিক্ ঝিন্ রূপোলি বাজে রাত,
তলিয়ে চলে রাত।
মেঘে-মেঘের কোলে রে ঘুম, দোলে রে ঘুম,
ফুলের ঘুম, নীলের ঘুম,
ঘুমের ঘুম, ঘুমো।
পালঙ্কের স্বপ্নে ঘুম, ঘুমো।

মায়ের প্রাণে শিশুর প্রাণ, ঘুমের গান,
জেগে আবার যাবো সোনার ঘর॥

ওঠো, খাটো, কাজ করো

মণীশ ঘটক

দেশের মাটি আমাকে ডেকে বলে
তুমি ঘুমিও না, ওঠো, খাটো, কাজ করো
দেখছ না যুগান্ত যুগান্ত ধরে আমার শ্রম
কতো গাছকে কয়লা বানালুম
কতো কয়লায় হীরে ফোটালুম
কতো সমুদ্র গর্ভকে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের মাথায়
নিয়ে এলুম
কতো মরুভূকে শস্যশ্যামলা করলুম
কতো নদী ঘুরিয়ে দিলুম
কতো নতুন নদী বওয়ালুম।
আমি অনলস।
দেশের মাটি আমাকে ডেকে বলে
আমাকে মা বলেছ
তুমি আমার ছেলে
তুমি তোমরা সবাই।
তোমার জীবন ত একতাল মাটি
যতক্ষণ না কিছু গড়ছ তা দিয়ে।
ঘুমিও না ওঠো খাটো কাজ করো.
আলস্য ছাড়ো, দেখো কত কি করতে পারো
তোমার শ্রমে
যা আপাত মূল্যহীন
তা দামি হয়ে উঠুক, মানুষের কাজে লাগুক।

ভৌগোলিক
প্রেমেন্দ্র মিত্র

হিমালয় নাম মাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায়?
টিম টিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা;
—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।

দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ ক্ষেতের,
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল মজে হেজে,
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।

উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে-দারুণ দেবতার বর,
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া-তরণীর,
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়!

ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যতো পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিলো এই ভূখণ্ডের,
ছিলো সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।

সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই
আমাদের সীমা হলো
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই।

সন্ধিলগ্ন

বুদ্ধদেব বসু

প্রপিতামহের নাম জানি না। মাতার অশ্রুত নাম
অতি কষ্টে মনে পড়ে। (তিনি, বিবাহিত পত্নী, আসলে বালিকা,
আমার জন্মের জন্য কৃতকার্য প্রাণান্ত চেষ্টা,
সবেমাত্র সক্রিয় যৌবনতাপে গলে গিয়ে, বিলুপ্ত হয়েছিলেন—
সম্পূর্ণ বিস্মৃত আজ—অথচ আমার রক্তে এই মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ
নামে তাঁর সঞ্চার) : মা, আমি প্রণাম করি তোমাকে,
মা, আমি চুম্বন করি তোমাকে, অপরিচিতা, অ-দৃষ্টা আমার,
নিরভিমানিনী! আমি তোমাকে দেখেছিলাম
একদা, অস্পষ্ট ম্লান সেপিয়াতে—চোখ বোজা, ঘুমন্ত ঠোঁটের প্রান্ত,
কোনো-এক ক্ষীণকায় যুবকের বাহুবন্ধে আপাতত তখনও পার্থিব,
অপর্যাপ্ত বিস্রস্ত চুলের গুচ্ছে এমনকি রূপাহিতা—প্রায়।
—কিন্তু বলো, তুমি কি তখনই ছিলে অতিক্রান্ত অন্য এক দিগন্তে উদীয়মান,
অথবা স্বপ্নের মতো ভাসমান যুগপৎ জাগর-নিদ্রায়—
যেমন বাতাসে ঝোলে ধূলিবিন্দু, উদ্ভিদের আঁশ—
মৃত্তিকার—অথচ অনিশ্চিত, দিকভ্রান্ত বাস্তুহারা?
তবে কি তখনই আমি
যন্ত্রণায় তোমাকে বিদীর্ণ ক'রে
নেমে এসেছিলাম আবহমান পথ বেয়ে
(যে পথে আমার পিতা আর সনাতন পিতৃগণ
নিজ-নিজ মৃত্যুবীজ অন্ধভাবে রোপণ করেছিলেন)
আশ্রিত আঁধার থেকে আলোকের ভগ্নাংশে, সংশয়ে,
অজ্ঞান, অব্যবধান তৃপ্তি থেকে দ্বন্দ্বময় দুরন্ত চেষ্টায়?
মা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি, ব্যর্থস্তনী তোমাকে সরিয়ে দিয়ে
অন্য পুষ্টি খুঁজেছি, নিয়েছি কেড়ে—যেহেতু জীবন অপ্রতিরোধ্য—
আর তুমি, অত্যন্ত সংবৃত, স্নেহময়ী,
আমাকে দিয়েছো ছেড়ে, নম্র হাতে, অমাবস্যা-পূর্ণিমার মধ্যিখানে,
শান্তিহীন, ঘূর্ণমান, ম্রিয়মাণ—অথচ জিগীষাদৃপ্ত, উৎসাহিত,
রাত্রিদিন অনন্তযৌবনা দুই প্রেমিকার
বাহুলগ্ন, রাত্রিদিন আকাঙ্ক্ষায় স্বতশ্চল—
যেন আমি অমর, যেন জীবন প্রকৃতপক্ষে ভালো,

যেন তুমি কখনো ছিলে না, কিংবা আমি যেন
তোমারই সহনাতীত পরিশ্রম নই!
তবু আজ মধ্যরাত্রে মনে হয়, তুমি
চঞ্চল, উৎসুক,
সঞ্চরণশীল,
ভোরবেলা, যখন ট্রামের শব্দে স্বপ্ন ছেঁড়ে, স্বপ্নের গুহায়
বিদ্ধ হয় ল্যাম্পোস্টের অবশিষ্ট, আর পর্দাকে ধর্ষণ ক'রে সদ্য রৌদ্র
তূর্যনাদে নূতন দিনের বার্তা এনে দেয় দেয়ালে, টেবিলে—
সেইমতো অনিবার্যতায়,
ঐকাহিক, পুনরুক্ত, পরবর্তী তারিখের মতো,
তুমিও আসন্ন যেন, চিরকাল আরব্ধ এবং
চিরকাল অসমাপ্ত।

প্রপিতামহের নাম জানি না। কিন্তু পিতামহ, লোকে বলে,
ছিলেন মদ্যপ, দাতা, বুদ্ধিজীবী—স্বল্পায়ু ফলত,
এবং সম্পত্তিহীন। তাঁর মেধা আমি কি পেয়েছি
উত্তরাধিকারসূত্রে? অথবা অবিবেচক আত্মবিতরণে প্রবণতা?
জানি না। কাকে বলে মেধা, তা জানি না,
কিংবা উত্তরাধিকার। দুর্নিরীক্ষ্য কোন শাখা-প্রশাখায়,
কোন জলে, কোন বীজে, কোন দূর দৈবের সংযোগে
কিংবা কোন নামহীন অগম্য অতল থেকে
আসে বুদ্ধি, অভিরুচি, প্রেরণা, স্বভাব—
যার ফল আমার আমিত্ববোধ, ব্যক্তিসত্তা—
কিছুই ধারণা নেই।
অথচ—যদিও আমি তোমার উদ্দেশে
কোনো স্বপ্ন, কোনো চিন্তা না-পাঠিয়ে পেরিয়ে এসেছি বহু দীর্ঘ পথ,
তবু আজ স্তব্ধ রাতে সঙ্গহীন অনিদ্রায়
মনে হয় তুমিই আমার রক্তে সূক্ষ্ম মদ, হৃদয়ে অদ্ভুত
চাঞ্চল্য মা, তুমি! বালিকা, মৃতা, আত্মদাত্রী—আক্ষরিক—
(অর্থাৎ আমার মতো তির্যক সংকেতে নয়,
নয় কোনো নিরন্তর-নির্মিত রূপক তোমার ত্যাগ,
নিরন্তর সাধিত ও প্রত্যাখ্যাত—
কিন্তু এক অদ্বিতীয় পরিশ্রমে অনুষ্ঠিত তর্কাতীতভাবে।)

অদ্ভুত, এখানো তুমি সেপিয়ান্তে নিতান্ত কিশোরী,
আর আমি আমার মাথায় দেখি কত শাদা, শোচনীয় দাঁতের অভাব মুখে।
তবু—আরো অদ্ভুত—আমারই মধ্যে এই এক মুহূর্তে ও প্রতি মুহূর্তেই
এক শিশু এখনো জীবনলিপ্সু, এক যুবা এখনো ধরায় চুল্লি হৃৎপিণ্ডে,
এক বৃদ্ধ হামাগুড়ি দিয়ে চলে অন্তিম শয্যার দিকে।
যেন প্রতি মুহূর্তেই জন্ম আর মৃত্যুর সন্ধির লগ্ন,
ঊনষাট বৎসর ধ'রে সেই এক মুহূর্ত পুনরাবৃত্ত—
এক মৃত্যু, যুগপৎ নতুন জীবন:
অতএব তোমার মৃত্যুও যেন চিত্রকল্প, কোনো-এক নিগূঢ় ইঙ্গিত,
যার ফলে তোমাকে হারিয়ে, আমি
হয়েছি সমর্থ, ঋদ্ধ,—ক্ষতিগ্রস্ত নয়,
ভরিয়েছি উপকারী মৌলিক বঞ্চনা
আজীবন কবিতাকে ভালোবেসে—
আর মেয়েদের।

কে এই দু-জন? এই তন্বী তরুণী ও বিহ্বল যুবক, যারা
পরস্পর স্পর্শের কোমল ফাঁকে নিখিল বিশ্বকে ধ'রে আছে,
কিংবা যেন এখনো অপেক্ষমাণ বিশ্বের তারাই অগ্রদূত?
যুবকটি পেশলাঙ্গ, অথচ বলিষ্ঠ নয়—
অর্ধজাত, জায়মান, প্রস্তরে নিবদ্ধ জানু, যেন আদি জড়ের বন্ধনে
এখনো আধেক বন্দী—ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বাঙ্গ সজীব, তাই চুম্বনে সক্ষম।
মেয়েটি সম্পূর্ণ কিন্তু, সবেমাত্র সক্রিয় যৌবনে কান্তিময়ী—অতি সুকুমার—
অতি মৃদু আঙুলে ও স্তনস্পর্শে,
অতি নম্র কটির ভঙ্গিতে
মূর্ছাবিষ্ট জীবনলিপ্সুকে দেয় অবশিষ্ট আবশ্যক প্রাণশক্তি,
ঢেলে দেয় চুম্বনে নিমগ্ন তার ওষ্ঠাধরে
স্বীয় স্নিগ্ধ দেহের নির্যাস,
দুগ্ধ, মদ, মধু—
যাতে সে, নিশ্বাসে ভ'রে কোনো আদিজননীর আগ্নেয় করুণা
হ'তে পারে জড়ের শাসনমুক্ত মানবসন্তান,
হ'তে পারে ব্যক্ত, পরিণত—
যেমন আমিও চাই ব্যক্ত হ'তে, ঐ স্থির যুগল যেন ব্যক্ত,

আর ঐ যুগলে যেমন ব্যক্ত কোনো-এক ব্যক্তির প্রতিভা।
সংক্ষেপে, আমিও স্রষ্টা হ'তে চাই।

মা, তুমি হেসো না, ভেবো না আমি আত্মম্ভরী।
আমি শুধু উৎসুক প্রেমিক
শব্দের, ও মেয়েদের।
কিন্তু প্রেম একাই যথেষ্ট নয়, চাই জ্ঞান, কষ্টকর গবেষণা,
অথচ কোথাও নেই জিজ্ঞাসার চরম উত্তর।
কখনো ভেবেছি, শিল্পী প্রকৃতির প্রতিযোগী, তার সব অভাব মেটান;
কিন্তু যদি প্রতিভাও প্রাণে প্রকাশমাত্র, আর প্রাণ শরীরনির্ভর,
তাহ'লে কবিতা, ছবি, কিছু নেই প্রকৃতির অধীন যা নয়।
তাই মনে হয়, বুঝি জীব শুধু জন্ম দিতে পারে,
সৃষ্টি এক অনাদি রহস্যে ঢাকা;
ফলত, তারাই ধন্য, যারা শুধু ইন্দ্রিয়চর্চায় বাঁচে,
আর যাঁরা অনুচ্চার্য জ্যোতির সন্ধানী।
কিন্তু যাঁরা প্রক্ষিপ্ত, যেমন আমি, মধ্যপথে,
এপারে বা ওপারেও বাসিন্দা না-হ'য়ে শুধু
ভ্রমণে ও বিনিময়ে খুঁজে ফেরে অবৈধ কিমিয়া,
যাতে হয় ভাবনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং যা ইন্দ্রিয়ের দান,
তাও পায় চিন্তনীয় আয়তন, বোধগম্য হ'য়ে ধীরে-ধীরে—
কী বলবে তাদের তুমি? কী তাদের লক্ষ্য, লভ্য, ফলশ্রুতি?
আমি
যৌবনে ভেবেছিলাম কবিতাই প্রেম, কিংবা কামনা উপচে-পড়া,
শোণিতের মন্থনে উৎপন্ন আরো সুস্বাদু মাখন;—
কিন্তু অন্য ধারণা সম্প্রতি
মাঝে-মাঝে হানা দেয় আমাকে—বিশেষভাবে
এইমতো স্তব্ধ রাতে, সঙ্গহীনতায়
মনে হয় কবিতাও প্রবঞ্চনা—সান্ত্বনা—বিকল্পমাত্র,
কবিতার চেয়ে কাম্য নারীর অঙ্গের মধু:
কিন্তু আমি বৃদ্ধ, সব হারিয়েছি।
কিন্তু কিছু হারায় না—সব থাকে—আছে—
যে ঘটনা ঘ'টে গেছে তাও চলে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে,
এমনকি হয়তো বা ফিরে পাওয়া যায়,

এমনকি আমাদের কৃত্য আর-কিছু নয়, শুধু ফিরে পাওয়া!
—যদি বলো অসম্ভব, তবু পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও প্রশংসনীয়,
আর যার সম্বল কেবল শব্দ, তাকে বাধ্য হ'য়ে
শব্দেই চালাতে হবে সব কাজ—যতই কঠিন মনে হোক
তাই আমি অবিরল পরিশ্রমী।

মা, কিছু মনে কোরো না, এ আমার স্বগতভাষণ।
জানি, তুমি অনভিজ্ঞা, নিতান্ত বালিকা।
কিন্তু তুমি মৃতা, আর মৃতের ব্যাপার
আমি এত অল্প জানি, কল্পনাও সেখানে পাণ্ডুর।
তাই বলি, কোনোমতে যদি বা সম্ভব হয়,
একবার এসো না, তোমাকে দেখি,
সবেমাত্র আরব্ধ যৌবন নিয়ে—অতি সুকুমার—
দাও স্পর্শ—স্পর্শাতীত;
আর, সেই অন্যখানে, এতদিনে
যদি কিছু শিখে থাকো, আমার যা এখনো অজানা,
তাও
ব'লে যাও।

স্বপ্ন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

মা-র কান্না শুনলুম:
আর চারদিক অরণ্য হয়ে গেল!
সেই ভয়ঙ্কর ছায়ায় মার-কান্না!
কেন যে আমি এখানে, জানি নে।
শুধু মা-র কান্না!
কী করে পৌঁছুবো সে কান্নার কাছে?
তারপরই ধাপ-ধাপ পাথর, পৌঁছুবার সঙ্কেত।
আর আমি ভূমিষ্ঠ হলুম।

পাঁচ প্রহর

বিষ্ণু দে

ওগো মা, দেখেছি সে যে এল মেঘে মেঘে
শূন্য খেয়ায় পার হয়ে নদী আঁধারে
বিদ্যুতে জ্বলে আমার হৃদয় আঙিনা।
ভিজা বাদলের আঙিনায় এল সবাকার অগোচরে
আমার দুচোখে আষাঢ় ধারায় সে যে এল মেঘে মেঘে
বজ্রে বাজল গান্ধারে বাঁধা বীণা।

ওগো মা, আমাকে বলো দেখি তাকে ঘরে
আনব কি বলো থাকব প্রহর জেগে
অল্প প্রদীপে প্রহরী নিদ্রাহীনা?
সে যে ঘর খোঁজে পলাতক মেঘে মেঘে
সবাকে এড়িয়ে বিদ্যুৎ অগোচরে
কারাগার তার পিছু পিছু ছায়া ফেলে ফেলে ধায় কিনা
হৃদয় আমার ছেয়ে দিলে মল্লারে,
স্নায়ুঝঙ্কৃত আমার অগ্নিবীণা।
ওগো মা শুনেছি সে যে আসে ঐ বিদ্যুৎ আসে মেঘে।

[অংশ]

ছবির সামনে

অরুণ মিত্র

এই ছেলেটাকে কি তুমি চিনতে পারো? যাকে ছেড়ে দিয়েছিলে আমগাছের জটলায় পুকুরঘাটে ছ্যাকরা গাড়ির ছোটায় সূর্যঢলার সীমান্তে? যার ফেরার পথ তোমার বুকের ভেতরে ফুটে উঠত রোজ?

কিন্তু তার আগে তুমি নতুন বউ, ছবির বউ। তোমার শাড়ির আঁচল ভরতি তারা, আকাশময় তোমার স্বপ্ন। তোমার লাজুক চোখমুখে দুরু দুরু জয় কাঁপছে।

কোন্ জয় তা কি তুমি জেনেছিলে কোনো দিন? কেমন ক'রেই-বা জানবে? জয়ের আশাটুকুই শুধু বুকের খাঁচায় লুকিয়ে পুষে রেখেছিলে, বাইরে এনে তার বুলি ফোটানো আর হল না। নতুন বউয়ের ঠোঁটে ভোরের হাসি মাখিয়ে ছবির মধ্যেই বসে রইলে তুমি।

সেখান থেকে যখন তুমি নেমেছিলে তখন কাঁটা, তোমার সারাপথ কাঁটায় কাঁটা। তার মাঝখানে তোমার ব্যাকুল চাউনি আর ছেলেটার ফেরার রাস্তা মায়াপাপড়িতে ঢেকে দেওয়া। প্রতিদিনের সে কি জয় না পরাজয়? হায় মা।

অবশেষে তুমি যখন আমায় প্রাণপণে দেখতে চাইলে তখন তোমার দুচোখ ডুবে যাচ্ছিল অন্ধকারে। তবু আমায় আঁকড়ে তোমার দুঠোঁটের নিঝুম কথা। কোন্ কথা ছিল তোমার জিবের ডগায়? তুমি কি বলতে চাইছিলে, 'খোকা তুই পারলি না, ফিরে আয়, একেবারে ফিরে আয় তুই?' হায় মা।

আলোর আসর তুমি দেখতে পাওনি, দেখতে পাওনি ছেলেটার মুখ ঘিরে তোমার আঁচলের তারা। আমি অন্ধকারে বেরিয়ে এসেই বুঝলাম তুমি সেইখানে। কখনো কখনো উঁচু মঞ্চ থেকে দামামায় আর বহু বহুবার তরুণ গলার সোহাগমিড়ে আমি ছড়িয়ে গিয়েছি। তুমি কোথায় তখন? চার-কুড়ি বছরের বেজে-ওঠা তো খুব পল্‌কা শব্দ নয়। তা-কি কোথাও তোমাকে ছোঁয়নি?

এক মাথা সাদা চুল এই মানুষটাকে কি তুমি চিনতে পারছো? সে তার সব আলো সব বাজনা ওই ছবির তলায় জমা ক'রে দিয়েছে। এখন সমস্ত তাড়সের ওপর তোমার ভোরাই হাসি ঝরুক, ঝরতে থাকুক মা।

শীত-রাত

অশোকবিজয় রাহা

গ্রাম-বুড়ি কাঁথামুড়ি খড়ের ধোঁয়ায়
নাক ডেকে ঘাড় গুঁজে বেজায় ঘুমায়,
পথঘাট ঘুমে কাঠ, কোথা নেই সাড়া,
এক পায়ে ঘুম যায় গাছপালা খাড়া,
ঝোপে ঝাপে শেয়ালেরা সব চুপচাপ,
শিশিরের ফোঁটাগুলি ঝরে টুপ্‌টাপ,
ইঁদুরের বাদুড়ের নেই খুট্‌খাট,
একাধারে শুয়ে আছে ধান-কাটা মাঠ।

বটগাছে কেঁদে ওঠে শকুনের ছা
জেগে উঠে পাখসাট মারে তার মা,
একা একা কুয়াশায় এই শীত-রাতে
কানা চাঁদ ভাঙা এক লণ্ঠন হাতে
আদমপুরের দিকে চালিয়েছে পা।

খোকা ফিরে আয়
দিনেশ দাস

মা বলেন, খোকা ফিরে আয়!
হঠাৎ সজোরে মাথা ঠুকে যায়,
সকল সময় আমি বাধা পাই নিয়ে কচি-কাঁচা,
ফিরে আয় বাছা!

জানিস আমার বড় ভয় করে—সর্বদাই ভয়,
পৃথিবী এখন দেখি গরুর শিঙের মত
তেড়ে আসে সকল সময় :
দরজা জানলা খাট ঘরের দেয়াল,
মাতালের মত টলে, ধাক্কা দিয়ে
ফেলে দেয় সকাল-বিকাল :
ফিরে আয় বাছা,
আবার জীবন পাক এ বাড়ির খাঁচা,
আবার উঠুক কলকলি—
পাখির কাকলি।

ছেলে বলে, মা আমি ফিরব না তোর
তোমার শহরতলির রাজ্যপাটে,
এখানে আমি যে ছুটি রেসের ঘোড়ার মত কলকাতার মাঠে,
সূর্যের সারথি হানে অজস্র চাবুক অবিরাম.
আমার মসৃণ ত্বকে অবিরত ঝরে রক্ত, ঘাম :
তাই বলি, আমার পায়ের চাপে হবে ছত্রাকার
তোমার তাসের সংসার
মা আমার, আমি আর ফিরতেই পারি না.
তোমার দুধের বাটি আর আমি চুমুক দেব না মুখ ভ'রে.
সে-দুধ উপুড় করে ঢেলে দিও
তুলসীমঞ্চের কালো শিলার ওপরে :
পেয়েছি অনেক আমি খেয়েছি অনেক—ঢের,
এখন মাছের পেটি দিও ছোটদের।।

২২শে জুন

সমর সেন

১

গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যাই
কঙ্কালে ভরেছে দেশ
এ রোদে সোনার ধান পোড়ে
মনে নীলকান্ত মেঘ শেষ।
কড়া রোদ যেন শাদা জানোয়ার
দীর্ণ করে করে পৃথিবী আমার।

দেবতারে গালি দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

এখানে বিরাট ব্রিজ
আসন্ন কালের সংকেত মহিমায়
মরাদেশে জীবন্ত মানুষের মতো
উদ্যত।
সন্তর্পণে ব্রিজ পার হয়ে
রক্ত বর্ণ গোধূলিতে, ক্লান্ত জিজ্ঞাসার মতো,
যেন চিরকালের কেরানি, পদব্রজে
অন্ধকার গলির গহ্বরে ফিরি।
যন্ত্রে দাপটে আকাশ-জাহাজ
ছিন্ন করে বায়ুস্তর, খর শব্দ শেষ হলে
কিছুক্ষণ পরে বাজে আতঙ্ক-ভঞ্জন সুর
তারপর রেডিওতে পূরবীর সুর।
অবস্থা সঙিন বটে। রুদ্ধ রাত্রি। কিন্তু রুশ চীন দেশে রাক্ষস-নাকাল
দেখি লাল নীল সবুজ সকাল।
শৌখিন স্বস্তিতে
সত্তার গভীর নীলে কল্পনার পায়রা ওড়াই
যেন বাগানের অন্ধকারে নীল ফুলের রোশনাই।

২

দুকোটি ক্ষুধার অভিশাপ
সংহত বাংলা দেশে।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,
নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে।
দুর্দিন রপ্তানি কিছুদিন বন্ধ কর
এ দেশে, হে দেব! ক্ষান্ত কর দাক্ষিণ্য দারুণ।
বিপুলা পৃথিবী অন্যদেশে লেগেছে আগুন
কালসিটে কালোমেঘ, সূর্যাস্তের রঙ যেন মানুষের খুন
কিন্তু সেখানে আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গে
ধূমায়িত অরণ্য প্রান্তরে বিদীর্ণ পাহাড়ে
গুপ্তস্তরে পলিমাটি জমে; দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল,
দর্পহর বর্বর বাহিনীর, সবুজ সকাল আসে;
সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হলে
বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন
জোসেফ স্টালিন।

প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
অমর নমস্য তারা। ঈগল চক্ষুতে
তারা দেখে বিচ্ছিন্ন শহর গ্রাম, ধোঁয়াটে প্রান্তর,
আরো দেখে অবিচ্ছিন্ন জীবনের একসূত্র, ঘনিষ্ঠ প্রান্তর,
নারকীয় অন্ধকার পার হয়ে তারা আসে পাহাড় চূড়ায়:
লেনিন, স্টালিন, জুখভ্ ও গোর্কি,
তাদের আমরা চিনি, কিন্তু বুঝিনা তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দুনৌকোর যাত্রী এই বাঙালি কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।

চোখ ফেরালেই

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সময়ের দিকে চোখ ফেরালেই দৃষ্টি ঝাপসা
হয়ে আসে।
এখন যৌবনস্মৃতি অস্পষ্ট। যেন বহুকাল আগে
ভোরের কুয়াশায়
পাখির ডাক—বুকের মধ্যে কোথাও মিশে আছে

সেই যে কবে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেছিলাম,
ঠাকুরদা-ঠাকুমা, মা-বাবা তখন বেঁচে;
আমি ফিরে আসব ভেবে একটি ছোট কৃষ্ণচূড়া
গাছের দিকে
তাকিয়েছিলেন আমার মা, ভেবেছিলেন
ফিরে এসে অনেক বড়ো একটি গাছের ছায়ায় আমি
অবাক হয়ে দাঁড়াবো।

নিজের ঘরে ফিরতে পারিনি, সামনের কোনো ঠিকানায়ও
পৌঁছাতে পারছি না;
বিকেলের শেষ রোদে দাঁড়িয়ে সেই ছোট কৃষ্ণচূড়া গাছের
কথা মনে পড়ে,
আমার মা যাকে অনেক কষ্টে লালন করেছিলেন।

ফিরে ফিরে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলছিল : আসবেন
দেখব, আসবেন
আচ্ছা, আসবেন দেখব।

বলেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলেছিলাম : মা আমরা,
খেলনা আনব—
মা আমার,
আজ ঠিক আনব।

বলেছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি॥

মা গাইছে

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বাইরে এখন বোশেখি ঝড়্ রাত্তির।
বাতাস হাজার রাক্ষসী, প্রাণ-ভোমরার
খোঁজ পড়েছে : কে নিল প্রাণ, কই সে?—
ঝাঁমরে ওঠে বাজ, বিদ্যুৎ নখ তার
ঝিকিয়ে আসে : কে নিল প্রাণ, কই সে?—
ঘরে পিদিম নিবু-নিবু, নিঝ্‌ঝুম।

খোকার কাছে বসে এখন মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান।

পিশাচ-আলোয় চমকে ওঠে খালবিল
শিবনেত্র শ্মশান-পুজোয় তান্ত্রিক :
কে দিবি প্রাণ? চাই বলিদান! ওঁ হ্রীং!
ডাকে নিশি দিশিদিশি : আয় আয়
ঘরে-ঘরে মায়ের খোকা আয় রে!
দর্‌জা ঠেলে আলাইবালাই : দোর খোল্‌।

খোকা আগলে বসে এখন মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান।

'ঝড়ের মুখে বিষ্টি হেনে আয় ঘুম'
মায়ের গলা বজ্র হেন গম্ভীর
'ফুল-ফোটানোর বিষ্টি নিয়ে আয় ঘুম'
মায়ের গলা ভ্রমর যেন গুন্‌গুন
'মিষ্টি রোদের দিষ্টি নিয়ে ঘুম আয়'
শাওনের মেঘ মায়ের গলায় গান গায়।

খোকা ঘুমোয় পাড়া জুড়োয়- -মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান।

ঘুমোয় খোকা ঘুমোয় রাতের সূর্যও
ঘুমোয় পাখির গলায় গানের ঝর্না

ঘুমোয় রে ফুল নতুন ভোরের ভরসায়!
ঘরে পিদিম নিবু-নিবু, ঘুমঘুম,
দুঃখিনী মা-র শিবরাত্রি সল্‌তে
ঘুমোয় খোকা নতুন ভোরের ভরসা!

খোকা ঘুমোয়, বসে এখন মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান।

ঘুমোয় খোকা রাক্ষসী ঝড় গর্জায়
ঘা দিয়ে যায় আলাইবালাই দরজায়
খোকা ঘুমোয়—কে জাগে—আজ, কে রে!
পাগল-মাতাল আকাশ-পাতাল তোলপাড়
খোকার শিয়র কে জাগে আজ রে!
পাগল-মাতাল আকাশ-পাতাল তোলপাড়
খোকার শিয়র কে জাগে আজ, কে রে!
ঘরে-ঘরে আকাশপিদিম কার চোখ?

জাগে আশা জাগে কেবল মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান।

মায়ের মুখ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোরাস। তবে কি মুখ তুষারসমুদ্র রে,
তবে কি আশা প্রস্তরের মায়া!

প্রথম। তেমন আলো কোথায় আমি পাবো
যে হীরা চোখে নবজাতক জ্বলে?
তেমন ছায়া কোথায় আমি পাবো
স্বচ্ছ সেই কালোদিঘির শান্তি।

কোরাস। তবে কি মুখ তিমির সমুদ্র রে,
হায়, আমরা লবণজলে অন্ধ!

দ্বিতীয়। মায়ের মুখ দেখবো ব'লে আমি
প্রতীক্ষায় দীর্ঘরাত ধ'রে
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি; মা
দেয়ালে আঁকা নিশীথিনীর মুখ।

কোরাস। হায়, আমরা তুষারঝড়ে অন্ধ;
কোথাও নেই ভাগীরথীর শান্তি!

তৃতীয়। মায়ের মুখ দেখবো ব'লে আমি
দ্বিপ্রহরে পাষাণ-মন্দিরে
পাগাল হয়ে ঘুমিয়েছিলাম; মা
মুখোশে ঢাকা কালোপাথর মুখ।

কোরাস। কোথাও নেই ভাগীরথীর মুক্তি,
আমরা এ কী চারদেয়ালে বন্দি

চতুর্থ। যন্ত্রণার এক তিমির থেকে
তিমিরতর আরেক কুয়াশায়
হয়েছি নতজানু; আমার মা!
অমনিশার আলোয় মুখ রাখো।

কোরাস। চারদেওয়ালে এ কোন নিরাশা,
অন্ধকার দুয়ারে এ কী ক্লান্তি!

ম্যাডোনা

অরুণকুমার সরকার

যখন সে কোলের ছেলেকে স্তন দেয়
(দেখিনি তা)
অনুমান ক'রে নিতে পারি
বৃষ্টি ঝরে বৈশাখের তেপান্তর মাঠে;
আবির্ভূত হয় ছায়াস্নিগ্ধ মায়ামুগ্ধ তরু, গ্রাম;
জেগে ওঠে সূর্যালোকে শীতের কুয়াশা ঠেলে দিয়ে
স্রোতস্বিনী।

আমি তার কুমারী চোখের রহস্যের বিদ্যুতের
ছোঁয়াচ পেয়েছি একদিন।
সেই টানে
বহুদূর থেকে এসেছিলুম এখানে
কিছু সুর নিয়ে চোখে
কিছু ব্যথা নিয়ে প্রাণে,
কিছু কথা নিয়ে অর্থহীন।
সর্বাঙ্গে পথের ধুলো, রৌদ্রের প্রহার, জ্বালা, তাপ
রক্তের প্রলাপ, ক্লান্তি, অবসন্নতায় হতাশায়
শান্তি নেমে এলো যেন ঘুমের আচ্ছন্ন অনুরাগে :
দেখলুম দুটি চোখ ; ক্রীড়ারত শিশু আর
অসীম অনন্তকাল স্তব্ধ স্থির
মায়াবী আয়নায়।

সহস্রাক্ষ শিশু

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

ফুল, শিস, রুনুরুনু মায়ের মিষ্টি চুড়ি—ওরা সব জানে
মসৃণ চামড়ায়; ওদের পিচ্ছের গায়ে
লক্ষ চোখ: যেন যোনি, যেমন দেখেন
সহস্রাক্ষ, যৌন সুখ চোখ কান জিভ নাক ত্বকে।
এই সুখ ভেঙে ফ্যালে বয়ঃসন্ধি এসে,
ও যৌবন! পোড়াধানে আনন্দের পুড়া ভরে যায়।
ওসকাও সলতে শুধু, রক্তবর্ণ, আগুন ও শীষে।
ক্রমে বড়ো হয়, দীর্ঘে বাড়ে, মুখে তামাকের বাতি :
শুধু যে পারে, সে, দীপ্ত মগজের যোগে
হয়ে ওঠে কবি, তাঁর ভোগঘর.পাঁচটি ইন্দ্রিয়ে।

স্বগত

জগন্নাথ চক্রবর্তী

যে ছিল অনেক কাছে,
এসেছিল নক্ষত্রের মতো,
জীবনের মাঝে,
আজ সে এখানে নেই—
মনে নেই—
কোনোখানে নেই।

যে ছিল, যে কাছে নেই,
যে গিয়েছে বহুদূরে সরে
সে যেন সুখেই থাকে
সে যেন শান্তিতে থাকে
সে যেন না মোছে চোখ
অন্ধকার ভোরে।

ভিক্ষুক-মনকে বলি
কাজ নেই নিষ্ফল ভিক্ষায়
বারোটি দুঃখের গান বেঁধে রাখি
তাই গেয়ে গেয়ে
বৎসর ফুরায়।

কত কিছু দৈবে ঘটে

নরেশ গুহ

কত কিছু দৈবে ঘটে ধরণীর পদপ্রান্তে এসে।
কুটিল নদীর স্রোত পাড়ি-ধসা দুঃস্বপ্নের শেষে
আশার সমুদ্রে মেশে, জনতার মেলা
ধাবমান প্রহরের ডঙ্কা শুনে ভেঙে দেয় খেলা;
সোনার বিকেল পড়ে বসন্তের পাতায় পল্লবে :
সব হবে, মন বলে, আবার আবার সব হবে।

দ্রুত ট্রেন দু'দণ্ডের শ্বাস ফেলে স্টেশনে দাঁড়ায় :
জানালায় হাত নেড়ে কে কোথায় দূরে চলে যায়,
পিছু ফিরে তাকায় না, যদি চোখ ঘোর হয়ে আসে।
দিনান্ত ফেরায় রঙ বীরভূমের আকাশে-আকাশে।

কত কিছু দৈবে ঘটে। খোলা মাঠ, ছনে-ছাওয়া বাড়ি,
রেললাইনের পাশে চীনেচিত্র শিমুলের সারি,
ডোবাতে পল্লীর ছায়া, আসন্ন তিমিরে চেয়ে থাকা
জ্যোতিষ্কের দীপ্ত চোখ চৈতন্যে নিমেষে পড়ে আঁকা।

যদি ফিরে আসা যেত, ধরণীতে কত দৈব ঘটে!
সমুদ্র-মেখলা মাটি পর্বতে কান্তারে সমতটে
দূরে দূরান্তরে জাগে কত মৃত্যু কত ভালোবাসা :
বুক ভেঙে যায়
আনন্দে বিষাদে বেদনায়
কী মন্ত্র শেখায়, দ্যাখো, আনন্দিত শালবীথি,
বলে, 'আশা রাখো
জীবনের যত অসম্ভবে।'
সব হবে, মন বলে, আবার আবার সব হবে।

চতুর্দিকে অন্ধকার

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চতুর্দিকে অন্ধকার, তারই মধ্যে এখানে-ওখানে
কয়েকটি বাড়িতে
আলো জ্বলে,
টিভি চলে,
হাস্যমুখে ভাষ্যকার বলে—
বিদ্যুতের উৎপাদন আজ বিকেলে যথেষ্ট ছিল না

যারা শোনে, তারা ভাবে, বটে?
যেমন সংবাদপত্রে, তেমনি দেখছি টিভিতেও রটে
উল্টোপাল্টা গুজব!—তাদের
ফ্রিজের ভিতরে
ল্যাংড়া আম, মাখন, সন্দেশ, ডিম, ব্রয়লার চিকেন
টাটকা থেকে যায়।

চতুর্দিকে অন্ধকার, তারই মধ্যে একটি-দুটি শৌখিন পাড়ায়
আলোর বন্যায় ভাসতে থাকে
বাড়িঘর।
ঐগুলি কাদের বাড়ি? সম্ভবত ঈশ্বরের তৃতীয় পক্ষের
পুত্র ও কন্যার।

কে যেন বলতেন, 'আগে সম্পদ বাড়াও,
তা নইলে দারিদ্র্য ছাড়া আর
কিচ্ছুই দেখছি না... ইয়ে...
বণ্টন করবার মতো।'

তখন বক্তৃতা শুনে হাততালি দিতুম,
প্রত্যেকে ভাবতুম,
এ-সবই যৎপরোনাস্তি যুক্তিযুক্ত কথা।
সত্যিই তো, দেশে
সম্পদ যদি না বাড়ে, কী হবে দারিদ্র্য বেঁটে দিয়ে।

হিসেবে গরমিল ছিল, সেইটে বুঝে শেষে
ইদানীং আমরা কিন্তু তাতেও সম্মত।

তেত্রিশ বছর ধরে প্রতীক্ষায় থাকতে-থাকতে হাড়ে
দুর্ব্বো গজাবার বেশি বাকি নেই।
সেই কারণে বলছি, আপাতত
যা বণ্টন করা যায়, তা-ই করুন, এই
দারিদ্র্যই বাঁটা হোক, তার সঙ্গে অন্ধকারও হোক।
অবস্থা যা দেখছি, তাতে সর্বাঙ্গীণ সেটাই মানাবে।

চতুর্দিকে অন্ধকারে, তারই মধ্যে ইতস্তত আলো
দেখতে-দেখতে ইদানীং
একটাই ভাবনা জাগে : মনে হয়,
এর চেয়ে বরং
সবাই একসঙ্গে অমাবস্যার ভিতরে ঢোকা ভাল।
একসঙ্গে আনন্দ করা ভাগ্যে যদি না-ই থাকে তো শোক
সবাই একসঙ্গে করা যাবে।

ঘড়ি

কেদার ভাদুড়ী

আমার পূর্বতন বধূটির সঙ্গে বরদান মার্কিটে দেখা হয়ে গেলো হঠাৎ।
বল্লাম : কেমন আছো? ও বললো : যাও।
বল্লাম : ছেলে বড়ো হয়েছে? কোন ক্লাসে পড়ে?
ও বললো : যাও।

বল্লাম : যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে, বলো তো
মেয়ের বিয়ে দিয়েছো? ও কোথায়? এখন?
ছেলে কী করে? শুনেছিলাম মাটি খোঁড়ে? কপারফিল্ডের, সত্যি?
ও বললো : যাও।

বল্লাম : অতো 'যাও' 'যাও' কোরো না তো। বলো : এসো।
বলেই হাত ধরে টেনে নিয়ে তোয়াবজির পানশালায়।
বল্লাম : ভারমুথ। খাও ও। খেতে খেতে, খেতে খেতে
শাড়ি পরলো প্রথম বিবাহের, গলায় পরলো সাতনরী হার
কেশদামে ঝুলিয়ে দিলো স্বর্ণচাঁপা, অজস্র বকুল, জুঁই
বললো, কিছুই বললো না, শুধু কেঁদে উঠল, যেমন কেঁদে ওঠে বালিকারা
প্রথম সঙ্গমে।

অমনি একটা বেরাল, কালো বেরাল বেরিয়ে এলো, ডাক ছাড়লো মিউ
তাকিয়ে দেখি বেরাল নয়, তোয়াবজি, তোয়াবজি, সময় কাটছে ঘড়ি।

থলকাবাদের বাংলোয়

রাম বসু

নিজেকে নিয়ে একা ছিলাম আমি

দুপুরের রোদের তাতে ঝিমিয়ে পড়েছে অরণ্য
ঘুমের ঘোরে আধাফোটা কথার মতো পাতার শব্দ
এলোমেলো মেঘগুলো অলস মন্থর নীল গাই
পাহাড়ের মাথার ওপর চরছে
বনমোরগের পালকের বিচিত্র রং লেগেছে জঙ্গলে
দূরের ঝোপঝাড় যেন কোন্ মেয়ের জটপাকানো এলোচুল
রোদের চিরুনি আটকে যে পিঠ ফিরিয়ে গান গাইছে
তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কিছুতেই।

বাংলোর বারান্দায় আমি একা
আমার ভাবনাগুলো এক ঝাঁক পাখি
মৃগনাভির গন্ধের মতো আমার ইচ্ছা
আধখানা চাঁদের মতো শাণিত উজ্জ্বল আমার শরীর
এলিয়ে দিয়েছি বাংলোর বারান্দায়।

আমি যেন একরাশ ফুলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে
আমার অস্তিত্বের তলায় ডুবে যাচ্ছি।

মেঘ করেছে কোথাও,
কাপাস ফুলের রঙে কোমল হয়ে এল বন
খরগোশের কানের মতো উৎকর্ণ পাতা
যে মেয়ে চুল এলিয়ে গান গাইছিল
সে যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে।

সেখানে এখন অন্ধকার, গহন অন্ধকার
হাতির মতো শুঁড় পাকিয়ে দাঁড়িয়ে
আর অনেক দূরে হয়তো পাহাড়ের তলায়
আদিম অস্পষ্ট শব্দ মাঝে মাঝে উঠছে আর পড়ছে।

দৃশ্যের ওপার থেকে তুমি কি ডাকছ আমাকে?
তাই কি জাগল স্তব্ধতায় ঢেউ

কি তাই আমার মুখের প্রতিবিম্ব
আবার হাজারখানা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল হাজার দিকে?

আমার স্তব্ধ রক্ত আবার পাক দিয়ে উঠল
ঘূর্ণির কঠিন টানে আমার শিরাগুলো
সেতারের তারের মতো ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেল
হাজার বোলতার কামড়ের জ্বালা আমার শরীরে
আমার আঙুল কটা মুঠো হয়ে এল শক্ত থাবার মতো
নিশ্বাসের তাপ লেগে পাতাগুলো মরা পায়রার মতো পায়ের কাছে।
তোমার অদৃশ্য ডাকে হু হু করে উঠল চরিতার্থ ভালোবাসা
তার কোটি শিখা কোটি সাপের মতো ফণা তুলে নাচছে
আর আমার ঠিক বুকের কাছে ছোবল মারছে, ছোবল মারছে।

ঠাণ্ডা বুনো হাওয়া
কালো হয়ে সংকুচিত সেই অরণ্য একটা মুঠোয় বন্দি
বজ্রের আঘাতে আকাশের নিরেট গম্বুজ হুড়মুড় করে ভেঙে গেল
আর এই বাংলোটা একটা পাতার মতো উড়ে গেল তার বাতাসে

এই ভালো, এই ভালো, আমাকে আমার আগুনে পুড়তে দাও
নিশ্চিহ্ন হতে দাও সেই তরল সোনার মতো আগুনের গরলে
শাঁই শাঁই করে আসছে লাখ লাখ তীরের মতো বৃষ্টি
আমাকে বিদ্ধ করুক, আমাকে বিদ্ধ করুক।

তারপর আমার চিতার ওপর জল ঢেলে দিয়ো।

তুই কেমনতরো মা?

কৃষ্ণ ধর

জন্মেছিলাম তোরই ঘরে ফুটোচালের ছাতা মাথায়
বর্ষা যখন ঝেঁপে এলো কে জানে তুই গেলি কোথায়?
রক্তমাখা আঁচলে তোর শুয়েছিলাম চোখটি বুজে
শুনিনি তোর উলুর শব্দ দেখিনি তোর চন্দ্রসূর্যে।
এখন তো তোর মুখের দিকে চাইতে গেলে আঁতকে উঠি
বলেছিলি সোহাগ করে, 'সোনা হবে ধুলোমুঠি'
এখন তো তুই কথা বলিস না
দু'চোখে তোর জল ঝরে যায়, তুই কেমনতরো মা?

মা যেখানে থাকেন

সিদ্ধেশ্বর সেন

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য."

সূক্ত ।। ৫ ঈশোপনিষৎ

মা যেখানে থাকেন, সেইখানেই
তো মন্দির

পূজার্চনা শেষ হয়েছে, এখন
গঙ্গাজল
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

এখন তিনি ঘুমোন, আমি
জেগে আছি
শিয়রদেশের পাশে, আমি
রইব জেগে, মা

যেখানে আছেন, সেখানেই
তো মন্দির

হাসপাতাল আর মন্দিরে কী এতই
মাখামাখি
এইতো থাকেন, মা

এইখানে—তিনি ছিলেন, এই-ই
যেমন পরিপাটি, এই তো, তেম্নি
আছেন শুয়ে—আমার

মা-জননী মন্দিরে তাঁর, অ রোগ
বিছানায়
আমি রয়েছি জেগে, উনি
ঘুমিয়ে আছেন

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

২
স্বস্তি
ফিরুক তাঁর নিশ্বাস
ফিরুক, যা, মাতরিশ্বা
হাওয়া
স্বস্তি
নমো মধু

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত---মধু, মধু
ফিরুক, অন্নময় তাঁরই
প্রাণ—
মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময়ও
ক্ষিতিতে, অপ ও তেজে
মরুৎ ও ব্যোমে
স্বস্তি

জাতবেদ অগ্নিমুখে, স্বস্তি
স্বপ্নে, স্বপ্নভঙ্গে, প্রয়াণে হে
অলক্ষ্য, অলক্ষ্য যানে
দ্যাবাপৃথিবীর থেকে উত্থান, উত্থিত
চরাচর
পঞ্চভূতে---অন্তরীক্ষে---ভূপৃষ্ঠে ও স্রোতবহতায়,
ভেসে অনন্তযাত্রায়...
নির্মলা মা, ফের একাকিনী, ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ
—মা আমার ।।

মা

মণীন্দ্র গুপ্ত

গ্রামের ছায়া ভরা জঙলা পথে
বালিকা মেয়ে ঘুরে বেড়ায়।
মায়া আর নির্মায়ায় তার মুখখানি যেন অর্ধকালীর,
দক্ষিণ বাম যে দিক দিয়েই দেখি : অপরূপ।
গোলঞ্চ তার মাথায় ঝরে পড়ে,
বকুল ঝরে ঝরে উড়ে আসে পায়ে।
নীরব গাছজগতের এই অপাপ যোনিগুলি তার বড় প্রিয়।
সে নীল অপরাজিতা আর লাল জবার কাছে গিয়ে
ফুলের গর্তে ফু দেয়।
কাকলির মতো সেই মিষ্টি ধ্বনি নীরব বনের মধ্যে দিয়ে চলে যায়
তিমিমাছ সিন্ধুসিংহের হিম জল, স্বর্ণঈগলদের ধু ধু আকাশ পেরিয়ে
নীহারিকাদের কানে,
তাদের জাগিয়ে দিতে।

মাকে প্রণাম

শান্তিকুমার ঘোষ

প্রতিপদের চাঁদ আজ পূর্ণিমার দিকে।
তুমি চলে গেছ
প্রায় নিঃশব্দে।
আমার সমুদ্র উত্তাল :
প্রবোধ মানে না।
ঠিক তার মতো
সইলে কত তাপ...প্রহার একের পর এক!
তবু ঝলকিয়ে উঠেছে উজ্জ্বল নীলমণি
আভা ছড়িয়ে আমাদের হত-দরিদ্র জীবনের উপর।

চাঁদের আলোয় আনন্দ তোমার :
আমি আঁখি মেলে দেখে নিয়েছি সেই চাঁদিনী।
দুঃখ যখন গলে পড়ল বৃষ্টি . . আরো বৃষ্টি হয়ে
আমি দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছি সেই ধারা-নির্ঝরে।

ডানায় ঢেকে রেখেছিলে এতকাল,
উড়তে শেখালে বিজয়ী মাথা তুলে আকাশে।
বজ্র-বিদ্যুতের মুহূর্তে অভয় চাইতে দেবতার কাছে!
তোমাকে কেন্দ্রে রেখে প্রদক্ষিণ করে আসতাম গোটা পৃথিবী
জানতাম. মন্দিরে নয়, আছেন দেবী আমাদেরই কুটিরে।

মুখে-মুখে গান বেঁধে গুঞ্জরনময় ফিরতে আপন মনে,
শিশুকাল থেকে পান করেছি সেই সুষমা-মাধুরী
ঘুমের গভীরে বেজে উঠলে অর্ধরাত্রির শিঙা-ঢাক,
পাঠিয়ে দিতে আমাকে অর্ঘ্যহাতে পূজা-মণ্ডপে,
জানতাম দৃঢ় উপবাসী থাকবে আমারই পথ চেয়ে।

আজ অনন্ত চতুর্দশী, মহানগরীর লোক ভেঙে পড়েছে
অসীম সৈকতে।
বাজনা নয়. গীত নয়, গণপতির নম্র নিঃশব্দ বিসর্জন
সমুদ্রসলিলে।

ভরা হল দুঃখের কলস
আমিও ফিরে চলি শ্লথ পায়ে বেলাভূমি থেকে
ফাঁকা প্রতিধ্বনিময় একা ঘরে।
শূন্য বেদি, কোথায় নামাবো ঘট নেতির আঁধারে।

না বলে তুমি গেলে চলে।
তুমি কি খুব দূরে চলে গেছ –
বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে হিমাদ্রি ছাড়িয়ে
তুমি কি নক্ষত্র হয়েছ বিশাল আকাশে–
যার কোমল রশ্মি এসে ছোঁয় তাপিত আমার ললাট।

আমি ভুলি কি করে তোমার সঙ্গে আরোহণ ঐতিহাসিক
অম্বর-দুর্গে,
ময়ূরের বাহার জয়পুরে, বৃন্দাবনে টিয়ার মেলা- সন্ধ্যারতি
দেব দেউলে।
লছমনঝুলার আলম্বিত সাঁকোর উপর দিয়ে পারাপার
সুন্দর মুহূর্ত সেই অনন্ত মুহূর্ত সব কে পারে রাখতে ধরে।

তুমি কি একেবারেই চলে গেছ –
সবচেয়ে নিকট, সব চাইতে দূর।
বসে নেই বড় জানালার ধারে কিংবা টানা বারান্দায়
এশিয়া মহাদেশের মতো, হাত বাড়িয়ে চির ভিক্ষুর দিকে

উড়াল পুলের মাথায় আজ জোড়া রামধনু,
কিন্তু তুমি চলে গেছ
পড়ে আছে তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন,
আর আমি চলচ্ছক্তিহীন শিয়রে তোমার।

শুনি বাণী জগৎমণ্ডলে :
'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং'
ধ্বনিহীন শুনি শব্দ :
'বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥'

আলোর ভাসান

সুনীলকুমার নন্দী

হারিয়ে গেলে মাগো, আমার আলোর সরোবর

বুক আঁধারে মুখ ডুবিয়ে কাঁদুক এখন ঘর ---
ভাঙুক এবার কোটি কণ্ঠ, করুণ অবসাদ
ঝরুক যতই চোখে-মুখে শীতল নদীর হাত
রাখবে না কেউ। তুমি তো আজ সুদূর, ব্যবধান
বিশাল আকাশ। পুড়ছে ঘরে প্রভাতবেলার গান।

তোমার কোলে মাথা রেখে শোলক-শোনা মন
পাড়ি দিত গহন সাগর, আলোর অন্বেষণ
আলোর মালা স্বপ্ন চোখে,---ভালোবাসার ধন
তোমার চোখেই দেখেছিলাম, আকুল প্রস্রবণ
তোমার আলোয় পথ ভেঙেছে অন্ধকারের পাড়

এরই মধ্যে আলোর ভাসান! অপার অন্ধকার
আমি তোমার আলোয় মাগো, অবিশ্বাসী স্বর
কেঁপে উঠল: তোমার আলোয় আমার কৃপণ ঘর
শরিক হতে পারল না আর। রাতের মোহানায়
দিনের আলো ডুব দিল, ওই কালসন্ধ্যে ছায়---
বইছে হাওয়া এলোমেলো, ভাঙছে বুঝি ঘর।

মা

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তাঁহার হাত ধরিয়া প্রথম হাঁটিতে শেখা,
মুখ দেখিয়া আকাশ চেনা, নীলিমা ও নক্ষত্র চেনা,
হাঁটুতে ধরিয়া প্রথম দাঁড়ানো।

হাঁটা-চলার সেই দুরু দুরু চৌকাঠে দাঁড়াইয়া থাকিতেন তিনি
প্রতি সন্ধ্যায়। কী অস্থির, ঘর-বাহির করিতেন।

পাড়ার বঙ্কিমবাবু সেইবার ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিলেন ভাষণ দিয়া।
ফিরিয়া আসিলাম আমিও
বাঁকাগলির মুখে সাতবার আছাড় খাইয়া, ক্ষতবিক্ষত।

সেইদিনই চকিতে দেখিলাম, চৌকাঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন তিনি,
চলিয়া যাইতেছেন, একান্ত উদাসীন। যেন আমি
ফিরিলাম কি ফিরিলাম না, তাহাতে তাঁহার উদ্বেগ কিংবা কৌতূহল আর নাই।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিপন্ন আমি, ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কায়।
কহিলাম, 'বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, মা, আমাকে খাইতে দাও।'

তিনি কহিলেন, 'আমি আর পারি না, বাপু, এইবার আমাকে রেহাই দাও,
অন্য নারী আনিয়া দিতেছি। আগামী পনেরোই তোমার বিবাহ।'

মা দুর্গা

সুনীল বসু

সেই সময় আমার খুব দুঃসময় যাচ্ছিল
আমি একটা ট্যাক্সি করে খুব কম্পিত বুকে
যাচ্ছিলাম, একজনের
ম্লান রূপসী মুখ দেখতে
পাঞ্জাবি, দাড়ি মুখে ট্যাক্সি ড্রাইভার
আমার চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখ দেখে বলেছিল
দুর্গা মাইকে ডাকো
দুর্গা মাইকে ডাকলে
আর কোনো বিপদ তোমাকে ছুঁতে পারবে না
অনেক অনেকদিন চলে গেল
এখনো কোনো সঙ্কটে পড়লে,
মনে মনে বলি
মা দুর্গা, মা দুর্গা, মা দুর্গা
হে মা দুর্গা
তুমি সর্ব দুর্গতিনাশিনী।

আবার শীত এসে যায়

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাইবেরিয়া ফেরত পাখিরা এবারের শীতে
আমার জন্যে বাসা বানাতে এসে পৌঁছয়নি ...
ওদের অপেক্ষায় থেকে থেকে উইঢিপি হয়ে যাই ক্রমে।
এরপরের শীতে পাখিরা এলে খুঁজে পাবে না আমাকে
যদি না ইতিমধ্যে কোনও খরিস-সন্তান উইয়েদের আস্তানা
তছনছ করে ওদের নির্বংশ করে দেবার প্রয়াস পায়।

স্তেপের প্রান্তর পেরিয়ে সাভানা ঘাসের বন... সেখানে
সেই কালো ডানা পাখিদের অতিথি ছিলাম কতকাল ...
তখনি ভেবেছিলাম পৃথিবীর তাবৎ আণবিক অস্ত্র-গুদাম
ধূলিসাৎ করে দিয়ে পাখিদের হাতে দিয়ে যাব
নীড় তৈরির দায় .. নাম দিই তার
'সবুজ সান্ত্বনা ...'

সেই ভাবনা দায়ের করতে আমি আদালতে যাই
বলি-- ধর্মাবতার আমার আর্জি শুনুন...আমার...
কেউ শোনে...কি শোনে না... কে জানে...
আবার শীত এসে যায়...!

ভয়

আলোক সরকার

মা জানো, খেলার মাঠে ছবির খাতাটা আমি
হারিয়ে ফেলেছি। চারিদিকে কতো খুঁজলাম।
বকুল গাছটার নীচে, অশথগাছটাব নীচে, তারপর
ওরা সব চলে গেলো, অন্ধকার হয়ে এলো, আমি
ফিরে আসবার পথে কান্না এক, কী ভীষণ ভয়।
মা জানো, এখনি যেতে ইচ্ছে হয় দুরন্ত বাহিরে—
আমি যে একটি গাছ এঁকেছিলুম, একটি আকাশ
মাঠে বড়-বড় গাছ আকাশের নীচে
আমার ছবিটা মা যে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠবে।

তৃতীয় বিশ্বের এক দুঃখিনী বিধবা মা

ফণিভূষণ আচার্য

ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে দুঃখিনী দুপুর ডাকছে :
আয়   জল খেয়ে যা
একটি অতি প্রাকৃত দৃশ্য দিগন্ত-গড়ানে খড়িওঠা রোদ্দুরে
হাতপা ছড়িয়ে পড়ে আছে হাহা তৃষ্ণা   তার শিয়রে
হুশহাশ ছুটে চলেছে ভুরুপাকানো ধুলোপা জাতীয় সড়ক
পশ্চিমের হাঁসচরা নদীতে পা ধুয়ে আমাদের বাড়ি এসে
ঋদ্ধিবান ডলার অতিথি
খড়োচালের ছাওয়া আর তালাপাতার বাতাস
তোমার জন্যে তোলা আছে   পভার্টি লাইন ডিঙিয়ে
তুমি আমাদের বাড়ি এসো

আকাশের কোন রং নেই   তবু পৃথিবীতে কোথা থেকে এত রং আসে
কোথায় যে যায়   যে গ্রাম্য পুরোহিতের দুটো হাতই নুলো
আমি ভেবে পাইনা সে নদীতে দাঁড়িয়ে তর্পণ করে কী করে
শুধু কান্না দিয়ে কী করেই বা ভালোবাসাকে আঁকতে হয়
কোন রং দিয়ে এ-পর্যন্ত কেউ কি জেনেছে

মাঠ খুঁড়িয়ে চলে রোদ্দুর মাড়িয়ে একলা মাঠে   খরদিনের রাগী হাওয়া
আড়মোড়া ভেঙে ধমকে ওঠে আলের ওধারে : এত পাখি পড়ানো সত্ত্বেও
আলোর হাটে রং চিনতে আজও শিখলি না হতচ্ছাড়া
তোর বুকের ভেতরে সাঁকো গেড়েছে যে গ্রাম্য ইঞ্জিনিয়ার
ওর রং কার বাগান থেকে চুরি করা   নাকি কোন নিষিদ্ধ প্রেমের
দীর্ঘশ্বাসই তার ঘর ঠিকানা

পভার্টি লাইনের ধারে ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে
সমস্ত তৃষ্ণার্ত পৃথিবীকে
ডাকছে তৃতীয় বিশ্বের এক দুঃখিনী বিধবা মা
নতুন ঠিকানায় যার তিন ছেলে গেছে রোদ্দুরের সড়ক বানাতে
আগামী শতকের বাণিজ্যের নতুন সড়ক   ফেরেনি
দুপুরের খরাপোড়া গলায় ডাকছে :
ওরে আয়   জল খেয়ে যা

বিচিত্র গাড়ল

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সবাই ন'টার মধ্যে বাড়ি ফেরে, তোর এত কিসের ব্যস্ততা
বারোটা পর্যন্ত তুই থাকিস কোথায়?
কারা তোর বন্ধু, তারা কী করে, তাদের কোনো গৃহস্থালি নেই?
বত্রিশ বছর অব্দি বাউণ্ডুলে হয়ে রইলি, চেয়ে দেখ্ সব ভদ্রলোক
কেমন সংসার করছে চমৎকার, শুধু তুই অন্য সব যুবকের মতন
হলি না!

আমাকে অন্তত তোর মনের কথাটা খুলে বল্।

গাড়লের মত চুপ করে থাকো, একটু হাসো, এ-প্রশ্নের উত্তর
কে দেবে,

মায়ের চোখের সামনে মিথ্যা বলা পাপ,
কেন স্বাভাবিক নও, কেন এক সাধারণ রমণীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছো
ভাবতে ঘৃণা করে,
কেন অকারণ লেখো, দুমাস না লিখলে কেন গায়ে ফোস্কা হয়,
কেন যে একেকদিন শিখরের থেকে নেমে দিশি মদ বেশ্যার থাপ্পড়
খেয়ে প্রীত হও, কেন দুঃখ নিয়ে খেলো তা জানি না।

লণ্ঠন বাড়িয়ে ওরা ভদ্রলোক হতে ডাকছে, মায়ের উদ্বেগ বলছে
অন্য সব যুবকের মতন হবি না?
তুমি চোর হয়ে শোনো, অন্ধকার গলিতে সট্‌কাও
লোকভর্তি ট্রাম ছেড়ে।

আজীবন পাথর-প্রতিমা

কবিতা সিংহ

মা, হাতের উল্টোপিঠে মুছে নিয়েছি শেষবারের মতো
দু'চোখ ছাপিয়ে নামা, চোখের জলের বৃথা দাগ
বেণীর সাটিন খুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেছি আমি
অশ্বক্ষুরে ঝন্‌ঝন্‌ নারীদের দর্পণ ফাটায়ে
খরকরবালে একা পিতার রক্ষিতার মুণ্ড এনে দিতে!

তাই ঘৃণা, দুই চোখ কাজল জানেনি
নারীর শৃঙ্গার ছলা দর্পণের পায়ে পায়ে ক্লিন্ন অধীনতা
কার জন্য এত সাজ? বক্ষ বাঁধা? নীবি?
সমস্ত পুরুষ সেই আদি পিতা, নিষ্ঠুর অশুচি
তোমার স্তনের থেকে ছিন্ন করে ভুবন ঘোরাবে!

মা, আমি কি তেমন হব? রক্ষিতামন্যস্ফীত স্তনিত শঙ্খিনী?
মেডেলে পদকে স্বর্ণে ব্যর্থ বিজয়িনী?
শয্যায় পুরুষ হত্যা, পিতৃহত্যা শুদ্ধ নয় মাতা
রণক্ষেত্রে দেখা হবে সম্মুখ সমরে তীব্র ইস্পাতের অচিত্র-অঙ্গদে।
আমি তো শিখিনি মাতা রমণীয় পশ্চাদপসরণ।

মা, হাতের উল্টোপিঠে মুছে নিয়েছি শেষবারের মতো
ঠোঁটের কোনার থেকে তোমার দুধের খাঁটি স্বাদ
সেই থেকে সব এত জোলো মনে হলো।
সব দৃশ্য সব প্রেম সব দুঃখ সমস্ত বিচ্ছেদ
উদ্ধত অশ্বের ক্ষুরে খান্‌ খান্‌ করুণ অস্থায়ী
আমি শুধু ছুটে যাই, ছিলাটান, এক অক্টেভ থেকে
অক্টেভ অন্তরে স্থায়ী রাগে
আর ক্রুদ্ধ প্রতিশোধী, গ্রীবা ফেরালেই পাই ওই মুখ
গরীয়সী যেন স্বর্গাদপি।
হে আমার আদিপিতা, হে আমার আদিম প্রেমিক
তোমার বিচ্ছেদ দষ্ট যেন কালসর্পদষ্ট দয়িতার ওই মুখ
কোনোদিন তুমি দেখলে না।

এসো মা, তোমায় দেখি, আমি তোর ব্রাত্যকন্যা
আজীবন পাথর-প্রতিমা।

বলো তারে, 'শান্তি শান্তি'

শঙ্খ ঘোষ

১

মাগো আমার মা—
তুমি আমার দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

এই যে ভালো ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ারহারা পথ,
এই যে স্নেহের সুরে-আলোয় বাতাস আমায় ঘর দিল রে দিল—
আকাশ দুটি কাঁকন বাঁধে, বলে, আমার সন্ধ্যা আমার ভোর
সোনায় বাঁধা—ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যু-মনোরথ।
সেই কথা এই গাছ বলেছে, সেই কথা এই জলের বুকে ছিল,
সেই কথা এই তৃণের ঠোঁটে—ভুলে যা তুই, দুঃখরে ভোল তোর,
ধুলোতে তুই লগ্ন হলে আনন্দে এই শূন্য খোলে জট!

তুমি, আমার মা—
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, দুঃখ তোমার পল্লবে কি গাথা?
তুমি আমার চক্ষু ছেড়ে কোথাও যেয়ো না!

২

আকাশ বলে বাতাস বলে ব্যথা।
ব্যথার তুলি পলাশলাল মেঘে।
ভাঙলে তুমি প্রেমের নীরবতা
দুঃখ আমার টলবে বুকে লেগে।

দুঃখ আমার বুকের টলোমলো
জলের বুকে সন্ধ্যা দিল এঁকে—
ব্যথায় লেগে বন-বনানী হল
আমার মতো, আমার মতো কে কে?

আমার মতো বাতাস জানে ডানা,
আমার মতো সূর্য জানে ফুল,
তোমার চোখে নিদ্রা হল টানা
মরণমুখী সূর্য আর জাগনলোভী চাঁদে
আকাশ পরে স্নিগ্ধ দুটি দুল!

৩

মাগো, আমার মা—
তুমি আমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

মৃত্যু তোমায় ভয় পেয়েছে, রাত্রি এল অস্তদীঘির পার,
যেখানে এই চোখ মেলেছ সেইখানে কার শাস্তি কেঁদে মরে?
নিশুতি রাত ঝুমঝুমিয়ে আর্তনাদের বর্শা এল ছুটে—
যেখানে যাও সেখানে নেই শান্তি তোমার সেখানে নেই আর!
দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগরে-বন্দরে
যেখানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ করপুটে—
আকাশ-ভাঙা বন-বনানী শাস্তি বাঁধে শাস্তি বাঁধে কার!

তুমি, আমার মা—
শাস্তি তোমার ঘট ভরেছে, রক্তে ঘটের সিঁদুর হবে টানা,
তুমি আমার ঘর ছেড়ে মা কোথাও যেয়ো না।

৪

বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন?
নীলদুয়ারে ঘা দিল ভাই মেঘের সেনাগুলো!
বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন?
ভয়ের দুয়ার-বন্ধ ঘর কাঁপছে জড়োসড়ো—
বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে বড়ো!

মাগো, আমার মা—
ঝড় নেমেছে দুয়ারে তার ঝঞ্ঝা লাগো-লাগো
তুমি আমার বাজনা শুনে শঙ্কা মেনো না।
বাজনা বাজুক, ভয় পেয়ো না, বাজনা বাজুক মা।

সে

তরুণ সান্যাল

সে বীর, অথচ নোনা জলধারা ছুঁয়েছিল ঠোঁট,
তাতে সে অবাকই, তারও দেহে ঘুমাতো এমনি সৈন্ধব?
সে তবে কড়াই নানা রসায়নে স্বয়ং প্রকৃতি
বা ঈশ্বর বানাচ্ছেন আদিম প্রাণের উৎস ক্বাথ!
তবে তার হাড়ে-হাড়ে সিঁড়ি গাঁথা পা থেকে মাথায়
পাথরে পাথর সেই শ্যাওলায় বসেছে তারই দেবী,
সে যতই মুক্তি চায়, সুষুম্নার টান তাকে ফেরায়
দেবীর পায়ের কাছে বন্দি সে একাই পড়ে থাকে।
নাকি সে ঘুমন্ত ছবি, সমুদ্রেরই-বা দামাল ঢেউ
পাথরে পাথরে বালুবেলাভূমে যা শুধু আছাড়ই।
সে গাইসার, জানে হয়তো গিরিশিরা বা ত্বক ফাটলে
প্রাণাধিক কেউ, কিছু গোপন রয়েছে ঢের দিন,
সে কী স্যমন্তক, সীতা না হেলেন, যার জন্যে তার
ভারী বল্লমের দাঁতে রক্ত চাখতে ইচ্ছা হয়েছিল!
কখনও বন্দির কাছে সবুজ প্রান্তরে ধানখেতে
নীল আকাশের সেই অগাধ শরৎ এসেছিল,
কিন্তু সে অস্নাত, তীব্র জ্বরে সে বেহুঁশ, ভারী মাথা
নিয়ে গিয়েছে তাকে সেই পাহাড়তলির দেশে একা,
যেন বা নিশির ডাকে দেখেছিল, হয়তো দেখেছিল,
রাঙা ধুলোয় পা ডুবিয়ে বাঙলা ঢঙে শাড়ি পরা বৌ
ঝর্না থেকে জল ভরেছে, কুমোর ঘুরোচ্ছে চাকা, আর
মৌমাছির গুঞ্জনে মানুষ যেন বানাচ্ছে মানুষ,
আ জননী দ্বার খোলো দ্বার খোলো

দরজা খুলে গেলে
বড় স্নেহময়ী মৃত্যু দেবী হয়ে কোলে নেবেন তাকে,
তখন সে ব্রজের গোপাল, কিংবা ন্যাজারিন যিশু
রাজা যার জন্যে গড়েছেন চিঠি পাবার ডাকঘর।

দূর থেকে মায়ের চোখ

শংকর চট্টোপাধ্যায়

'আঁধার, বড়ো আঁধার' ঘুম পাড়ানি গানের গলায় মা বলতেন
চমৎকার টাল খাচ্ছে যখন আলো
জানলার পাশ থেকে সরে যাচ্ছে শিয়ালের চোখ
অবশ্য এর জন্য শিল্পই দায়ী
মহান এক অতিথি এসেছিলেন মার আত্মায়
তখন
'বাটির জলে চোখ রাখলে চোখের জল বাটি ভরত?'
আমার মত, সরল চোখে সব দিকে তাকিয়ে
মা কী তখন আমার বুক ফাটানো ইচ্ছে দেখতে পেতেন?
অবশ্য এর জন্য শিল্পই দায়ী
মহান এক অতিথি এসেছিলেন মার আত্মায়
আমার আলো জ্বলা জানলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে
তাকে বলতে শুনতাম, 'আঁধার, বড়ো আঁধার হে?'

জরাসন্ধ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হলো পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমায় অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হলো, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র সরে যাবে শীতল সরে যাবে মৃত্যু সরে যাবে।

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

আমার হারানো মাকে

পূর্ণেন্দু পত্রী

পাল্‌কি, যাও, হারানো আমার মাকে খুঁজে নিয়ে এসো।
অস্পৃশ্যের মতো এক পীড়নের দিনে চাই রাজবধূরূপে মাকে পেতে।
মাকে পেলে দুই গালে হাজার হাজার চুমু পাব
বৃষ্টি নামবে ফাটা ঠোঁটে, গজাবে নতুন পাতা কঙ্কালের হাড়ে
মা আমাকে ফিরে দেবে কেয়া-খয়েরের গন্ধে মাখামাখি ঘোর বাল্যকাল,
কী অসুখে কী রকম জলপটি সবই মার জানা।
যদি বলি, মাগো আমি হতে চাই এক বুক শস্যের সাগর
মা তাঁর আচল থেকে সুনির্দিষ্ট চাবি তুলে দেবে তৎক্ষণাৎ।
পাল্‌কি, যাও, উপড়ে আনো তৃণমূল থেকে মাতৃক্রোড়।

শ্রীচরণেষু মা-কে

আনন্দ বাগচী

মা, তোমাকে বারেবারে মনে পড়ছে আজ।
আজও যেন রয়ে গেছি প্রথম কৈশোরে
হুহু করা বুকের ভেতর
চিলেকোঠা চমকে·দিয়ে যায়।
এখনও রয়েছি সেই প্রথম কৈশোরে
নীলমাছি
অন্ধ ডুমো শব্দ যেন বার্লির গেলাস ছুঁয়ে যায়,
জ্বরের আবছা গন্ধ
লেগে আছে শয্যায়, বালিশে
মা, তোমার মৃদু স্নিগ্ধ শাঁখাপরা হাত
আমার কপাল ছুঁয়ে থাকে,
অভুক্ত গল্পের বই পথ্যের মতন।

ছায়ায় ছায়ায়

শ্যামসুন্দর দে

দুপুরের দাবদাহের শেষের বেলা
সন্ধ্যা আঁচল বিছায়
সারাদিন বিহঙ্গের আকাশ-বিহার
তারপর ফেরে তার ভালোবাসা-নীড়ে।

ধানকাটা ধুধু মাঠে বর্ষণ শেষের
যখন সবুজ চারা মাথা তোলে
মাটির ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে
জীবন ইশারা জানায় নিসর্গে

পাতার আড়াল ভেঙে ফুল চোখ মেলে
সূর্যের আলোর দিকে প্রাণের ঘোষণা
সবখানেই একটি মুখের ছায়া
প্রশান্ত গভীরে মূক মায়ের ভালোবাসায়।

আজকে আবারও মা-র চশমাটাকে খুঁজে পাওয়া গেল

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আমার মায়ের চশমা আদিগন্ত পরিসর জুড়ে
কোথাও বিকীর্ণ থাকে, তিনি খুঁজে পান না কোনোদিনও,
আমরা চৌদিকে ছুটি, পরিশেষে পুনরুদ্ধারের
দেহরক্ষী হয়ে ফিরি, সাম্রাজ্যবাদের অতিশায়ী
দখল পেয়েছি যেন এরকম কৃতিত্বে শ্রীমান্
হয়গ্রীব, আমাদের চোখেমুখে ঈথারের আভা
কীর্ণ হতে-হতে যেই পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ি
কোথাও কিছুই হয়নি এমন ধরনে—চেয়ে দেখি —
মা তাঁর পুনরর্জিত চশমা নিয়ে কালীঘাটের পটে
বসে তাঁর বেড়ালটাকে পরাযত্নে দুধ খাওয়াচ্ছেন,

অবিকল দিব্য শিশু, এইমাত্র আমাদের প্রসব করেই মগ্ন যেন

মা আমার

কবিরুল ইসলাম

মা, তুমি খাওয়াবে আজ?
কী খাওয়াবে, বলো।

তোমার মুখের পানে চেয়ে-থাকা ছাড়া
আর কোন্ সুখাদ্য আছে সন্তানের কাছে

একাক্ষরী মা আমার,
আমি রোজ খাই॥

এখন ভারতবর্ষ

রবীন সুর

নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছো ভারতবর্ষের চেনা ম্যাপ।
ধমনীর মধ্যে নদী, ঘুম নেই। আপাদমস্তক
মা আমার লক্ষ্মী মা গো! ভিজে চুল, নখের ঝিনুকে
মধ্যাহ্ন রোদের হিরে; অরণ্যের বুনো গন্ধ হাওয়া
সভ্যতার মেকি মুখে নুড়ো জ্বেলে বলে : আয় আয়!

আবার মোহানা থেকে ফিরে যাবো উৎসের গোমুখে
কঠিন পাথরস্তব্ধ নৈবেদ্যের চূড়ার শিখরে
পিপাসার ঠোঁট রেখে হতে হবে নতুন নির্ঝর।

বাতাসে কলুষ বড়। দূষণ বিষের জলস্রোত
কালীদহ কীর্তির গরল, টুপটাপ ঝরে পড়ে
মৃত পাখি,
কর্কশ শব্দের একটানা অত্যাচার—
যখন যেদিকে যাই বন্দনার বিকল্পে বন্দনা;
পিতৃপিতামহদের বীর্যবাহী ব্যাপ্ত পরাক্রম
আত্মঘাতে রক্তমাখা, পুড়ে যাচ্ছে জাটিঙ্গা আগুনে
সমস্ত ইচ্ছার ডানা—লিবিডোদমিত হাহাকার;
বেনে শুধু মুদ্রা চেনে সস্তা শ্রম, কাঁচামাল ঘেঁটে।

হায় মেঘ ঠাণ্ডা হাওয়া জলজ্যান্ত রোদের শৈশব—
গাছ নেই, শুকনো নদী, তেজস্ক্রিয় ভস্মের জঞ্জাল;
শিশুর নিশ্চিতি নিয়ে বয়স্কের কোন অনুভব
হামা টেনে দুধগন্ধ স্তনচূড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো?

মুকুরে প্রতিফলিত

বিনয় মজুমদার

মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে।
শিক্ষায়তনের কাছে হে নিশ্চল, স্নিগ্ধ দেবদারু
জিহ্বার উপরে দ্রব লবণের মতো কণা কণা
কী ছড়ায়, কে ছড়ায়; শোনো, কী অস্ফুট স্বর, শোনো
'কোথায়, কোথায় তুমি, কোথায় তোমার ডানা, শ্বেত পক্ষিমাতা
এই যে এখানে জন্ম, একি জনশ্রুত নীড় না মৃত্তিকা?
নীড় না মৃত্তিকা পূর্ণ এ অস্বচ্ছ মৃত্যুময় হিমে...
তুমি বৃক্ষ, জ্ঞানহীন, মরণের ক্লিষ্ট সমাচার
জানো না, এখন তবে স্বর শোনো, অবহিত হও।

সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কত বেশি বিপদসঙ্কুল
তারো বেশি বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ,
এ সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে বলে।
তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু,
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।

'কেন চেয়ে আছ গো মা...

বিজয়কুমার দত্ত

তোমার, ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, কত
জানা ও অজানা, কাহিনীর কথা
মনে আসে, সেই কিশোরবেলায়
ঘুম ভাঙা ভোরের ব্যস্ততা, উঠোনে দালানে
রান্নাঘরের পাশে, মাটির উনোন,
স্টোভ, থালা ও বাসন--প্রতিদিন
একই চালচিত্রে। জীবন কেমন
রুক্ষতায়, কী অবহেলায়। অবমাননায়
তোমাকেই সাজাতে চেয়েছে।

সেদিন বুঝিনি। আজ স্মৃতির অভ্রের পাত—
বর্ষণের আঁধার দুপুরে—একে একে
খুলে যায়, জানা যায়, শেখা হয়
কাকে বলে বঞ্চনার মঞ্চসজ্জা,
পাদপ্রদীপের আলো, অভ্যস্ত সংলাপে
জীবনের কী ভীষণ অপচয়,

চারপাশের মানুষজন, যেন সব শ্মশান-বান্ধব
সংসার-সমাজ-অন্ধ সংস্কার, নিহিত বিশ্বাস—
আদিম আঁধারে সবই ভাসমান, পৃথিবীর গ্রামীণ আকাশে
কোথাও কি নক্ষত্র বিন্দুর কোনো আলো ছিল জেগে?

তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
দু'চোখে অশ্রুর বিন্দু রক্ত হয়,
ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে ওঠে, দিবস-রজনী,
ছবির ফ্রেমের থেকে তোমার অতীত দেখি ছুটে আসে যায়---
এই অন্ধ অবিশ্বাসী দষ্টির পর্দায়

অন্তর্ঘাত

শিবশম্ভু পাল

তুমি বিধানের মধ্যে বিধান, তন্ত্রের মধ্যে তন্ত্র
প্রহরীর মধ্যে প্রহরী এবং আগুনের মধ্যে আগুন, এবং এভাবেই
দোলাতে থাকো সমর্থনের নিশান, কালীতলা, সন্ধ্যাশঙ্খে
করজোড়, টেস্টপেপার সল্‌ভ—এমনি করে দিনে দিন,
রাতে রাত, দুপুরে দুপুর, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে
প্রতিবন্ধী ভিখিরিকে পয়সা দাও, মায়ের সঙ্গে দেখে থাকো
বাংলা ছবি, চাও নিরাপত্তাপ্রধান বিবাহের সবর্ণমসৃণ অনুষ্টুপ
এভাবেই মুখ থেকে আতঙ্কবাদীর দাগ নির্ভুল মুছে দাও, যদিও
অব্যর্থ গ্রেনেড, ফিউজ তোমার ভুরুর নীচে, হেয়ারবেলট-এ, চুর্নির শিফনে
দুর্জ্ঞেয় আত্মার মতো থরেথরে সাজানো রয়েছে—
তারপর একদিন সন্দেহবিহীন বাঘা নজরদারের ঠিক নাকের ডগায়
এক নির্ভরযোগ্য সর্ষেমুঠি গুনিন, আমি, প্রহরীরই দেশভাই,
তোমায় লিখতে দিলুম বিদঘুটে 'মসীজীবী' বানান, আর
অনুগত সুশীলা তুমি লিখতে গিয়ে ফিউজ তারের চিড়িক-চিড়িক
ফুলকির মতো হেসে উঠলে মাথানিচু করে, এগিয়ে দিলে গোবেচারি
নোটবুক, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্ট : 'সোমবার আড়াইটেয়
ট্রামডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে থেকো—' সর্ষের অন্তর্ঘাতী ভূত
কবে ফসকে পড়ে গেল, পাশওয়ার্ড শুনে নিলে, ব্রিজ ছিটকে যায়—

জনম দুখিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যতদিন ছিলে তুমি পরাধীনা
ততদিন ছিলে তুমি সবার জননী
এখন তোমাকে আর মা বলে ডাকে না কেউ
আঁকে না তোমার কোনো ছবি
বুক মোচড়ানো সুরে সেই সব গান
অন্ধকার কুঠরিতে মোমের আলোয় কত দুরন্ত শপথ!
জনম দুখিনী মা, কোনো দিন স্বাধীন হলে না
এখন তোমাকে আর মা বলে ডাকে না কেউ
লেখে না তোমার নামে পাগল পাগল করা
রক্তের কবিতা
কেউ কারো ভাই নয়, রক্তের আত্মীয় নয়
নদীর এপার দিয়ে নদীর ওপার দিয়ে
চলে যায় বিষণ্ণ মানুষ।

মাতৃ-ছবি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

মা তোমার প্রিয় ছবি আমি তো পারতপক্ষে
দেওয়ালেতে টাঙাতে চাই না, সময়ের ধুলো যদি পড়ে
প্রেমে যদি উইপোকা ধরে রোজ ঝাড়ি রোজ মুছি
ব্যস্ততায় যদি সেটুকুও নিভৃতি পাই না
অবিরাম এই ছুটোছুটি তোমার জন্মদিন
তোমার মৃত্যুদিন দুটি—মনে রাখা মালা আর
চন্দনের টিপ এবং ঘোষণা করা আজকেই
অমুক তারিখ তারপর সারাটা বছর ধরে
ফোঁটাটা বিবর্ণ হয় ফুলও শুকিয়ে গুটিসুটি
তারচেয়ে নাই যদি দেখলাম এ সব আবেগ
জন্মের মুহূর্ত থেকে যে-ছবির হৃদয়ের প্রেমে
হল অভিষেক শিরা উপশিরা জুড়ে
লাল রক্তে নীল রক্তে ঘুরে কণিকায় কণিকায়
যে-সিলমোহর তোমার মুখের চলে ফেরে
ঘোরে নিরন্তর অদৃশ্য প্রমপ্টি। জন্ম থেকে
শেষাবধি মৃত্যুর ডোর ছুঁয়ে যাওয়া দৌড়ের
যেখানে চিরটা কাল আমি এক অবোধ-বালিকা
মনের জলের ঢেউ না জানুক তলার গভীরে
দীর্ঘিকা জানে সেইখানে তোমার মুখের ছায়া
বিচিত্র ভঙ্গিতে ভেঙে ভেঙে আরও বড়
আরও দীর্ঘ হয় কখনো এ জাগরিত ঘুম ভাঙে
অবাক বিস্ময় যারা সত্তাময় ছড়ানো ছেটানো
তাতে আমি দৃষ্টির উচ্ছিষ্ট করে কারো
স্বেচ্ছায় অস্বেচ্ছায় মালা দিই টিপ দিই
বাইরের যে-স্বীকৃতি নাই যদি দিই কখনোই
কয়েকটা সীমায় বাঁধা তারিখে তারিখে
তার যে উজ্জ্বল রঙ ছায়া পড়ে হয় না যা ফিকে
তাকে আমি কোনোদিনই ভুলে তো যাই না
তাই আমি মা তোমার প্রিয় ছবি দেওয়ালে
পারতপক্ষে আজকাল টাঙাতে চাই না

তরমুজের মধ্যে মা

রঞ্জিত সিংহ

যতদিন জল আছে, স্নানটা বন্ধ দিও না, গঙ্গামণি।
জল আজ আছে, কাল নেই,
সবই পদ্মপাতায় :
বলেই তাকিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই।
গঙ্গামণি কবেই তো স্নান সেরে চলে গেছে!
গঙ্গামণি কি আমার মা?
তবে মা কেন বসে আছে আটফালা তরমুজের মধ্যিখানে?
কী যে ঠাণ্ডা, স্নান করো, তেষ্টা মেটাও, যত ইচ্ছে, যতক্ষণ...

মাটিতে বসানো তরমুজ ভাঁজ খুলছে, খুলছে...
হঠাৎ একটা লাল ঠাণ্ডা কী মস্ত মা
আকাশকেও শীতলপাটি করে দিল!

শহিদবেদি

সরল দে

এ কেমন শহিদবেদি
ফেরার স্মৃতিরা যখন ফিরে আসে
ছায়াতলায় ফুল ছড়াতে
রক্তে ভেসে যায় বেদিমূল

পৃথিবীর মায়েরা, আমারও মা
তিলে তিলে শহিদের মৃত্যুবরণ করে
সন্তানের জন্য রেখে যায়
শেকড়-বাকড়ের টান

ভালবাসাভুক মানুষের তখন
খিদে বাড়ে, বাড়তেই থাকে
আর
বেদিচত্বরে ফুল ছড়ালেই টের পায়
পৃথিবীতে ভালবাসা ছাড়া
সবকিছুতেই ভেজাল...

এই গৃহে তার

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

এই গৃহে তার মুখাবয়ব আর দেখি না
কোথায় গৃহী মুখ ঢেকেছে
অশ্বত্থ বন এই দালানে নষ্ট কানন মুখ রেখেছে।
আজ কি গৃহী পর্যটনে অনেক দূরে?
যাবার আগে দুঃখ কোরক ছড়িয়ে গেল
              দেউড়ি থেকে অন্তঃপুরে

উঠোন জুড়ে মেলামেশার নিষ্ফলা গাছ পাতাবাহার
কোথায় গৃহী?
      বিষের বৃক্ষ খিলান ভাঙছে চিলকুঠুরি আগল দুয়ার---
ভাঙলে গৃহী গৃহও ভাঙে সমগ্র কি যায় গুঁড়িয়ে
কেউ কি গেল এ ঘর ছেড়ে মুখ পুড়িয়ে
মুখাবয়ব রাখল কোথায় আজ সে স্বেচ্ছা নির্বাসনে?

ভিত ভেঙে যার দুঃখ ওঠে বৃক্ষ হয়ে
              দুঃখ যে তার খুব গোপনে

কাছাকাছি থেকো

মতি মুখোপাধ্যায়

কাছাকাছি থেকো তুমি খুব দূরে কোথাও যেয়ো না
ছিন্নমূল ঘুড়ি ওড়ে দমকা বাতাসে
মনে পড়ে মার কথা, বলি
আমি তো চাইনি যেতে চেনা জল চেনা রোদ ছেড়ে
কুয়াশার অদেখা শহরে
গাছের একটি পাতা, খুব চেনা পাতা
খসে যেতে দুঃখ পাই আজো
পাতাটা কুড়িয়ে এনে নতস্বরে বলি
মার কথা কেন শুনলে না
সদর দরোজা খুলে নিঝুম দুপুরে কেন তুমি
ফেরিঅলা বাতাসের ডাকে ছুটে গেলে।

এইসব বলি তবু বেড়ে যায় আমার বিরহ
বেতসলতার মতো জন্ম থেকে যতদূরে যাই
ক্রমশ বিচ্ছেদ বাড়ে
দূরত্ব বিস্তৃত হয় কৈশোরের ঝাউবন, যৌবনের
গুহামুখ থেকে
মেঘ ছায়া কান্না চোখে ভালোবাসা যায়
পড়ন্ত রোদ যেন কার্নিসে কবুতর আমার সময়
তবু যাই, যেতে হয় স্মৃতির খোলস পথে ফেলে
ব্যস্ত হারবার, জাহাজ ছাড়বে এইবার
লাল পাড় শাড়ি সাদা ইতঃস্তত উদ্বেগে হলুদ
রেমব্রান্ডের ছবি
প্রথম রমণী তুমি, তালপাখা খসে পড়া নির্ঘুম দুপুর
ঘুমচোখে যেন বলেছিলে
দিনকাল ভালো নয়, কাছাকাছি থেকো
খুব দূরের কোথাও যেয়ো না।

মা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

জন্মকে এখন আমি শব্দ দিয়ে ভাঙি। মানুষের
এক চোখ থেকে উপড়ে তুলে নিই নীল—ফের
অন্য চোখে নিসর্গ ফিরিয়ে দিই; যে আমাকে
মৃত্যুর তুলনা নিতে ডাকে
তাকে বলি চন্দনযাত্রায় থাকে না ছন্দের সাধাসাধি।
এখন যাকেই আমি আলিঙ্গনে বাঁধি
সে-ই চলে যায় দূরে
ফোটো হয়ে আসে ফিরে
সংসারী দেয়ালে, করে জন্মান্ধ স্মৃতির সঙ্গে কথোপকথন,
আমার প্রথম সুখ, আমরণ
আমার প্রধান ধর্ম—সে আমার মা, রোজ রাতে
নক্ষত্রের প্রাচীন সভাতে
একলা চাঁদ বাতি হয়ে ওঠে যার হাতে
সেই তিনি খোঁজেন আমাকে,
আমি বড় অকারণ হারিয়ে যাই, নিশিডাকে
সাড়া দিতে চলে যাই নষ্ট পথে কষ্টের তাণ্ডবে। যতবার
শ্মশানে এক পা রাখি, ততবার
অমোঘ পশ্চাৎ-টানে
কে যেন ফিরিয়ে আনে
সে-আমার স্বেচ্ছা শব্দ ''মা''। তিনিই প্রত্যেক রাতে
নিঃশ্বাস ফিরিয়ে দেন, তখন যে হাতে
লিখি, তা মৃত্যু-অধ্যয়ন থেকে শেখা
জন্মের নতুন লেখা
আমার স্বাক্ষর সে তো সাক্ষীর সামান্য সই
আসলে তা লেখে না-ই!
মা ছাড়া আমার
এক চোখ থেকে নীল কেড়ে তৎক্ষণাৎ আবার
অন্য চোখে ফেরানো সম্ভব হতো না নিসর্গ,
শব্দই আমার মা, আমার অন্তিম সম্বল স্বর্গ।

মা

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

মা আমায় ডেকে নে কোথাও।
চুপচাপ শুয়ে থাকব তোর দুই হাঁটু জাপটে একা
যে রকম শুকনো আঁশ রোদ্দুরে শুকোয়।

ছত্রখান করে আমি পুড়িয়েছি আমাকে ও তোকে
বান্ধবীর ঘ্রাণে ছিল যৌন-সুখ... সে তখন মাদার টেরিজা
যন্ত্রণায় মরে গেলে
নিয়ে যেত আড়ালে... অতলে...

মদে চুর দিবসরজনী—শেষ রাতে ভেঙে যাচ্ছে ঘুম
মাতালের তৃষ্ণা যেন নাই-কুণ্ড ছিঁড়ে ফেলছে নখে
এ-সময় তুই আমায় দোলনা দিয়ে বাঁচা
হলুদ মাখন দে
মরা দুই ঠোঁটের ফাটায়।

কৃষ্ণরূপ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমি কালো রোগা হাবা ছেলে,
মা বলেন—'ও তো কৃষ্ণরূপ'.
মন্দকে নিজের গুণে ভালো
দেখা তাঁর পুরোনো অভ্যাস।

সেই অভ্যাসের ঢালে লেগে
ফিরে যায় চাতুর্য আমার,
তাই আমি এত বোকা হাবা
মায়ের দরজায় বসে থাকি।
দাঁড়ের ছিকলি খুলে দিয়ে
তিনি দেন আদা ছোলা জল,

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ডাক পেয়ে ধীরে
ছেঁটে দেন পালক আমার।
তাঁর হাতে ছটফট করে
আমার পশম-ওঠা বুক
কয়েদখানায় বাঁধা থাকি
হাসি-খুশি আমার মায়ের।

ভিতরে ভিতরে যত পুড়ি
পচে গলে নষ্ট হয়ে যাই,
মা বলেন 'ও তো কৃষ্ণরূপ'
ছড়ানো ছেটান শান্তিজল,
মন্দকে নিজের গুণে ভাল
দেখা তাঁর পুরনো অভ্যাস।

উৎসর্গ

তারাপদ রায়

সমুদ্র শঙ্খের চুড়ি, রাগরক্ত সিঁথির মহিমা,
আদিগন্ত স্মৃতিভার সঞ্চারিতা নীলাঞ্জনা তৃণা,
অক্ষম পটুয়া আমি, আমি ব্যর্থ, সাজাতে পারি না
স্মরণশোভন রূপে, হে মৃণ্ময়ী, তোমার প্রতিমা।

পথ

বিনোদ বেরা

'ডানদিকের লোভ কিংবা বাঁদিকের মোহ
যেন না মজায়—সোজা যাবে।
দুরন্ত দাপটে বইছে শহরনগর ভেঙে নদী—
ঝাঁপ দাও, স্রোতের বিরুদ্ধে লড়ে
যদি জেত, পেয়ে যাবে হারানো স্বদেশ।
কেবল আবেগ নয়, যুক্তি বুদ্ধি শুভবোধ যেন সঙ্গী থাকে।
শুভেচ্ছা জানিয়ে জন্মদুখিনী মা বিদায় দিলেন।
হাঁটতে থাকি, মানুষের সঙ্গে দেখা হয়
তারা কেউ কথা বলে কেউ বা বলে না।

যেতে যেতে কত কিছু বদলে যায়, চেনারা অচেনা—
ক্ষমতার ঈর্ষাবিষে আকাশে আগুন জ্বলে
ঘোর লৌহবর্ণমেঘে বিনাশী প্রতিভা।
বিবেচক হয়ে উঠতে গিয়ে গতি
ঋজুতা হারায়, পথ বেঁকে যায়,
পথ বন পাহাড়ের জটিল গহনে ঢোকে—
যুক্তিহীন গাঢ় আকর্ষক
নদী নয় নদীর উৎসের
সন্ধান পাওয়ার তৃষ্ণা জেদি হয়ে ওঠে।

অপার শূন্যতা ছেড়ে গহনে হারাতে চেয়ে
গহনতা পাশে রেখে পথ
দুর্গম শিখর ছুঁয়ে আরো দুরূহের দিকে
বেঁকে যায়, বেঁকে বেঁকে যায়—
পথে আর এখন কোথাও আছে শুভ!
দিগন্ত কিনারে পৌঁছে কি দেখবো! কিছু দেখবো কি!
পথ নেই রাস্তা নেই অবস্থার মুহূর্তেও
বিষাদ কি গান গেয়ে আনন্দ জানিয়ে উড়বে!
গৌতম বুদ্ধের হাঁস অর্থহীন হিংসার শিকার,
হঠাৎ বুলেটবিদ্ধ—বেদনায় করুণায়
আকাশ মন্দ্রিত করে ঝরে পড়ছি
কার বুকে—অগ্নিগর্ভ সংকীর্ণ মাটিতে!

বুড়ির চুল, চিনির ঘড়ি
প্রতিমা রায়

সূর্যটা পপিন্স চিবিয়ে কুলকুচি করে দিলো

মিষ্টি সুগন্ধ আর রঙিন ধোঁয়াগুঁড়ো উড়ন্ত.

দাদাই দুহাত বাড়িয়ে ঐ আলতা বুড়ির চুল খায় আর
একটু একটু দিদাকে দেয়;
চিনির মেঘ ঘড়ি হাতে বেঁধে চেটে-চেটে দেখে
কতদূর যায় মহাবিশ্বের আলোক বর্ষ।

চাটতে চাটতে ফিকে হয়ে আসে ঘড়ি আর উড়ন্ত চুল।

ঘুম পেলে গুটিগুটি সন্ধে আসে;
ঝাপসা হয়ে যায় শিশুচোখের শৈলী।

অন্ধকার আকাশে ছড়িয়ে পড়ে সাদা পপকর্ন

শ্মশান টীকা

উত্তর বসু

ঠোঁটে সেলোটেপ, হাতে হাতকড়া আঁটা
ছেলেটাকে ওরা বসিয়ে রেখেছে টুলে
দরজায় দুই প্রহরী ফাটিয়ে চোখ
স্থির চেয়ে আছে কড়া রাইফেল তুলে।

'এই একটাই জ্যান্ত' সেপাই বলল,
'ডুবে ছিল স্যার জলের ট্যাঙ্কে নেবে।'
ওসি বললেন, 'ভাল করেছিস এনে,
লকাপে ঢোকাস, তাহলেই খোঁজ দেবে।'

থানার বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মা,
ঠক্ ঠক্ করে হাত-পা কাঁপছে ভয়;
এলাকার কেউ আসতে চাইল না,
বধ্যভূমিতে আসা নিরাপদ নয়।

গভীর রাত্রে কালপুরুষের নীচে
কার কালোহাত মসৃণ মতলবে
থানাবাড়িটাকে হানাবাড়ি করেছিল
সিলিঙে ঝুলিয়ে চাবুকের বিপ্লবে।

কালো ভ্যানে চড়ে পুড়িয়ে এসেছি তাকে।
চাবুকের দাগ পোড়েনি। পোড়ে না বলে
আমাদের পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষত;
যন্ত্রণা জ্বলে জননীর খালি কোলে।

এই সেই ছাই। জলঢালা শেষ হলে
চিতা থেকে কেড়ে এনেছি লড়াই করে।
কপাল কেটেছে, লাঠিও পড়েছে পিঠে,
মারের খবর রেখে যাব ঘরে ঘরে।

জলে না ভাসিয়ে যে নাভি পুরেছি মুখে
সে লুকোনো নাভি মাটিতে পুঁতেছি ভোরে
এই বলিদান যৌতুকে ভরে যাবে
যদি একবার সময়ের পাশা ঘোরে।

জলজ্যোৎস্না

সন্তোষ চক্রবর্তী

ওই দূরে নির্জন হাওয়ার গোমুখে
পল্লবিত
কেন আজও কুসুমসাধের চেয়ে
গাঢ় রঙে
গাজনের দিন
ছিন্ন পাতা জুড়ে জুড়ে নৌকো ভাসায়

নরম আঁচলে ওড়ে বনতুলসী
লক্ষ্মীর পা

মনে পড়ে

শিয়রের কাছে, অতি কাছে
জলজ্যোৎস্না সারারাত খেলা করেছিল...
বড় ব্যাপ্ত
নদী বা পাহাড় কারো ব্যক্তিগত নয়

এবং বয়স ভেঙে কোনোদিন
মাতৃক্রোড় ভুলে যাওয়া মিথ্যাভাষণের
চেয়ে আরো
যন্ত্রণাবিধুর।

মা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক কাতে শুয়েছে বঁটি, ঘুমোনো হেঁশেল—মা তখনও
বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলছিলেন....
মেঘ থমথম করছে বাইরেটা, ভেতরদেয়ালে
ঘুণপোকা ডাকছে পড়ে একটানা।
অপথ চষলুম। দাওয়াধারে বসে আছি।
পুরোনো কাসুন, ফটো, ছেঁড়া ভাঙা ছড় আর এস্রাজ
আধপোড়া ছড়িয়ে যায় অসুখ মেঘলাতে।
চিঠি আসল না আজও? পাশ হওয়া হল না?
একটাও হল না? ছাদ, দেয়াল, বাইরে গাছলতা,
আলো, পা-র নীচে মাটি—নারাজ, নারাজ! হাতে ধরে
বিদেয় দিয়েলুম প্রেমিকাকে। দাওয়াধারে বসে আছি।
অন্ধকার সমুদ্র আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে দশ হাতে।

বঁটির আছাড় আলগা হয়ে এল। পাঁচপদ ব্যান্ননে
সর পড়ছে। ছেলের খাটখানা ফাঁকা পড়ে।
রাতজাগা বারান্দার কোণ ধরে মা তখনও
দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর হার হাওয়া ছেলের অপেক্ষাতে—
আগুন চন্নন মুখখানা জ্বলছে যেন।
খোলা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে চোখে পড়ে বিভানিষৃতির অবয়ব।
খোলা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে অনন্ত শেষহারা ধাপ ধাপ
ফুটন্ত তারায় ধরে ধরে উঠছে দুর্ভাগ্যের মুখ—

মনে পড়ে। লতাফুল খোঁচা দিয়ে উঠছিল ঠাণ্ডা ওয়াড়ে,
সবজির পাথর ডুমো বুকে বেধে আছে সারা রাত—
মনে পড়ে—চুল্লির খাঁচার অন্ধকার মুখটাতে
অনন্ত অনন্তকাল চেয়ে আছি, অকৃতী পাথর।

মা তোমার শিয়রে বসে আছি

সামসুল হক

খুব মৃদু স্পর্শ করো ওঁকে উনি এইমাত্র ফুটে উঠেছেন
যেভাবে বাক্-কে তুমি স্পর্শ করো সেভাবে ওঁকেও
সমস্ত জীবনে ওঁকে এইভাবে ফুটে উঠতে দেখেছ কখনো
শৈশবের কৈশোরের যৌবনের বার্ধক্যের এমন আলিপ্ত প্রস্ফুটন
এমন অভেদ উন্মোচন
স্বপ্নার্ত স্বপ্নাক্ত জন্মে দেখেছ কখনো
ছন্দের মাত্রায় চেয়ে সূক্ষ্মতায় স্পর্শ করো ওঁকে
তোমার নিজের মত্ত হৃৎপিণ্ডে ওষ্ঠ রাখো তুমি
সেও কুয়াশার মধ্যে জেগে যাক শিউলির অ-বাক্ গহনে
তোমার সর্বস্ব থেকে একফোঁটা ঠিক একফোঁটা জল ফ্যালো
শিউলির শিশিরের জল
ওঁর মুখে নয়   কিছু দূরে
মাটির উপরে
যার নীচে শুয়ে থেকে
                তোমার সর্বস্ব খুঁজে বেড়াবেন উনি
আর নিজে হারিয়ে যাবেন বারবার
তখন তোমার পালা   ওঁকে খুঁজে এনো
রেখে দিয়ো তোমার সমূহ স্তব্ধতায়
অন্ধকার নামার আগেই
শুধু বলো   মা এখানে তোমার শিয়রে বসে আছি
আমার ভুবনে

মা

বাসুদেব দেব

পানের বাটায় চুনের দাগ   পান শুকোচ্ছে
ঠাকুরের আসনের তলায় এক টাকার নোট
বাক্‌সের নীচে বিবর্ণ চিঠি হাত থেকে খুলে নেওয়া আংটি

বাতিল চাবি   কার যেন
এখন তুমি সংসার ছাড়িয়ে সংসারের ওপর
ছবি হয়ে শাসন করছ   যেন
অন্য এক পুজোয় ভরন্ত সংসারের
একরাশ চাবি লাল পাড় আঁচল থেকে
বেজে উঠছে   ঝরে যাচ্ছে চোখের জলের মতো
দু পায়ে ধুলো   দুঃখ সুখ স্মৃতি বিষাদ
পথের ঘাসে মুছে তোমার হঠাৎ যাওয়া

যেন বঁটি কাৎ করে এইমাত্র কোথাও গেলে
পুজোর ফুল তুলতে
কাঁথা মেলে রেখে গেছ আদ্ধেক ফুল তোলা

এমনি করেই সব হারিয়ে যায়
এমনি রীতি   দুহাতে নদীর দুপাড় ছুঁয়ে
জলের স্রোত   প্রথাসিদ্ধ সান্ত্বনা

সারাদিন বঁটি কাৎ হয়ে পড়ে আছে
সময় কাটে না
সন্ধ্যাবেলা মেঘ ঘনিয়ে উঠলে মনে হয়
কে যেন যেতে যেতে পথে ভিজবে

ঢেলা-বাঁধার দিন

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার মনে পড়ে, মা,
এক-একবার অসুখ থেকে যেই উঠে দাঁড়াতাম,
আমায় নিয়ে চলে যেতে মন্দিরে কি দরগায়
মানত মেটাতে,
নিজের হাতে বাধা ঢেলাটা খুলে
মুখে গুজে দিতে প্রসাদী সন্দেশ?

কম তো ভুগিনি!
অস্থিসার শরীরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকত ভোগান্তি,
হয় এটা, নয় সেটা।
কখন যেন ছুটতে তুমি ঢেলা বাঁধতে।
তারপর, একদিন যখন
সবল পা ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছি বিছানা ছেড়ে,
তোমার মেঘলা মুখ
মুহূর্তে হয়ে উঠত আলোয় আলো।

জানো মা,
তোমার সেই স্মৃতি আজ আমাকেও তাড়িয়ে বেড়ায়
এই মন্দির থেকে ওই মসজিদে,
এই পীরের থান থেকে ওই পীঠস্থানে,
কোনও দিন খুলতে পারব কি না না-জেনে,
আজও খুলতে পারিনি একটিও তা জেনে,
কেবলই ঢেলা বেঁধে বেঁধে চলেছি আমি
এই বুড়ো সময় আর এই বুড়ি পৃথিবীর নামে।

একুশে ফেব্রুয়ারি তিরানব্বই

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ভেবেছিলাম, ঠিক চিনে নেব।
আমের বোল আর বাতাবি ফুলের শ্বাস
কালো জলে ঈর্ষা, গা-শিরশির
আটত্রিশ বছর, দুহাতে আঁটে না।

ও আমার জন্মঘর
শুকনো পাতায় থমকে-থাকা সকাল
হলুদ বেনে-বউ
সীমান্ত পেরিয়ে এসে তবু এত দূর?

রাস্তা হারিয়ে দেয় শহর, এলিফ্যান্ট রোডের সরু গলি
দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে এসব কী—সোনারগাঁ প্যালেস,
পলাশবাড়ি, মহানগর প্রভাতী?
আমার অক্ষর পরিচয় হয় না।
খুশরুভাই হাসে—এ তো হোটেল, সিনেমা-হল, মফস্বলের ট্রেন!
হায় আমার বন্ধক-দেয়া মাতৃভাষা
চোখে পিঁচুটি, গলায় বাঁজ, আঙুলে হাজা—ওই না টুনির মা?

স্পষ্ট দেখতে পাই না।
বাইশ বছরের অর্বাচীন যুবক, সামনে থেকে পরদা তুলে নাও
দুঃখিনী বর্ণমালার সভায় আমাকে ডাকলে কেন?
অন্ধ বধির আহ্লাদ, তোমার কাছে না
আমাকে যেতে হবে ভাঙাসিঁড়ির ধুলোয়
চোখের জলের পুঁতি যেখানে মালা হয়ে আটকে আছে
আটত্রিশ বছর।

মন কাঁদে

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মন কাঁদে। মন কাঁদে, এই পুরনো কথাটি আজ নতুন শাড়ি পরে এসেছে। শাড়ি নতুন হলেও তার রঙ এবং নকশা সেই পুরনোই। মাথার চুল যেন যুগ যুগ আগে বাঁধা। চালচলনেও বাসী সময়, যেমন, ঘোমটা সামান্য টানা, ঠোঁটে পানের রস এবং এসবের মধ্যেও রাতের নদীতে প্রতিপদের জ্যোৎস্নার মতো বলে দিচ্ছে—
মন কাঁদে।

মন কাঁদে! শীতের রাতে বৃষ্টিবাহী বাতাসের মতো, দুর্ভিক্ষের সন্ধ্যার মতো মন কাঁদে।

জননীর সঙ্গে মুখোমুখি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

জলপাইবনের মুখে স্তন্যদাত্রী জননীর সঙ্গে দেখা হল।
        ঘোর বৃষ্টি, ঘোর ঝড়, তবু জননীর বৃন্ত থেকে
                আকণ্ঠ শুষে নিতে চাই বলে
আমি তার পিছে পিছে ঘুরি।
আমি যে বুভুক্ষু, রুগ্‌ণ আমার যে হাত-পা-শরীর
                আজও তেমন বাড়েনি,
আমি যে ধ্বস্ত, ছন্ন করে দিতে পারি না সবারে,
এই দুঃখে আমি সেই দুর্বোধ নারীর দিকে
                ধাওয়া করে আসি।
"আজ দিতে হবে, দাও,
        আমার মুখের মধ্যে পুরে দাও স্তন—"
আমি এই সূর্যাস্ত-ডোবানো বৃষ্টি, ঘোর কালো রং,
        জলপাইপাতার স্তূপে কাঠখড়মের মতো
                পড়ে-থাকা পদচিহ্ন ভুলে
তার কাছে ছুটে যাই; তার দুইহাত ধরে টানাটানি করি।

বহু দীর্ঘদিন পরে জননীর সঙ্গে দেখা হল॥

চলে গেছেন বলেই

তুলসী মুখোপাধ্যায়

মহাশূন্য দূরে চলে গেছেন বলেই—
আজ তিনি খুব ঘনিষ্ঠ নিকটে
উষার আলোর মতো সারাবুক জুড়ে!
ভিখিরি আত্মা নিংড়ে টলমল অশ্রু দুই কণা—
আসলে অশ্রু নয়
শরীর মোচড়ানো অনুতপ্ত ক্রন্দন-বন্দনা।

বস্তুত মা এক স্বাভাবিক জৈব অভ্যাস
জন্মগত অধিকারে নিরাপদ অভ্যস্ত আশ্রয়।
স্তনসুধা, হামাগুড়ি মনে নেই—থাকতেও পারে না
ন্যাংটো শৈশব বাল্যে প্রাণাতিপাত রক্ষাপ্রকরণ লালন পালন
ধুলোভরা কাচের আড়ালে এ্যাদ্দিন মৃত পড়েছিল—
চলে গেছেন বলেই সে সব ফের প্রাণ পেয়ে
বুকে তীব্র বেদনার রোদন-তাড়না।

জীবনের বশ্য সম্মোহনে
খুব বড় নামের ফলক, ক্রম উঁচু সিঁড়ি আর
খুব গুরু গদির পেছনে গতকালও ভীষণ ছুটেছি
মাথার উপর মায়ের দক্ষিণ হাতের স্পর্শ
হয়তো পেয়েছি কিংবা পেয়েও ভুলেছি—
আজ সেই আশিস বড় নিদারুণ ত্রিশূল যাতনা!

আগামী গগনে লোভে প্রলোভনে
জানি আমি ফিরে যাব ফের সেই বশ্য সম্মোহনে
শুধু কোনো দিন খুব কাঁপ দিয়ে জ্বর এলে
ডুকরে কাঁদব—মা, মা...
ঝড়ের কবলে কিংবা চোরাবালুর ঘাতক দখলে
ভয় পেয়ে বলে ফেলব—মা।

দেবী

উৎপলকুমার বসু

১

ঈশ্বরীর গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছ তুমি ঈশ্বরীর কোমল সন্তান।
কালো কিন্তু জোড়া উরু—গর্ভ থেকে এনেছ কি কিছু
উপহার—আমাকে দেবে কি কিছু? অনেক মলিন আছি
সারাদিন—ঢাকা আছি পরচুলাময়
আতঙ্কজনক লোমে—দু পায়ের ফাঁকে।

২

একাকী ভ্রুণের শিশু শুয়ে আছ তুমি। তোমাকে চুম্বন।
নর্মদার জলে আমি অব্যবহৃত ভ্রূণ ভেসে যেতে দেখি।
তোমাকে নদীর বাঁকে কাঠি দিয়ে তুলে নেয় বাগদী কিশোর।
তাহাকে চুম্বন।
চাঁদে ঐ জ্যোতিষ্মান ভয়াবহ গর্ত দেখে আমি ভাবি গর্ভের দুয়ার।
যদিও ডালিম তুমি, চাঁদ ও গ্রহের মতো পরধর্মময়
বস্তুত তোমার মুখে পৃথিবীতে জন্মাবার স্বেদ লেগে আছে।
রক্তনাড়ির গ্রন্থি কেটে দিয়ে বৈদ্য ও মানুষ
স্রোতের উল্টোদিকে যেতে চায় তোমার ভেলায়—
ছুরি-কাঁচি সঙ্গে নিয়ে নর্মদার জলে তারা শিখছে সাঁতার।

দেশপ্রেম, তুমি

উৎপলকুমার গুপ্ত

দেশপ্রেম, তোমার কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ
তিন ভুবনের আলো তোমার চোখে
যা দিয়ে দেখা যেত এই ভূমণ্ডলের
মানুষ গাছপালা বাড়িঘর
ঠাকুর দালানের পাশে শিউলির ঝরন্ত সকাল
কোথায় যে ফেলে এলে জানি না
শুধু বুঝি তুমি আর সেই তুমি নেই

আসলে তুমি নেই আছে তোমার ছায়া
কারণ তোমার নামে রবীন্দ্রনাথের গানের আকাশে
জ্বলে ওঠে তারা
আলিপুরের বোমার মামলা থেকে
আন্দামান সেলুলার জেল
কোথাও নেই তার বর্ণপ্রভা
শুধু বাইরে ঘাস চিবোয় কিছু চতুষ্পদ প্রাণী

দেশপ্রেম, এখন তোমাকে নিয়ে টেবিলে মাংস খাওয়া হয়
টুথপিক্ ব্যবহৃত হয়
সোনালি বাজনা বাজে ককটেল-এ
তোমাকে মাড়িয়ে কাদামাখা জুতো পায়ে
হেঁটে যায় সবাই

তুমি ফিরে এসো ঠাকুর দালানের পাশে
ঝরন্ত শিউলি
দেখো অপেক্ষামাণ
দেখো ফিল্ম নেই
খালি রিল শুধু ঘুরেই চলেছে

তুমি কোন্ নক্ষত্রমণ্ডলে

রত্নেশ্বর হাজরা

মা, তোমার হাত ধরে এখনো দিঘির পাড় দিয়ে
নেমে যাই ভরা ধানখেতে
শিশির মাড়াতে—যেন যাই
কোজাগরী পূর্ণিমার পরদিন খুব ভোরবেলা।
এখনো অনেক রাত্রে সেই পেঁচাটাই যেন ডাকে
বারান্দার পুবে নিমগাছে
যেন আজও লোকায়ত আমার সংসার—মাঝেমাঝে
দারিদ্র ছাপিয়ে ওঠে আলপনা কলাবউ
তোমার শাড়ির মতো জ্যোৎস্নার উঠোনে মুথাঘাস।

মা, আমি অনেকদিন কার্তিকের রৌদ্রে পাকা জলপাই দেখিনি—
দেখিনি অঘ্রান শেষে নবান্নের দাঁড়কাক। পাকা
ফসল তোলার পর ইঁদুরের গর্ত থেকে তুলে আনা ধান
দেখিনি আলের ধারে আকন্দ চারার নীচে শামুকের সাদা ডিম
ভাঙাচোরা সাপের খোলস
দেখিনি ভাটার নদী খেয়াঘাট কাশফুল
নৌকো থেকে নেমে আসা বউ।
শুধু শীতরাত্রে দেখি কালপুরুষ তেমনি আছে—যাকে
আমাকে চিনিয়ে তুমি দিয়েছিলে প্রথম কৈশোরে—

মা, তুমি দিঘির পাড় দিয়ে একদিন
ধানখেতে শিশির মাড়িয়ে একা একা
কোনো এক নক্ষত্রমণ্ডলে হেঁটে গেলে—
সে-চিহ্ন মাটির গায়ে নেই
সে-চিহ্ন আমার চেনা পাখির পালকে নেই
নদী ঘাস হাওয়া কিংবা আগুনেও নেই....

আকাশে অনেক তারা গ্রহ আর নক্ষত্রমণ্ডল—
তুমি কোন্ নক্ষত্রমণ্ডলে মিশে আছ!
আমি যে কৈশোরে চেনা কালপুরুষ ছাড়া কোনো
নক্ষত্রমণ্ডল আজও চিনতে পারিনি!

মা কি ডাকছে

তুষার রায়

লাল আলোর সিগন্যালটা ডাউন
তারপরে আপ
আইঃ.... ব্বাপ
ঘচাং করে ঘ্যাচ
তারপরে প্যাচ্‌প্যাচ্‌ রক্তে হড়্‌কে
চলে গেল বাহান্নটা কামরা।

আরে ইয়ার—
ফর্দা ফাই জীবনখানা অল ক্লিয়ার
মুচকি হাসলুম দেখে নিজেরই মুণ্ড
স্থির রেল লাইনে—
কেননা হাতির শুণ্ড, কিংবা
টিকটিকির লেজ নয় যে তিড়িং লাফাবে।

ভারী বায়বীয় আরাম একখানা যাকে বলে
তিন তুড়িতে ফাঁকি দিয়ে পাওনা কাব্‌লি
রক্তের যৌন ধিকি ধিকি
কোর্ট পেয়াদা কোন শাঃ ধরবে ধরুক দিকি
তবু মুখটা দেখে মনে হল ওর কি মনে পড়ে যাচ্ছে
মায়ের কথা?
রান্নাঘর কুটনো বাটনা
দিদির বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল পাটনায়,
মা কি ডাকছে?

বাতিটা

[মায়ের জন্মদিন স্মরণে]

নবনীতা দেবসেন

—"এইবারে শুয়ে পড়ো, মাগো,
এগারোটা বেজে গেছে।"
—"এগারোটা আবার রাত নাকি?
তুই শুয়ে পড়, তোর কাল কলেজ রয়েছে।"

মা বসে আছেন তাঁর ইজিচেয়ারে
সরু নাকে মোটা চশমা
ফর্সা আঙুলে আতসকাচটা ধরা
কোলের ওপরে বিছোনো স্টেটসম্যান।
পাশের টেবিলে ফ্লাস্কে চা, ওষুধবিসুধ,
রুপোর ডিবেতে পান আর জর্দা,
পেতলের পিকদান, পেতলের ক্যাশবাক্সো।
পিছনের টিপয়ে মাটির ঘটে
মার প্রিয় রজনীগন্ধার গুচ্ছ
আর বেতের টেবিল ল্যাম্প, আগরতলায় তৈরি—
সামনে টিকটিক করছে অ্যালার্ম ঘড়িটা।
ট্র্যাভলিং ক্লক।

মা কাগজের পাতা ওলটালেন।
প্রচণ্ড খড়খড় শব্দে শব্দহীন রাত্রি টুকরো হল।
বই বন্ধ করে আমি উঠে আসি।
ঘরে পা দিতেই একগলা রজনীগন্ধার
গন্ধের গভীরে ডুবে যাই।
চেয়ারে বসেই ঢুলছে নার্স মেয়েটি।
—"মাগো, শুয়ে পড়ো এইবারে,
রাত দেড়টা বাজে"—
—"রাত দেড়টা?" ধমকে ওঠেন, "এখনও
শুসনি তুই? সকালে কলেজ?"
বকুনি খেয়েও বলি, নির্লজ্জ বেহায়া—
—"শরীর যে খারাপ হবে, এভাবে জেগো না"—

—“শরীর?” এক গা গয়নার মতো ঝলমলিয়ে
হেসে ফেলেন মা।
—“আরও কত খারাপ হবে রে শরীর?
আর—হবেই বা কী, শরীর দিয়ে?”
আরেকবার যেতেই হয়, নিজে শোওয়ার আগে।
—“আড়াইটে বাজলো, মাগো ক্ষান্ত দাও,
খাটে শোবে চলো।”
—“শোবো, শোবো এইটুকুনি বাকি—
পড়া তো সহজ নেই, ছানির দৌলতে?”
সামান্য অপ্রস্তুত হেসে, ডুবে যান ছাপার হরফে।
টেবিলল্যাম্পের আলোয়, আতসকাচের
উদ্ভাসিত মনোযোগে
অ্যালার্ম ঘড়িটার টিকটিক
মুছে যায়।
ফিরে আসতে আসতে শুনি
নার্সমেয়েকে বলছেন—“না, না, বাছা,
নিবিয়ে দিয়ো না আলো,
বাতিটা জ্বলুক অমনি
আরো এক পৃষ্ঠা বাকি আছে”—

আরো এক পৃষ্ঠা বাকি, আরো এক
প্যারাগ্রাফ, আরো একটা বাক্য বাকি—
আরো একটি শব্দ দাও, নার্সমেয়ে,
আরো একটি দিন॥

মা-কে নিয়ে

আশিস সান্যাল

হারিয়ে গেছো অনেক দূরে তুমি।
তবু আমার মা,
দু-চোখ মেলে দেখি জগৎ জুড়ে
তোমার মহিমা।

যখন রাতের হিংস্র কুটিলতায়
কুয়াশা দেয় আড়ি,
খুঁজে বেড়াই শব্দবিহীন একা
সমস্ত ঘর-বাড়ি।

যেতে যেতে দেখায় পথে আজও
আলোর উত্তরণে
ছড়িয়ে গেছে তোমার গান দীর্ঘপথের শেষে
সবুজ পাতার বনে।

হারিয়ে গেছ অনেক দূরে তুমি।
তবু আমার মা,
অন্ধকারে ধূসর পথে তুমি
ভোরের চেতনা।

ঘোড়পদী

অশোক চট্টোপাধ্যায়

আহা রে নির্জন বৃক্ষ, এতগুলি স্মরণীয় ফুল
একাই ফোটালে তুমি খেলাচ্ছলে; নিশাবৃত ডালে
একাই জাগালে তুমি দ্বিধাহীন সুবর্ণরেখায়
লক্ষ লক্ষ প্রাণীদের অন্তরালস্থিত ভালবাসা
এমন অদ্ভুত জাগরণ আমি ক্বচিৎ দেখেছি।
মানুষের নিপুণতা ছেনিতে পাথরে যত ফুল
ফুটিয়েছে, আর কেউ অমন সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে
ডাকেনি আমায়, এমন নরম হাত আর কেউ
রাখেনি হৃদয়ে আর; ঘুমের আঁধার মাঠ থেকে
গুপ্তচর বংশীধ্বনি পায়ে পায়ে পা ফেলে পা ফেলে
একে একে সব রেখা অতিক্রম করে চলে আসে
চরম লক্ষ্যের মুখোমুখি; আমি কাউকে চিনি না—
হে ফুল, হে শব্দাবলী, নক্ষত্র, শিশির, তোমাদের
স্পর্শের অতীত, যেন জন্মের মুহূর্তমাত্র বাকি
সমস্ত শরীর টলে জননীর, পুঞ্জীভূত তাপে
বিস্ফোরণকামী দেহ ধূমাবৃত সমস্ত শিখর

গান্ধীনগরে এক রাত্রি
মণিভূষণ ভট্টাচার্য

গোকুলকে সবাই জানে, চিনে রাখল ডি আই বি'র লোক
স্টেট্‌স্‌ম্যান পড়ার ফাঁকে আড়চোখে, গোকুলের মা
অন্ধকার ঘন হলে বলেছিল, 'আর নয়, এবার ফিরে যা'—
ফেরার আগেই খাকি রঙের বিদ্যুৎ দরজায়,
রিভলভার গর্জে ওঠে, গর্জায় গোকুল,
রাষ্ট্রীয় ডালকুত্তা ঝুঁকে ছিঁড়ে নিল এক খাবলা চুল
রাতকানা মায়ের চোখে কুরুক্ষেত্রে বেল্টের পিতল, বুট,
জলস্রোতে নামে অন্ধকার,
শবচক্র মহাবেলা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ,
পাথরে পাথরে গর্জে কলোনির সুভদ্রার শোক।

অধ্যাপক বলেছিল, 'দ্যাট্‌স্‌ র-ঙ্‌, আইন কেন তুলে নেবে হাতে?'
মাস্টারের কাশি ওঠে, 'কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!'
উকিল সতর্ক হয়, 'বিস্কুট নিইনি, শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে।'
চটকলের ছকুমিয়া, 'এবার প্যাঁদাব শালা হারামি ও. সি-কে।'

উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের তেজি রক্তধারা,
গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিলে তারা।

দিঘি

পরেশ মণ্ডল

আকাশটা হাঁস হয়ে চরে বেড়ায়
মেঘলা দিঘিতে
বারোমাস
আকাশ না হাঁস
কাকে ফেলে কাকে দেখি
কাকে রাখি
ডুবুরি তো ডুবে আছে
তালগাছে নেমেছে বিকেল
বাঁশির আওয়াজ রেখে গেল রেলগাড়ি
বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি
আকাশটা হাঁস হয়ে চরে বেড়ায়
প্রায় আড়াআড়ি
মেঘলা দিঘিতে
বারোমাস

বিনিময় বুঝিনি বলে

অতীন্দ্রিয় পাঠক

দীর্ঘপথে **উষরভূমি** অতিক্রম করে
তোমার কাছে ফিরে এলাম হীরকদ্যুতি অকালবেলায়
শস্যমুখী খেতে—
আমায় দেবে আছে কি কোনো বাণী
প্রেরণা কোনো উৎসমুখ খুলে—

কে চলে যায় দিব্যখাটে চড়ে
খই ছড়িয়ে শব্দজালে মোড়ক ঘিরে রেখে
অনেকদূরে আলোকশিখায় চোখ রেখেছ জানি
আমায় দেখে অলসচোখে শান্তশীল ছবি—
কোন স্বদেশে যাচ্ছ ভালবেসে!
তোমার কাছে শস্য আছে জেনে
স্বদেশ-ফেরা ব্যাকুল চোখে এমন ফিরে আসা
পৌঁছে গেছি ঠিক তখনি যাবার ছবি কেন
আলোকমালা থাকত তবু স্বপ্নমাখা চোখে

শস্যকথা জেনেছে যারা, বিনিময়
শিখেছে যারা, সহজে ওরা বোঝে
প্রবাহ যদি শস্যখেতে **উষরভূমি** হতে
উৎসমুখ খোঁজে না কেন কেউ
বিনিময়ের এমন ভাষা শেখা হয়নি আজো
উৎসমুখ চলেছে তাই অলীক শয্যায়
বিদায়বাণী নাই বা ছিল প্রতীক্ষা তো ছিল
শস্যগাঁথা শিখিনি কেন তবু!

অন্তরালে দাঁড়িয়ে থেকে দেখি
পৃথিবী ভাসে, মানুষজন কোথায় সব থাকে
নির্বিবাদে মোড়ক ঘেরা পৃথিবী শুধু ভাসে

জন্মবৃত্তান্ত
দিব্যেন্দু পালিত

মা-কে নিয়ে আমার খুব গর্ব ছিল
আমার জন্মের সময় আমি তো জন্মাইনি—
সুতরাং, জন্মদাত্রী ব'লে নয়।

আসলে
মা খুব গুছিয়ে বলতে পারত
জন্মের গল্প।

মা বলত
সেই জ্যোৎস্নায় ফুটফুটে রাতের কথা,
যখন
আমি আসবো ব'লে
চাঁদ ঢুকে পড়েছিল আমাদের কুঁড়েঘরে—
আর
কোথা থেকে যেন
একটা চক্রধর সাপ
আমারই মাথার পাশ দিয়ে চ'লে গেল
ক্ষমা দেখিয়ে।

মা জানত
মানুষের জন্মের কাহিনী
ঠিক কতটা বললে
সুন্দর হয়।
ঠিক কতটা বললে
সাপের ছোবলেও ঝ'রে পড়ে মধু।

সেজন্যে
বেমালুম চেপে গিয়েছিল
রক্তে ভেসে যাওয়া নিজের
সেই যায়-যায় অবস্থার কথা—
নাড়ির ভিতরের যন্ত্রণার কথা।

মা নিজের মৃত্যু দেখেনি।

মা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সে-ই শুধু পৃথিবীর দরোজায়
উদগ্রীব আঙুল মেলে ধরে;
তার চিন্তা হিমালয় ছুঁয়ে
বাসুকির ফণা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
করুণার মতো গলে যায়।
তার কাছে মাঝে মাঝে আয়না নিই—দেখি—
গাছপালা পাখিপাখালির ভিড়—আর—
শীতের চাদরে মোড়া শৈশবের সুখ।

সে-ই শুধু উদগ্রীব আঙুল রেখে পৃথিবীর দরোজায়
ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যায়
ছোট হয় তারপর ধীরে-ধীরে মুছে যায়
তার নাম তার অবয়ব।

আজকাল আয়নায় তার মুখ ক্রমশ বন্ধুর॥

কবিতায় মা/১৯

ভুলটি, অতিনক্ষত্র

মলয় রায়চৌধুরী

শীতাতপ ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে ক্লান্ত স্ট্রেচারে শোয়ানো ভুলটির
চাদর-ঢাকা অপরূপ লাশ কালীপুজোর সময়কার হাসপাতালের
ফাঁকা করিডরে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে আমি কণ্ঠরুদ্ধ চেহারায়
আদল লুকিয়ে কাঁদতে থাকি;
আমার দিকে পা করে শুয়ে আছে ভুলটি। স্ট্রেচারের ওপর ভুলটির
পাশে আমার আপিসের জরুরি নথিকাগজ ঠাসা ব্রিফকেস।
আমি থ্রি-পিস স্যুটে
চোখের গরম ভাপে উতরোল হয়ে আসা চশমার কাচ। আমার পেছন
পেছন আমার ছেলে আর মেয়ের হাতে ভুলটির ফেলে যাওয়া
অমায়িক টুকিটাকি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট হাতে আমার স্ত্রী
প্রায়ান্ধকারে হলুদ শীতের মাঝে হেঁটে যাই পাঁচতলা থেকে পাকিয়ে
নীচে নেমে যাওয়া বিবর্ণ কংক্রিটের করিডর বেয়ে তারাভরা
কোলাহলের দিকে
বাইরে সৎকার কোম্পানির কাচ গাড়ির কাছে রজনীগন্ধার শেষ
স্তবক হাতে অশীতিপর বাবা
মানব ইতিহাসের অনস্বীকার্য নশ্বরতায় আমাদের পরম্পরাময়
হারিয়ে যাবার গৌরব, বস্তু দুনিয়ার জিজ্ঞাসাকূট সাবেক, অকাল
অনুভূতির উজাড় আত্মীয়তা, অঘোর, সন্দেহহীন, সতর্কতার
স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বিতাড়িত
খেয়ানৌকো কোন্নগর থেকে পেনিটির ঘাটের কাছে আসতেই জলে
ঝাঁপিয়ে ডুবসাঁতার দেখায় ভুলটি
জাফরান ঢেউদের তরল উল্লাস, পুঁটলি বেঁধে পাটনায় নিয়ে যাওয়া
খেজুরগুড়ের মুড়কি, পাটালি
গুপো-সন্দেশ, গোধূলির আস্তরণে কাঁচা সুপুরি, দোক্তা, গা-ঘষার
ছোবড়া, নেয়াপাতির কাঁদি, শোনপুর মেলা থেকে মোষের
শিঙের কাঁকুই;
বিছানায় দাঁড়িয়ে মাঝরাতে মশারির গাঢ় অন্ধকার সেলাই।
তা হলে আমিই চাঁড়াল, হাড়ের প্রধানটুকরো ব্রিফকেসে আছে।
দিনভর মেঝেতে পুরোনো কাপড় বিছিয়ে নকশাভরা আকাশ
তোরঙ্গ উজাড় করে ঘরময় সিপিয়া গন্ধের ফোটো : হরিণীর
থমথমে বিবাহবছর; পিচবোর্ডের ডিবেতে গয়না, আটভাঁজ
করা একশো টাকার নোট
অমল আশ্বিনের অতর্কিত হুমড়ি, পাড়মোড়া তালপাতার
নাম না-জানা রেল-স্টেশনের পাখা
কানে এখনও তোমার প্রসববেদনার রিনরিন রিনরিন রিনরিন.....

মা, তোমাকে

অনন্ত দাশ

মা, আমাকে আর গর্ভে ধারণ করো না
তোমার বত্রিশ নাড়ি ছেঁড়া কষ্টে
আমি আর জন্মাতে চাই না
দেখতে চাই না
এই পৃথিবীর মাটি, জল, হাওয়া
তবুও তো সেই পথে যাওয়া
ঝর্নার জলের মতো স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণে

এই উর্বর মাটিতে
ফলেছিল একদিন অঢেল ফসল
আর আজ এই শূন্য করতল
চৈত্র দুপুরের মত ফাঁকা

এর বিষাক্ত বাতাসে
আমার দম বন্ধ হয়ে আসে
দুর্নীতি দুহাত মেলে ছেয়ে আছে বিশাল আকাশ
ভাঙা হাটের এই সংসারে
তবে কি শুধুই ক্লান্তি, রক্তক্ষয়, গ্লানি!
না, তুমি সেই কীর্তিনাশা নদী
যে শুধু নিজেকে ভেঙে
গড়ে দেয় আরেক তীরভূমি—

জন্মদাত্রী, মা আমার
তোমার কথা ভেবে বড় কষ্ট পাই
তোমার কপালের ভাঁজে
দেশভাগের স্পষ্ট চিহ্ন
শুখা মরসুমের নদীর মতন
শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার হাতের শিরা
তবুও তোমার কাছে ফিরে এসেছি, মা
যেমন নদীকে একদিন
ফিরে আসতে হয়
তার উৎসের কাছে—

বসে-আঁকো প্রতিযোগিতা

নির্মল বসাক

এই আঁকলাম একখানি নদী
পাড়ে বটগাছ ছায়া ছিটুচ্ছে, আঁকলাম
পৌষ বা চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা,
ওপারে বিজয়া.....

কিছু দূরে নির্মল নদীর ঘাট, আঁকলাম
নেমে যাচ্ছে কলসি কাঁখে আরো নির্জন এক বউ—মা।
তুমি কি জানো, বিচারক, ওই বউ জলে নামল
আর ভেসে উঠল না....

আমার তো রঙ নেই, বিচারক,
তুমি কি বুঝবে ছবি দেখে এই শূন্য সাদা পাতা!

মা তোমাকে

উত্তম দাশ

এই পথে ভালোবাসা অনেক হেঁটেছে
এই পথে জেগে আছে, আর কে, বকুল ছাড়া?
শেষ বিন্দু অশ্রুও কি নিজস্ব হবে না,
সব দেবে, দেবে বলে বকুল ঝরালে।
প্রভাত ফোটাও কত অনায়াসে
সূর্যের নিকটে নিয়ে যাও তমিস্রাকে
যেন তার গোপন ভাঙবে বলে
এই আলো অনায়াসে প্রভাত ফোটাল।

এ ঘাটে এখন শুধু তীর্থজল,
নৌকা আছে পারাপার ডাকে—
শোনে, কেউ কেউ শোনে, ডাকে বলে শোনে।
গঙ্গার এই পৈঠায় বসেছ উজান বেয়ে
বিকেল এঁকেছে গোধূলির আলো, রক্ত ঢেলে—
এত রক্ত, মা বলেই মোছালে আঁচলে।
এবার কপাল ছোঁবে সেই রোদ
তমিস্রাকে যে বলেছে, যাও--
যে বলেছে, এসো প্রাণ
প্রণামের কাছে যাই, এই সে চরণ
তীর্থ যাকে একান্তে ডেকেছে।

হাবিজাবি-২৫
সুবিমল বসাক

মাইঝ রাতে কুনো-কুনোদিন আদ্‌খা কপাটের ছিকুলি ঝন্‌ঝন্‌ করে
যে কেউ আইয়া কয় : 'আমি থাকতে চাই!'
কিংবা কয় : 'বেরিয়ে এসো।'
আমার কুনোটা করা হয় না
'আমি ভালো নেই'-এই কথা শুইন্যাও
ঝনঝনানি থামে না
মায়ের নাড়ি ছিঁড়্যা বাইর হইয়াও চামের গন্ধ দূর হয় না
'সময় নেই'—আমি পাশ ফিরা শুইয়া পড়ি
ম্যায়ামানুষ পাশে থাকলেও খ্যাল থাকে না এতটুক্
ঘুমের ভিৎরে গতর ও ঘামে লতোপথো করে
হায়, সামান্য সাহানুভূতিও পিঠের হাড্ডি সোজা কইর‍্যা দ্যায়
কতোজনেরে
এই কোঠায় মইর‍্যা থাকলে ২ দিন কি ১০ বচ্ছর বাদে খোঁজ পড়বো আমার
দিন-রাত্রের কুনো হেরফের হইবো না পৃথিম্মীর
৯৯ জন মানুষ দম-বন্ধ কোঠায় এম্‌তেই হ্যান্দাইয়া পড়ে
এতটুকো চাম কুঁচকায় না পৃথিম্মীর
মরণের বাদে সোহাগ খাওয়া গালে আর দাড়ি গজায় না
নোখ বাড়ে না
লোম ব্যাঁকায় না
চোখে কেতুর ভাসে না
গতর দিয়া ঘাম ছোটে না
শরীলের পীরিত গিদ্‌ড়ামি দিশপিত্যা শরীলের লগেই পইচ্যা যায়
বেবাক গরমই একসময় সময়ের তাফাতে ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে
মনের অতৃপ্তি বাসনা মন-রে অস্‌থির করে না আর
দুঃখু জুত পাইলেই চোখের সুমখে আমার
পোলাপান বয়সী ফটো ভাইস্যা ওঠে
মায়ের চ্যারা মনে পড়ে, সোনার নাকচাবি চিক্ চিক্ করে
লাল চশমার ফাঁক দিয়া বেবাক কিচ্ছু সইরজা লাগে
বিহানের লাল রোদ অস্তে-অস্তে হইল্‌দা হইয়া পড়ে
দিন আপন্‌সির বাইড়্যা যায়
শরীল নষ্ট কইর‍্যা দেহি পীরিতও বেশি দিন টিকা থাকে না

সর্বস্ব নষ্ট কইর‍্যা অহন আমি স্বাভাবিকতা চাই।

মা

উত্থানপদ বিজলী

নদী তুমি যাচ্ছ দূরে, তোমার বাঁকে
যদি দ্যাখো সে-কোন দিন আমার মাকে,
অকপটে বলতে পারো বলোই তাকে—
'দেখে এলাম দিব্যি সুখে
তোমার খোকা।
আগের মতো তেমন গায়ে ধুলোবালি
বেহিসেবি ঘুরে বেড়ায় বাজিয়ে তালি,
এমন বোকা।'...

মেঘ তুমি যাও অলস নায়ে কোথায় ভেসে?
দ্বীপ দ্বীপান্তর পাহাড় মরু সে-কোন্ দেশে
দেখা হলে আমার মাকে বলো হেসে—
'তেমন আছে আগের মতো
তোমার খোকা।
কি খেলো আর কি খেলো না, ভাবে না সে
কি পেলো আর কি পেলো না, হিঃ হিঃ হাসে
এমন বোকা।'....

আকাশ ভরা হাজার তারা
কোন্‌টি যে মা!
হাতড়ে আঁধার খুঁজেই বিফল
চিনি তো না।
এই তো আমি! ও-দূর থেকে পাচ্ছ দেখা?
বোকা ছেলে লক্ষ ভিড়ে
বড়ই একা।

গুরুভার
পার্থসারথি চৌধুরী

বেশ ছিল সমাকীর্ণ যত্নলব্ধ সুখের সংসার,
গৃহবাস ঘরে লক্ষ্মী অবিমিশ্র অন্নের আহার,
ঝিঙেফুল আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চ প্রদীপ সন্ধ্যায়,
অলস প্রহর কাটে দীনবন্ধু বিনোদ দোলায়।
শ্রমের প্রান্তর ছিল অনুগত ফসলপ্রসূতি,
ঘুমভাঙা রাতে জাগে জন্মান্তের ভীত অনুভূতি।
বিশালাক্ষ্মী নারী তার অংশভাক মিলিত শয্যার,
তবু তার মনে হল গুরুভার সব গুরুভার।

বেশ ছিল শান্ত স্থির সন্তোষের সুখের সংসার,
দুচোখ দেখেছে চেয়ে পুত্রমুখে বিভা অমরার।
নরম কোমল মুঠি ধরেছিল তপ্ত করতলে,
বৎসল তৃপ্তির ধারা মনে পড়ে শ্রান্তির অতলে।
নারী শিশু ক্ষুধা-তৃষ্ণা রসে-বশে সহজ জীবনে
দেখেছে সে উদ্বোধিত জনতার মুখের দর্পণে
মহাকাল যুগধর্মে জগতের আনছে অভয়,
ছিল তারও অভিলাষ অবিলাস কর্মের প্রত্যয়।
নতুন উষার দিকে ছিল দৃষ্টি নম্র প্রত্যাশার,
তবু তার মনে হল গুরুভার সব গুরুভার।

শস্যক্ষেত্রে দুলে ওঠে সীমাশূন্য আবিল আঁধার,
তামস নদীর জলে রক্তপাত নগ্ন বেদনার।
রাতের আকাশ থেকে কক্ষচ্যুত তারা খসে পড়ে,
পৃথিবীর অধিকার শেষ হয়, দুরাগত বনের মর্মরে
দুঃসহ বেদনা বাজে, হস্তরেখা মুছে যায় ঘামে,
বিশাল পাখার ভারে চিত্তহীন অবসাদ নামে,
মুছে ফেলে স্বপ্নসাধ শিশু নারী সুখের সংসার,
শেষ কথা কেঁদে ফেরে গুরুভার সব গুরুভার।

অশীতিপর

মৃণাল দত্ত

অশীতিপর বৃদ্ধা তাকে আমি
পার করেছি সাঁকো
অশীতিপর বৃদ্ধা তাকে আমি
বলেছি থাকো থাকো
রাত্রিটুকু; ভোরের খঞ্জনি
বেজেছে যেই অমনি বিতরণী
করেছি পার, পারিনি তাকে জরা
মুক্ত করে দেখাতে সসাগরা।।

শেষ অপেক্ষা

কেতকী কুশারী ডাইসন

বেলা যে পড়ে এলো, হেমন্ত আসছে, লাল-কালো-মেরুন বেরিদের ভারে
ঝুঁকে পড়েছে ঝোপঝাড়ের শরীর, ইভা, আমার ইভা;
ট্রেন ডাকে, লাইন পার হবার ফটকের হুড়কোটা
দস্যি ছেলেরা ভেঙে রেখেছে তাদের গ্রীষ্মব্যাপী দাপাদাপিতে;
খালটা টুবটুবে—তার চিবুক-কান-চোখ-টিকি পর্যন্ত জল,
কিনারায় নতুন ইটের মজবুত মেরামতি;
ছাত্রবৈমানিকদের দুটো গুঞ্জরিত বিমান
নিঃশঙ্ক চিলের মতো ঘুরপাক খায়
কাটা খেতের উপরের আকাশে; উঠছে শীতের কপির ভিতু চারা;
এখনই গা শিরশির করে, গায়ে টানতে ইচ্ছে করে
চাদরের ভালোবাসা; শিগগিরই এসে পড়বে
কুয়াশার ধূসর খামে মোড়া সকালসন্ধ্যাগুলির চিঠি।

তোমার কবি-স্বামীর দীর্ঘ কৃশ শরীর তন্ন তন্ন করে খুঁজে
ডাক্তাররা কিছু পাননি, মনে পেয়েছেন বিষাদের উপত্যকা—
যার অস্তিত্ব আমাদের জানাই ছিল—আর তোমার আপাতসুস্থ শরীরের
কোন্ এক অগম্য খাঁজে
পেয়েছেন ক্যান্সার, যাকে ছোঁয়া যাবে না, যা নয় অস্ত্রোপচারসাধ্য,
যা ওষুধে সারবে না, রশ্মিচিকিৎসা যার পক্ষে অবান্তর,
ইভা, আমার ইভা।

তাঁরা তোমাকে দুটি বিকল্প দিয়েছিলেন :
হয় বাকি দিনগুলি কশাহত হয়ে কাটাও
যে চিকিৎসা সারাতে পারবে না তারই হাতে মার খেয়ে,
নয়তো যে-ক'টা দিন বাঁচবে ঠিক করে বেঁচে নাও
প্রতিদিন প্রতিরাত্রি বাঁচারই সুস্বাদ নিয়ে।
তুমি, শক্ত মেয়ে, আমারই মায়ের বয়সিনী,
বেছে নিলে দ্বিতীয়টা। আমিও কি তাই করতাম না?

তোমার স্বামী ভেবেছিলেন তাঁরই ক্যান্সার হয়েছে,
কিন্তু তাঁর তা হয়নি। এত দিন তাঁর বিষণ্ণ মনকে
সামলে-সুমলে রাখার পর রোগে ধরেছে তোমাকেই।
তাই হাটবাজারে তোমাকে আর দেখতে পাই না,
পেঁয়াজ-আলুর স্তূপের সামনে

দেখতে পাই উদ্ভ্রান্ত এক প্রাক্তন কবিকে।
ডাক্তাররা তোমার হাতে
ছটি মাস সময় দিয়েছেন :
দে দোল্ দোল্ ইভা, আমার ইভা।

তুমি এখন বাড়িতে। হাসছো, টুলে পা তুলে বসে কফি খাচ্ছ।
ডাক্তার-নার্সদের সুবিবেচনার প্রশংসায় সোচ্চার
শক্ত ইংরেজ মেয়ে তুমি, ইভা, আমার ইভা।
তোমাদের ঘরজুড়ে ফুল আর ফুল-আঁকা কার্ড,
ফুলের ছাপ তোমার সুতি গাউনখানাতেও।
তোমার বন্ধুরা তোমাকে দেখতে আসছেন—কারও কিছু করার নেই
প্রীতির পেয়ালাটুকু ঠোঁটে ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া।
তোমার ব্যথা নেই, অস্বস্তি নেই। এ বেশ এক অপেক্ষা।
রান্নাবান্নাও নাকি বাদ দিচ্ছ না, আচ্ছা?
টম আরেকটা সিগারেট ধরাচ্ছেন। আমি তাঁর মুখের দিকে
তাকাচ্ছি না। তুমি চলে গেলে পর
তাঁকে আর তাঁর বিষাদকে
কে দেখে রাখবে সে-প্রশ্ন
করছিই না।

হাঁটতে যাবে, ইভা, জলে ভরা খালের আঙুল ধরে,
ট্রেনের শিসকে ডাইনে রেখে, উত্তর দিকে,
অথবা খেতের পথ ধরে? না, কেউ পিছনে ডাকছে না।
আমাকে যেতে হবে দূর দেশে। সেখান থেকে ফিরে এসে
দেখা হবে কি তোমার সঙ্গে? হয়তো ততদিনে
তোমার ব্যথা শুরু হয়ে যাবে, লাগবে মর্ফিন।

যাযাবর প্রেম আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে যায় দিগন্তের দিকে,
আর সেখানে, কুহকী সিলুয়েটে
ছাইরঙা আলোয়ান গায়ে
তার মরু-তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে
জবরদস্ত মৃত্যু, গোঁয়ার অধৈর্য পালোয়ান,
হাতে হাত ঘষে, পাঁয়তারা কষে,
সূর্যোদয়ের মতো নির্ভুল, সর্ষের তেলের গন্ধের মতো সুনিশ্চিত।

টানে, সেই জারক পাকস্থলী টানে।
গরিবকে হাতছানি দেয়
অসীমের ধোঁয়া-ওঠা চুম্বক রোমাঞ্চকর শহরতলি
দিনশেষের লাল আবেশে—
পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে, ইভা, আমার ইভা।

মা

দেবী রায়

মা—
কোলের ওপর খোলা রামায়ণ, উদাস-চোখে ভারী চশমা

মা—
চোখ একবার রামায়ণের পাতায়, আর একবার—
ঐ দূরে, টলমলো-পায়ের দামাল নাতনি খোলা-গেট,
না বেরিয়ে যায়!

মা—।
বড়টি—বেশ বড় গিয়েছে বিদেশে, চিঠিও
আসেনি মাসাধিককাল!

মা—
কর্তা গিয়েছেন স্বর্গে...একথা কেন উড়ে আসে?
চোখে কি বালি? দৃষ্টিও ঝাপ্‌সা, সামনের যা কিছু
সব অস্পষ্ট, ধোঁয়া...এর ভিতর নাতনি দৌড়ে এসে
বুকে ঝাঁপায়...

মা—
চোখের জল গড়িয়ে পড়ে রামায়ণের হলুদ-পাতায়!

দেবী

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

জল দুলছে, ঘোলাটে গেরুয়া ঢেউ ভাঙে,
নৌকোর ছইতে ঘেমে ওঠা শিল্পীর দ্রুত বাটালি. লম্বা সরু আঙুল
মৃত্যুহিম বাতাস ঝাপটা মারে, নাকে, মুখে, কানের লতিতে
জলের উষ্ণতায় দোল খাই, পাথর ও ছেনির বিকল্প ঘর্ষণে
সেই অনিন্দ্যমুখ ফোটে পদ্মনালে, প্রাণের মেরুকেন্দ্র থেকে
উঠে আসা আগুন, ঝর্নার কোমর ছাপানো চুলে নদীর বুকে
ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই গর্জনবিন্দুতে ভীষণ টলছি, এক একটা ঠোক্করে
চিলকে উঠছে নাকের পাটা, থুতনির ভাঁজ, ভ্রু চিহ্নে সামান্য রেখা,
দ্যুতিময় সেই মুখ, গ্রীবাভঙ্গ চোখে পড়লে আমার প্রার্থনা
শতাব্দীর স্তর চিহ্নে বৃক্ষের কটিদেশ, সন্ধিকাণ্ডের মধ্য উপত্যকায়
সে কি জননী না দেবী, মন্দিরগর্ভে কিংবা অন্ধকার আকাশে
বিদ্যুৎকণায় দপদপ করছে নীলাভ অসুর, কাঁটা
ঘুরছে ঘড়ির দোলক বৃত্তে পঞ্চপ্রদীপের ওঠানামায় স্বপ্ন না জননী
সহাস্য আননে প্রার্থনার আলো, অনন্ত ঘুম থেকে দেবী উঠে আসছেন।

তেমন করে ডাকে না কেউ
পবিত্র মুখোপাধ্যায়

তেমন করে ডাকে না কেউ, বলে না আর কথা;
যা কিছু বলে গভীরে নেই নিহিত নীরবতা।
সারাটা দিন ঘেঁটেছি কাদা, মেখেছি ধুলোবালি,
থেকে থেকেই আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টিও;
মেঘের ফাঁকে কখনো সোনারোদের একফালি;
মায়ের মুখ নিয়েছি দেখে, কখনো দৃষ্টিও
পড়েছে; উড়ে চলেছে সাদা বকেরা; বালিহাঁস;
পৃথিবী মেলে ধরেছে রূপকথা।

সর্বজয়া পথের বাঁকে, দুচোখে তার ত্রাস
উঠেছে ফুটেছে; এমনই চিরকাল!
যা কিছু সুখ বেদনা ক্ষোভ গভীর আকুলতা
অপুকে ঘিরে হয়েছে উত্তাল!

ঐ তো আছো দাঁড়িয়ে তুমি, আশঙ্কায় আরো
হয়েছে গাঢ় চোখের মণি দুটি;
ধুলোর ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে মুছিয়ে দিতে পারো
স্কুলের হলে ছুটি—
ভাবনা তা-ই দিনের শেষ বেলায়।
আমার মন তখনো ডুবে হাজারোতর খেলায়।

তুমিতো নেই। এখান থেকে রয়েছ কত দূরে!
শুনি তোমার ডাক—
'কোথায় তুই অপু, দ্যাখ, খেলছে রোদ্দুরে
পাখিরা এক ঝাঁক;
দেখে নিয়েই পুকুর পাড়ে পড়তে বসবি খোকা,
আমি যাচ্ছি ঘরে;
পশ্চিমের আকাশে দ্যাখ ফলেছে থোকা থোকা
সোনালি ফুল, এখনি যাবে ঝরে।'

একথা আর বলে না কেউ। অরব শূন্যতা...
কোথাও নেই কিছু;
খেলার ছলে লুকোনো সেই দিনের মাদকতা
ফেরে না পিছু পিছু;
বলে না কেউ, ''যতই পাক ধরুক তোর চুলে,
এখনো আছি বাড়িয়ে হাত, শোনো;
যে দিকে যাস, খেলার শেষে ডাকবি যাকে ভুলে
সেইতো আমি, মিথ্যে নয় কোনো।''

পাপপুণ্য

কমল দে সিকদার

ঠিক পাপও নয়
আবার পুণ্যও নয়
অনেকটা মাঝবরাবর চলতে চলতে
ঈশ্বরের কাছে নতজানু হতে গিয়ে নগরে একদিন
রাতজাগা পাড়ায় এসে দাঁড়ালুম
তখন এক বাতিল সোহাগী
কী অভিমানে
আমার হাত আঁকড়ে ধরে বললে
নাগর মনে পড়ল
আমি যে পিদিম জ্বেলে কত রাত
তবু তার চৌকাঠ ডিঙোতে গিয়ে
হোঁচট খেয়েছি
তাই দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে
নয়ন জলে বিদায় দিলে
তেঁতুলতলা নীলগঞ্জ জীবনপুরের হাটে পৌঁছুতেই
এক চটুল বোষ্টুমী
অকস্মাৎ গান থামিয়ে আমায় বলেছিল
ও ঠাকুর তুমি কোন দলে গো
আমি নিরুত্তর ছিলাম
আসলে সাধ্য ছিল
কিন্তু সাধ্য ছিল না
তাই তেমন করে ডুব
আমি দিতে পারিনি
না পাপে না পুণ্যে—

মা মণি, তুমি কেমন আছ

মুকুল গুহ

তোমার চিবুকে ও কিসের ক্ষতচিহ্ন, আমি দেখতে পাচ্ছি,
ওগুলো বাড়ছে!
তোমার স্তনবৃন্ত নখাঘাতে ছিন্ন, আমার চোখে পড়ছে,
ওগুলো বাড়ছে!

না, তোমার হাতদুটো সরিয়ে নিও না, আমি তোমাকে ছুঁয়ে থাকতে চাই,
না, তোমার মুখ লুকিয়ে রেখো না, আমরা তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে চাই,
আমাদের মনে হচ্ছে দুঃখের বৃষ্টিতে স্নাত হয়ে শুদ্ধ হয়েছি আমরা,
অত্যাচারের অমৃত আচমনে পবিত্র হয়েছি, এখনই শুরু হবে ক্ষমা না করবে খেলা আমাদের;

যখন আমি আসতাম, তুমি ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে,
তোমার কালো চোখে প্রত্যাখ্যান থাকেনি কোনদিন, ভালবাসা থাকত, আগ্রহ থাকত,
তুমি স্বপ্ন দেখেছ তোমার সন্তানকে নিয়ে এক অবিচ্ছেদ্য গৃহকোণের, প্রশ্নাতীত জগতের,
সেই গৃহকোণের পতাকায় লেখা থাকবে—অপারতা তেসং অসতসম দ্বারং-এহি পসসিকো,
সেই স্বপ্নের জগতে অমৃতের আহ্বান থাকত, সিদ্ধার্থের আলেখ্যচিত্র, উদাত্ত আহ্বান থাকত;

চতুর পশুরা আজ ধর্ষণ করেছে তৃণভূমি, ধর্ষণে ক্ষতবিক্ষত করেছে তোমার শরীর,
ম্যাকবেথের মতন শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিয়েছে ঘুম, কে আর ঘুমোতে পারবে ক্ষণভর,
ওই পশুরা ছাড়া, ভেঙে যাচ্ছে ফুলদানি, ছড়িয়ে যাচ্ছে যত্নে চয়ন করা সকালের ফুল,
ঝোড়ো হাওয়ায় নিভে যাচ্ছে সুগন্ধি ধূপ, ছিটকে পড়ছে সযত্নে গোছানো পূজার উপকরণ;

ওই যারা ধর্ষণ করছে, যারা ওই ধর্ষণকে সমর্থন করছে, আর যারা চুপ করে নিজের ঘর সামলাচ্ছে,
তারা হত্যাকারীও বটে, তারা হত্যা কবছে পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আনন্দ রূপের,
তাবা বন্ধ্যা, নপুংসক তো বটেই, তাদের কোনও মা নেই, বাবা নেই, ভাই বোন স্ত্রী নেই, সন্তান নেই,
শিক্ষা আর সভ্যতা, ভালবাসা আর শ্রদ্ধাকে ওরা হত্যা করছে, আর অবাক হয়ে সবাই দেখছে,
যে কীভাবে ওদেবই সামাজিক স্বীকৃতি দিচ্ছে মিডিয়া, বাকিদের বলছে যুগের অনুপযোগী, ক্লীব;

না তোমার ঘোমটা টানার আর দরকার নেই, লজ্জা তোমার নয়, আমাদের অক্ষমতার,
তোমার চিবুকের ওই ক্ষতচিহ্ন নির্মূল করার ক্ষমতা নেই আমাদের, প্রহারের চিহ্ন মুছে ফেলার,
কিন্তু আমরা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে প্রতিবাদের সংকেতে মুখব হয়েছে পৃথিবী,
তোমার হতাশা, তোমার লজ্জা, তোমার পীড়ন, যন্ত্রণা, এখন আর শুধু তোমার একাব নয়.
মানবসভ্যতার প্রত্যেকটি মানুষের. হয় তারা সেটা খণ্ডন করবে নয়ত জাহান্নামে যাবে;

এখন সভ্যতা, শিক্ষা, ভদ্রতার কথা বললে বাড়ির পোষা কুকুরীও হেসে ফেলবে, তুমি দেখে নিও।

জননী

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

১

ছেড়ে আসা মনে পড়েছে—কত বছর কত বছর!
আমি তোমার নষ্ট ছেলে?
চাই না শহর, বছর-বছর পিছল শহর মত্ত শহর—
আর কি থাকি তোমায় ফেলে!
পড়ে রইল দাবার ঘুঁটি নেশার পাশা,
ভালোবাসা মনে পড়েছে, সশস্ত্র আজ ভালোবাসা।

২

কত দূর ? কত দ্রুত ? কোন দিকে
যায় দস্যুদল ?
দিগ্বিদিক ভেঙে আসি—হারেরেরে হারেহারে! ছুটে আসি
নদীতীরে, কোন দিকে
মেতেছে লুটেরা?
ভরা জল নদীজল বুক দিয়ে পার হবো জল—
ডেকেছেন মা!

জনম দুখিনী মা
সাগর চক্রবর্তী

চাঁদের আলোয় দুঃখগুলি বিছিয়ে দিয়ে
আমার মা
তখন নুয়ে পড়া ধান ক্ষেতে ক্ষেতে
গুনগুনিয়ে বিনোচ্ছিলেন দুঃখসহার গান।

মা, আমার মা।
নীলশিরা ফুলে ওঠা হাত....
তাঁর চোখের মণিকোঠায় জ্বালিয়ে রাখা পিদিম শিখা
বারবার নোনা জলের ঝাপটায়
বেঁকেচুরে যাচ্ছিল।

তোমরা কাকে সুখী করতে চাও পাগলের দল!
তোমরা চোখে দেখতে পাও না, এমন ক্রোধ
তোমাদের জানান দিচ্ছে
তোমাদের পায়ের তলায় মাটি কই?

মাঠের পর মাঠ লুঠ হয়ে গেলে
মা কাঁদেননি।
ঘরের পর ঘর অন্ধকার করে তোমরা
বুক খালি করে চলে এসেছ
মা কাঁদেননি।

কিন্তু এখন
নভেম্বরের নাতিশীতোষ্ণ সাতাত্তরে
চাঁদের আলোয় দুঃখগুলি বিছিয়ে দিয়ে মা
গুনগুনিয়ে বিনোচ্ছেন দুঃখসহার গান।

ছেলেরা তাঁর আজও এক হয় না...

মা

শান্তনু দাস

মাঝরাতে বাড়ি ফিরি মৌরি চিবিয়ে।
তুমি বসে থাকো—ঠিক তোমার মতন.
রান্নাঘরে ঝুল-ডুম, আলোর মতন কিছু তাপের মতন
কিছু আছে।
ঐ একটা শরীর, হাজার শরীর হয়ে ঝোলে।
আমি থেমে যাই......
ল্যাম্পপোস্ট হাঁটে।

তুমি ধোঁয়াচোখে দ্যাখো—বাছা এলো কি এলো না।
চোখের পাতায় জমে রাত।
রাত কি ফুরোয় মা? ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া—
যৌবনের মতো?

জেলের ঘড়িতে কারা ঘণ্টা মারে,
সময়?
না মৃত্যু?
মাপ হয়ে আসে,
খোরপোষে মাথা রাখে শহর-কলকাতা,
শেষ ঘণ্টা।

প্রার্থনার কাছে আমি নিঃশব্দে ঘুমুই।
শব্দ কুকুর হয়ে ডাকে. শব্দ কান্না হয়ে ভর করে রাতের ডানায়,

তুমি জাগলে—
ভোরের আজান শোনা যায়,
রাতের বোরখা খুলে কাটা-তরমুজের মতো ভোর—
নেমে আসে।
তার নীচে ল্যাম্পপোস্ট কখন ঘুমিয়ে পড়ে।
আমিও ঘুমুই।

তুমি জেগে থাকো।

একটি প্রার্থনা, মাকে
রাখাল বিশ্বাস

প্রাণিত জীবন ঝর্নাগান
ফুটে আছ ফুলের বাগান
বিষণ্ণ আলোয় কার মুখ
কষ্ট দেখি আগুনের সুখ
উড়েছে পুড়েছে চারপাশে
ক্ষমাহীন স্বপ্ন দেখি হাসে
ভালোবাসা প্রতীক্ষার টানে
আমিও ভিজেছি সেইখানে
শীতার্ত বাতাস বাঁকে বাঁকে
নৈঃশব্দ্যে আজ কেউ ডাকে
ছেঁড়া পাতা তুমিও কি আছ
আশ্চর্য আঁধার করা নাচ ও
ওষ্ঠনীল বিপন্ন যে মাকে
ফিরে যাব আরূঢ় আমাকে
ধূপ জ্বলে জ্বলে ঝর্নাগান
এ জন্মের শুকনো বাগান...

আম্মা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথায় করে বয়ে এনেছি স্বপ্ন, অনেক দূর থেকে
তার ঘুমের জন্য; তুমি ঘুমিয়ে পড়ো
দরজায় আমি রাখব পাহারা
নদী তার ঢেউ নিয়ে শান্ত হয়ে রবে চুলের উদ্যানে
ড্রাগনের ভাইয়ের কথা মনে রবে স্বপ্নে, ঘুমে....
কিন্তু স্বপ্ন একটা আস্ত পাহাড়
তোমার কাছে আসতে পারছে না;

আমার দুটো কলমেই কালি ভরে রেখো আম্মা
ফিরে এসে আমি কিন্তু লিখতে বসব।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি জানতে চেয়ো না
নিজস্ব গদ্যরীতি আমি কিছু খুঁজে পেয়েছি কি না;
বন্ধ দরজার এপারে দাঁড়িয়ে তখন থেকে দেখছি
লোভী মানুষগুলো কীভাবে হয় প্রতিহত!
ঘুমের মধ্যে তুমি এক দিগন্তজোড়া ডুবো পাহাড়...
তোমার স্বপ্ন, আম্মা, আমি বয়ে আনছি
মাথায় করে, তোমার কাছেই শিখতে পেরেছি
কীভাবে দুঃখ বহন করে চলতে হয়
দিনের পর দিন!

নদীর কথা

মৃত্যুঞ্জয় সেন

সারাজীবনের বাতাস হয়ে জড়িয়ে তুমি
যেন শীতবস্ত্র, আমার শব্দপুঞ্জ
দিগ্বিদিক চমকে ওঠে তোমার শিহরনে
'হে পুত্র, প্রাণাধিক, তুমি কি আহত', তুমি বললে

হে মাতঃ, আমি ভাসতে ভাসতে তোমাতে স্পর্শ করি
এখন সঙ্গীহীন মাঠে ঘুরে যাচ্ছে মুখ
চারিদিকে সূর্যের রঙবদল
এখন লালন করছি
তোমার শোনানো ভূমিস্পর্শ না-করা এক নদীর কথা
মনে পড়ে, তোমার?
আমার শূন্য কবিতার খাতাটিতে এখন সেই নদী
জন্ম-মৃত্যুর হিসেব লিখতে লিখতে সে বলে :
বাঁশবনের ডোমেরা বাতাস বিক্রি করে

আমি ঐ নদীর কথা শুনেও শুনিনা

আমার গল্প

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

মা, মাটির গন্ধে তোমার চোখের পাতা যখন ভারী হয়ে আসবে, আমি চাদরটা তোমায় এগিয়ে দেব। মা, যে রূপকথার গল্প তুমি আমায় বলেছিলে, আমি কি সেই গল্প থেকে ঘোড়াটাকে ডেকে নেব, তার পিঠে চড়ে তোমায় নিয়ে দূরে চলে যাব?

মা, যদি বলো, তোমার চুড়ির আওয়াজ আমি ভ্রমরের মত কৌটো করে ভরে রাখব। আমি তোমার শাড়ির পাড় দিয়ে বিকেলের সমস্ত আকাশটাকে মুড়ে দেব। আমি যখন বৃষ্টির জলকে তোমার রূপকথার গল্প বলব, তুমি দেখো, আমি তখন রানীর নাম পাল্টে দিয়ে তোমার নাম সেখানে বসাবো।

মা, মাটির কাছাকাছি থেকে তুমি সেই গল্প শুনো।

মা, যে চাদর তোমার ঘুমের ওপরে আমি বিছিয়ে দিয়েছিলাম, শিশিরে শিশিরে তা' ভিজে গেছে। ঘাটের পৈঠাগুলো ঢেকে গেছে। সেখানে তোমার পায়ের ছাপ রাখা ছিল। সমস্ত ফুল ভেসে গেছে। এখন পুকুরের জল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মা, তোমার রূপকথার গল্প তুমি আমায় বলেছিলে। সে গল্প আমি সকলকে বলেছি। এখন তোমার পালা, তুমি এবার আমার গল্প শোন।

মা, আমি গল্প বলি, শোন,
মা, আমিই আমার রূপকথার গল্প॥

এক এক বিকেলে
অভী সেনগুপ্ত

কী, চল্লেন? একদিন আসুন না ছুটির দিন, এই সকালের দিকে।
অনেকক্ষণ কাটাবেন, ওর সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। দেখুন না,
আজকাল সমস্তদিন আর কাটতে চায় না, বড় ভালো
লাগে কেউ এলে। ছেলেটা এই ভাদ্রে উনত্রিশে পড়ল—
কী যে মতিগতি, বিয়ের কথায় রুখে দাঁড়ায়। আরে! বলাই
হয়নি, রীনাকে মনে আছে? সেই যে রঙপুরের রীনা জাস্টিস
গুপ্তর মেয়ে—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, সেই ছোকরা কবির
সঙ্গে কত কাণ্ড! দেখুন, এখনও ছোকরা বলছি, আপনি
তো কবে দিদিমা হয়েছেন। রীনা থাকে অল্প দূরে—
প্রায়ই আসে আমিও যাই। ওর স্বামী ভারী সুন্দর মানুষ,
সাজানো সংসার... ছেলের বিয়ে দিল এই শ্রাবণে,
আমিই তো সাজালাম অধিবাসের তত্ত্ব—অথচ নিজের ছেলে....

যা বলছিলাম—পরের দিন নিয়ে যাবো আপনাকে রীনার
বাড়ি, খুব খুশি হবে।—চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিই।
এই রাস্তাটার এই এক মজা, দেখুন শহর আর গ্রাম
বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই কীরকম গলাগলি চলতে শুরু
করেছে। আমি তো এক এক বিকেলে বহুদূর হেঁটে যাই। হ্যাঁ,
একাই কারণ সঙ্গী থাকা না থাকা আমার কাছে কোনও
ব্যাপার নয়।

দারুণ বর্ষায় নেঙটি-পরা কিশোরের ছিপ ফেলে মগ্ন হয়ে থাকা
দেখেছেন? দেখাবো আপনাকে। ভিজতে হবে কিন্তু, কি
হাসছেন? আরে না না আমি রঙপুরের সেই কবি নই।

আর হ্যাঁ জানেন, হোর্ডিং আর দেশবিদেশের এয়ার লাইন্সের
গাড়ি দেখাটা আমার এক অসম্ভব নেশা—কইখালি
থেকে কাঁকুড়গাছি গতো দু'বছরের সবকটা হোর্ডিং
লাগানোর খবর আমি রাখি। আর এক একটা গাড়ি
আমাকে ঘুম পাড়ানোর মতন তীব্র একটা কী যে খাওয়ায়।
আমি ঘুরে বেড়াই ইস্তাম্বুল ব্লু হাওয়াই-এর পথে ঘাটে,

শুনি দীর্ঘপেশী নাবিকের ভারী গলায় গানের মতন
কিছু একটা যাদের শরীরের ওপর দিয়ে ঘুরপাক খেতে-খেতে
বহুদূর চলে আসে আলবাট্রস। তারপর আচমকা ফিরে
যায়। আর? আর ছুয়ে দেখি মিশিগানের তীরে ঘাসের
কার্পেটে শুয়ে পাইনবনের শিরশির....শিরশির....

উঁ ন্না না, অন্য মনস্ক হইনি। ঐ দেখুন, আপনার বাস
আসছে ভিড় হলেও উঠে পড়ুন। পরেরটার জন্য অপেক্ষার
এখন আর মানে হয় না।

মা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

এখন তোমাকে লংশটে
রাখি। আমি চিত্রনাট্য লিখি।
অস্বচ্ছ ধূসর মুখখানি
প্রায় এক শূন্যের প্রতিমা।
ক্লোজশটে তোমাকে আনার
বিন্দু ইচ্ছে নেই। এমনকি
মিডশটে তোমাকে ভাবি না।

অথচ শৈশব এসে পড়ে—
এসে পড়ে অভাবী কৈশোর—
তোমার আঁচল থেকে ঝরে
বৃষ্টিজল এবং কমলা।
ঘুমহীন রাত্রির উদ্বেগ।
এত চুপিচুপি এত কথা
বলতে পারে একমাত্র গাছ।
কিংবা তুমি। আমি তোমাকেই
এখন রেখেছি লংশটে।

ঠিক নারীটির কাছ থেকে
কখন এসেছি চলে দূরে।
আমাকে জড়িয়ে পণ্যলতা
বেড়ে ওঠে। পায়ের তলায়
অথচ আমার মাটি নেই।
আমি শূন্যে নক্ষত্র পল্লীতে
চিত্রনাট্য লিখি। তুমি বললে—
যেন সেই চুপিচুপি গাছ—
ওরে তুই ঘুমুতে যাবি না।

মা-কে খোলা চিঠি

মঞ্জুভাষ মিত্র

তুমি জন্মেছিলে পদ্মাতীরের গ্রামে
ঢাকার মেয়ে তুমি, বিয়ের পর গেলে ফরিদপুরে সেখানে তোমার শ্বশুরবাড়ি;
বিয়ের পর সাত বছর তোমার কোনো সন্তান হয়নি, তারপর আমার জন্ম,
শাশুড়ি ঠাকরুন তখন ভাবছিলেন ছেলের আবার বিয়ে দেবেন।
কিন্তু জন্মের পর প্রথম ছ'মাস তুমি আমাকে কোলে নাওনি,
পান করাওনি স্তন্য, তুমি অসুস্থ ভীষণ অসুস্থ
কলকাতা চলে গেলে চিকিৎসার জন্য।
তাই কি আমার বুকের ভিতর চিরদিনের অভিমান?
মনে হয় আমি যেন পরিত্যক্ত পথের ছেলে, মা তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারনি

তুব আমি ভিতরে ভিতরে ছিলাম ভালোবাসার কাঙাল।
তুমি ভাতের দলা মুখে তুলে দিতে, আমি ছুটে চলে যেতাম বারান্দায়;
কলকাতা শহরে বড় রাস্তার ধারে আমাদের বাড়ি—
মনে হয় এই তো সেদিন, তখন আমার বয়স ছিল চার কি পাঁচ।
তোমার মুখে তোমার জীবনের গল্প শুনেছিলাম,
একবার বর্ষাকালে খালবিল যখন একাকার তখন তুমি বালিকা
পুকুরে নাইতে নেমেছিলে আর তোমার দিকে স্রোতের মুখে
ভেসে আসছিল এক গোখরো সাপ!
বিয়ের কনে পাল্কি করে তুমি চলেছ পদ্মার বালি বিছানো পাড়ঘেঁসা পথ দিয়ে
পিছে পিছে ছুটে আসছে তোমার ছোট্ট ভাই—
তোমার বাবা মেলায় গেলে আবদার ধরতে
মাটির পুতুল আর চিনির মঠ কিনে আনার জন্য
যখন ছোট ছিলাম মনে পড়ে তুমি স্নান করে কপালে পরতে সিঁদুর,
তোমার সারা গা দিয়ে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোতো;
আমার কিশোর বয়সে তুমি উত্তর তিরিশ
ছোটখাট আর ফরসা আর গোলগাল গড়নের তুমি ছিলে লাজুক প্রকৃতির
মনে হয় তুমি নিজের প্রতি আস্থাহীনতায় ভুগতে।
রাত্রিবেলা শোবার সময় সারাদিন গৃহকাজ করা ক্লান্ত তুমি বলতে এই সময়টাই
সবচেয়ে আরামের; তোমার দু'পাশে আটবছরের আমি আর আমার ভাই—
তোমার ভ্রু বরাবর আমার হাতটা আড়াআড়ি করে রাখতাম,

আমার দিকে চোখটা যাতে ভাইয়ের দিকে না তাকায়।
মা, আমরা তোমাকে ভাগ করে নিয়েছিলাম

এখনো তোমার সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়
এখনো তোমার চেহারায় একটা সুছাঁদ ফুটে বেরোয়।
তোমার দুঃখ আমি বিয়ের পর তোমাদের সঙ্গে থাকিনি
তোমার দুঃখ আমি শিকড়-সংসারের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিনি;
মাঝে মধ্যে নিজেকে একটু অপরাধী অপরাধী লাগে।
তোমার দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্বামী এখনো জীবিত, তাঁর প্রতি
এখনো তোমার অনেক অভিযোগ—
মনে পড়ে তোমার পক্ষ নিয়ে কতদিন পিতার সঙ্গে ঝগড়া করেছি।
কিশোর বয়সে একবার কালীপুজোর সন্ধ্যায় বাজি বিস্ফোরণে
আমি রক্তাক্ত ও হতচেতন হয়ে গিয়েছিলাম
তুমি পাগলের মতো আমাকে কোলে করে ট্যাক্সিতে উঠেছিলে, গল্প শুনেছি
আর একবার যখন আমি দু'বছরের, পদ্মাতীরে স্টিমারে উঠতে গিয়ে আছাড় খেয়েছিলে
হাত থেকে পড়ে আমি অন্ধকার জলে তলিয়ে যাচ্ছিলাম, তুমি শেষ মুহূর্তে ধরে ছিলে।
আজ শুধু এইসব কথা মনে পড়ে

মা বলে ডাকো

পার্থ রাহা

আমাদের যাত্রা শুরুর দিনে
সবুজ নরম ঘাস হাওয়ার গানে গানে
হৃদয় খুলে দিয়েছিল
এখন অপেক্ষা আবহমানের অপেক্ষা
সে কোন দূরযানী নদী আর সাগরের গান

আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল
সবুজ মাঠে ঘন লোম ভরা হাতে
কপালে ঘামের বর্ষা
হলুদ ধানের স্তূপে কোমল পায়ের ছাপ
কালো কঠিন

সন্ধ্যা নামে আকাশের আলো কমে
ক্রমে অন্ধকার
মানুষ মানুষীরা ক্লান্ত পায়ে যে যার ঘরে
পাতা ছাওয়া
ছোট ভাঙা অন্ধকার মাখা
আলো কাঁপে আলো
কান পেতে শোন
এখনো হাওয়ার স্বরে 'হা-অন্ন, হা-অন্ন' আর্তনাদ

বহুদিন হয়ে গেল
এখন সোনা রং-এর ধান আশার আগুনে পোড়ে না
আমাদের যাত্রা শুরুর আগেই যাত্রা শেষ
এখন আর দেশকে 'মা' বলে ডাকি না

এই ত সময়
আর একবাব আকাশ সমুদ্র পর্বত
কেঁপে উঠুক
আর একবার
আমরা ডাক ছেড়ে 'মা' বলে ডাকি
মা-কে
মাটিকে আর
মা মাটি

জন্মভূমিকে ॥

মৃত্যুর সাগর পার হয়ে
দীপালি রায়

মৃত্যুর সাগর থেকে উঠে এলে মা আমার
আনন্দের অশ্রুজলে ধৌত করে রোগ ও বিষাদ
নীরব প্রশান্ত মুখে অপার যন্ত্রণা সয়ে
উঠে এলে মা আমার, পরাভবহরা।
উড্‌ল্যান্ডস্ নার্সিং হোমে সাদা দেয়ালেরা সব
ফিস ফাস্ করে—'এই নারী পঞ্চসপ্ততিতে
এত মনোবল কোথা পেল?
মৃত্যুর বিস্বাদ স্বাদ দেখেও দেখে না
ভয়হীনতার একি অপরূপ রূপ?'
ওটি, ছুরি-কাঁটা, ইথার, স্যালাইন
মরফিয়ার আচ্ছন্ন চেতনা, পার হয়ে
মা এখন সুস্থ নিরাপদ। ধূমল আকাশে
ভ্রূকুটিভয়াল কালপুরুষের ছায়া
পায়ে পায়ে পার হয়ে মা এখন, শান্ত আঙিনায়
শরৎ-শিউলি ঝরে মার চোখে সুরভি নির্যাসে।

ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী
সেতুপথে মৃত্যু তারে স্পর্শ করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।
সেবাগৃহে সাদা দেয়ালেরা সব ফিস্‌ফাস্ করে—
এই নারী মৃত্যুর দুয়ার ঠেলে অদীনা, অশোকা।

আবহমান বাংলা

যোগব্রত চক্রবর্তী

চলো যাই
চলো দেখে আসি
কি করে ভাইয়ের পাশে ভাই
রক্তে ভিজিয়ে দিচ্ছে মাটি
'চলো যাই চলো দেখে আসি।'

জন্মভূমি ছেড়ে আসা
কোন এক চৈত্রের দুপুরে
বহুকাল ব্যবধানে মা আমার দুয়ারে আবার....
আমি উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিই
মা বলেন অভিমানে :
এতকাল ভুলে থাকা কখনও কি ছেলেকে মানায়?

মায়ের চিঠি
কার্তিক মোদক

মা, তোমাকে অনেক দিন আগে চিঠি দিয়েছিলাম
ভোরের কুয়াশায় তখন কবরখানা ভিজে ছিল।
সবুজ জাজিমে ফুটেছিল নাম না জানা ছোট্ট ফুল,
কোথায় যেন দেখেছিলাম শৈশবে কালো মহিষ;
জল ছোঁয়া প্রজাপতি ছিন্নপাতার শিলান্যাস :
বাদলা পোকা, হ্যারিকেনের আলো ঘিরে থাকে সর্বক্ষণ
স্ক্রিপ্ট লেখা, তুলোট কাগজ ভিজে আসে চোখের পাতা।
দুধের বাটির শেষ চুমুক লাফ দিয়ে ফেলে আসি...
ভাঙা তোরঙ্গের পুঁটি মাসির ছেলেবেলার ছবি নিয়ে
কোথায় আমার নদী, যার ভেতর প্রবাহিত যৌবন!
মা, তোমাকে অনেকদিন আগে চিঠি দিয়েছিলাম
ভোরের কুয়াশায় তখন কবরখানা ভিজে ছিল।

মায়ের আকাশ

কালীকৃষ্ণ গুহ

১

যে আসতে চায় তাকে আনো, হে প্রকৃতি।

মায়ের আকাশ খুব বড়ো, মায়ের আকাশ
পূর্ণ ক'রে দাও।

আমাদের এখানে খুব স্বর লাগে, ভীষণ কুয়াশা লাগে

এখানে বৃক্ষ এবং স্তব্ধতার ভিতরে তাকে আনো, হে প্রকৃতি।
এখানে কুয়াশা এবং স্বরে খুব সাযুজ্য—
একটি দুটি অসল পাখি ওড়ে সারাদিন, সেই সাযুজ্যে

মায়ের আকাশ ঘিরে ভোর হয়, বারবার ভোর হয়।

২

হে প্রকৃতি, তাকে আনো। দিন তো যায়—

করুণা জাগে, ঘুম পায় খুব
এক প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে আকাশ ছেড়ে যায় রৌদ্রে, ভুবন ছায়

কোন্ ভোরবেলা জেগেছি, মাকে ঘিরে যখন ভোর হয়েছিল তখন জেগেছি
এখন শুধু রৌদ্র, সারাদিন রৌদ্র—

হে প্রকৃতি, তাকে আনো, মায়ের আকাশ খুব পূর্ণ করে দাও।

শ্রীচরণেষু মা-কে
মৃণাল বসুচৌধুরী

ঘুমোতে যাবার আগে
এখনও কি প্রতিদিন
নির্নিমেষ স্থির বসে থাকো
ভাঙা বাক্সে পড়ে থাকা
বিবর্ণ হলুদ ছবিগুলো
এখনও কি রঙিন কাঁথায়
সযত্নে সাজিয়ে রাখো পাশাপাশি

তোষকের তলা থেকে
পুরনো তাবিজ আর
ওষুধের শিশি নিয়ে
ডুবে থাকো অনন্ত বিষাদে
স্মৃতিহীন নিষ্ঠুর শহরে
খোলা বাবান্দায়
ঘুমোতে যাবার আগে
উদ্বেগ আশঙ্কা আর অবহেলা নিয়ে
আমিও নিশ্চুপ বসে থাকি
নিঃসঙ্গ ভ্রমণে ক্লান্ত
শরীরে মেধায় ধরে ঘুণ
রক্তচাপে জীর্ণ হয়
ক্রমশ পচনশীল শিরা উপশিরা
কালো মেঘ জমে ওঠে বুকের ভেতরে

নিজেরই অজান্তে আজ
পায়ে পায়ে বড় বেশি দূরত্ব বেড়েছে
ডাকো
অদৃশ্য সুতোর টানে এবার ফেরাও
অন্তহীন হাঁটা ভুলে
ঘুমিয়ে পড়ার আগে
স্নিগ্ধ স্বরলিপি নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতে দাও
ডাকো
শেষবার ডেকে নাও মায়াবী উঠোনে

একটা দরজা খোলা থাকে

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তবু একটা দরজা খোলা থাকে
সারাদিন, মাঝরাতে
যখন ফিরে আসে সে, দরজার কাঠ
লাথি মেরে ঘরে পৌঁছে দ্যায় তাকে, ছিট্‌কে বিছানা ছেড়ে
উঠে আসেন মা, জুতো খুলতে খুলতে জুতোর ভেতর
মোজা খুলতে খুলতে মোজার ভেতর থেকে উঠে আসে
পা, পায়ের হাড়
পায়ের চামড়া আলাদা আলাদা ভাবে
তার চোখের কোনায় থিক থিক করে জমে উঠতে থাকে জল
ভাতের থালার কাছে বসে সে দেখতে পায়
একটা ভাতকে ঠেলে নিয়ে চলেছে অন্য আরেক ভাত
আর তার মা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কখনো ঢুকে পড়ছেন
মাটির ভেতর, মাটি ফুঁড়ে
তার বিছানার পাশে শুয়ে থাকছেন পুরোনো দিনের মতো

মা অথবা প্রেমিকা স্মরণে

শামসের আনোয়ার

তোমাদের বাড়িতে ছিল না সীমান্তপ্রদেশ
কাঁটাতার, গুর্খা কিংবা গোলাবারুদ
প্রসূতি সদনের দ্বার খোলা ছিল রাত দুটো অবধি
তোমাদের মা সেদিন স্নেহে পাগলিনী প্রায়
ব্যাকুল বাঘিনীর মতো সাহসে তেজে আমায় স্তন্যপান করিয়েছিলে
আমার তৃষ্ণার কান্না তাঁর শুকনো বুকের
দুকুল ছাপিয়ে দুধের বান ডেকেছিল
অফুরন্ত হৃদয় ঝরেছিল দুচোখের পাতা বেয়ে
তোমরা যা পাওনি আমি পেয়েছি সে সবই
আমি তাঁর গর্ভের চোরাকুঠুরিতে ভ্রূণের মতো লুকিয়ে বেঁচেছি!
তোমাদের শরীরের পাতায় পাতায় আমি খুঁজেছি তারই রক্তের দাগ
বুকের মধ্যাহ্ন আকাশে যৌবনের দীপ্ত জ্বালা
আমি তোমার সবুজ তলপেট জরায়ু আর হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে
ফিরে পেতে চেয়েছিলাম স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ।
কুসুমিত স্তন দুটির কাছে প্রার্থনা ছিল
তোমরা মায়ের কৈশোরিক গোলাপের ঘ্রাণ
এই সুড়ঙ্গেতে আছে তাঁর বালিকাবেলার অব্যবহৃত চোরাকুঠুরি
অথচ তুমি কোনদিনই গর্ভধারণের মতো ঘনিষ্ঠ হলে না।

উলবোনা

প্রভাত চৌধুরী

অলিভ গ্রিন রঙের একটা ঘন উলের সোয়েটার উঠে আসছে
৫২-র শীতঋতু থেকে,
ছাতার শিক দিয়ে তৈরি দুটি উলবোনা কাঁটা
আপন মনে বুনে চলেছে সেই মহার্ঘ সোয়েটার—
এখনো প্রতিবার শীত আসার ঠিক আগে আগে
আমি দেখতে পাই সেই উলবোনা, এবং দুটি হাত
হাতের চঞ্চল কটি আঙুলের বয়ন-মুদ্রা
মমতাময় কোল থেকে গড়িয়ে পড়ছে উলের বল
কে কুড়িয়ে দেবে? আশেপাশে কে-ই বা আছে?
কেউ না দিলে সেই বল এমন এক গহ্বরে ঢুকে যাবে।
যেখানে সাপের খোলসের পাশে ঘুমিয়ে থাকে
কৃষ্ণপক্ষের নিদ্রাপ্রিয় কিছু শিশির।
আমি কি কুড়িয়ে দিয়েছিলাম সেই উলের বল?
সাপের খোলস তা জানে, কৃষ্ণপক্ষের শিশিরও তা জানে
আর জানে সেই মসৃণ দুটি হাত, যে হাতের আঙুলে ছিল
উলবোনা দুটি অহিংস কাঁটা

'মা, আমার শীত করছে কেন?'

হঠাৎ-ই সাদা শীতকে আড়াল করে। অলিভ গ্রিন উষ্ণতা।

গত জনমের কথা

রমা ঘোষ

নরম শ্যামল ঘন তৃণভূমি সিঙ্কোনা বন
ঢালু পথ সোনালি ফুলের দল পাহাড়িয়া স্রোত
হালকা মেঘের পায়ে ওই সব মায়া ভেঙে বেড়িয়েছি কত!
বিছনায় শুয়ে আছি, খুব জ্বর, গত জনমের কথা মনে পড়ে গেল।
ভোরবেলা ঘুম ভেঙে মা তুমি নদীতে নিয়ে যেতে,
ছোলার আবাদ তীরে, খেতে ঢুকে দুজনেই কচি দানা
চিবিয়ে খেতাম।
বাবার জন্য তুমি জমিয়ে রাখতে কিছু আঁচলের গিঁটে,
এলাচির ঘ্রাণ মাখা তোমার আঙুল আজও খেলা করে চোখে।

তোমার হাঁটুর থেকে কিছু উঁচু বেশি উঁচু নই,
সেই আমি ছোট মেয়ে বড় হতে শিখিনি এখনও।
এতো আলো, ও মুখের দিকে বুঝি বেশিক্ষণ পারি না তাকাতে।
গর্জন গাছের পায়ে ঠেস দিয়ে দুজনেই চুপ,
ঝোপে ঝাড়ে পাখি ডাকে, শেষে তুমিও শোনাতে নিচু স্বরে
পরিদের গান,
কবরখানার দিকে কেঁপে যেত শিরশির আবলুস পাতা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে কাঠ কেটে বাবা ফিরতেন,
সঙ্গে জোয়ার কিছু, বুনো ফল, মা'র জন্য প্রিয় কামরাঙা
মা কেমন হাসতেন, আর বাবা কুড়ল নামিয়ে
বলতেন, খুকি শোন, তোর জন্য এনেছি পালক।

কোমল ছায়ার পাখি নেমে আসে, শীতে ভার হাওয়া,
আমরা তিনটি প্রাণ হাঁটতে হাঁটতে
মাড়িয়ে যেতাম কত শুকনো পাতার ছবি, জ্যোৎস্নার ছবি।
গ্রামের শেষের বাড়ি আমাদের ছোট্ট কুঁড়েটি
আমরা তিনটি প্রাণ ক্রমশ নিবিড়।
আকাশে ফুটত তারা, খাওয়া শেষ, বিছানায় উষ্ণ আরামে,
কথা বলতে বলতে অবশেষে টুপ টুপ ডুবে যেত কথা।

মা-কে চিঠি

ধূর্জটি চন্দ

মা. এখন আমার কিছুই ভাল লাগছে না
সব কেমন ঝিমিয়ে আছে চারদিকে.
এবারে পৌষে শেষবার ওকে দেখেছিলাম
কেমন রোগা হয়ে গেছে, মা তোমার মনে পড়ছে ওকে?
আমি হাত ধরে স্কিপিং শিখিয়েছিলাম ওকে বোসেদের উঠোনে,
সেবারে সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেয়েছিলাম বলে তুমি মেরেছিলে,
আমি কেঁদেছিলাম, কিন্তু ও কাঁদেনি
লাফিয়ে পাঁচিলে উঠতে চেয়েছিল রাঙা আম পাড়বার লোভে,
আর সেই থেকেই শুরু হয়েছিল আমার যুদ্ধ,
জয়পরাজয়, অভিযান পৃথিবীর কাছে.
কিন্তু হঠাৎ কখন সুযোগ বুঝে চং চটকা হল
আমার সেই উদ্ধত আমি
আর আমি, ক্রমশ ভেজা ঘাসে পা রাখতে ভয় পাচ্ছি
না মৃত্যুর, না রক্তের, অথচ একটা মিশ্রিত স্বাদ
ঠোঁটের কোণে লেগে আছে—
সমগ্র পৃথিবীটা কেমন কালো—আরো কালো হয়ে যেতে থাকে
অথচ এই পৌষেই ওকে আর একবার দেখতে পেয়েছিলাম মা,
যেন বহুদিন বাদে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা—
কাঠবেরালী ধরবার জন্য দুরন্ত হয়ে উঠেছিল খুব।
আর তখুনি টের পেলাম, ও কেমন হাঁপাচ্ছে. কেমন রোগা হয়ে গেছে,
আর দ্যাখো, এই কলকাতা যাকে আমি টলটাতা বলতুম
কেমন পাথর হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ,
ঘষে দিচ্ছে বুক আগাপাশতলা
মা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে থাকতে
মা, আমার কিছু ভাল লাগছে না এখন।

সোনালি চুলের স্মৃতি

ভাস্কর চক্রবর্তী

মা বলতেন, কেন বাড়ি থাকিস না
আমি জানি। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর
মেঝেতে শুয়ে থাকতাম দুজনে। পাশেই
যে নদীটা বয়ে যেত
তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঝিমিয়ে এসেছিল।
সম্ভবত নীল রঙের একটা গান
ঘরছাড়া করত আমাকে, পথখরচ
থাকত সামান্যই, আমি
এ তল্লাট থেকে সে তল্লাটে ভেসে বেড়াতাম
আধকাপ কফির একটা দুপুর
বিকেলবেলার দুয়েক টুকরো ভাঙা স্বর
আজকাল ভাবি, হাওয়া
কোথা থেকে এসে কোথায় যায়! চওড়া লালপেড়ে
শাড়িটা পরে কে জানে কোথায় এখন
বিড়বিড় করছেন মা
থমথমে একটা তুফান আবার জট পাকাচ্ছে মাথায়
সব কথা কি লেখা যাবে কোনোদিন?

মা

শান্তি সিংহ

'মা'-নামের মাঝে আছে অনন্ত বিস্তৃতি
ইড়া-পিঙ্গলায় জাগে অনাহত ধ্বনি.
চরাচরে ভালোবাসা মিহিন বাতাস
ঝিরিঝিরি সুরে বলে : মা, আমার মা!

সমস্ত প্রাণীর মাঝে মমতার টান
কোন্ আদিকাল থেকে ভবিষ্যের দিকে,
সমস্ত প্রলয়-বাধা দুঃখ-অনটন
সহজে উজিয়ে যায় 'মা'-নামের গান!

আগে তো জননীবোধ, জায়াভাব পরে—
পুরুষের কাছে এই চিরসত্য কথা,
উচ্ছল যৌবন দিনে দ্বন্দ্ব-সমুচ্চয়
প্রেমিকার মাঝে তবু জেগে থাকে মা!

মা, আমার মা—এই অতিপ্রিয় কথা
অনাদ্যন্ত কাল ধরে মধুক্ষরা ধ্বনি,
নানা বিবর্তন মাঝে চিরকাল জুড়ে
শোক-তাপ নানা দুঃখে সন্তাপহরণী!

বড়নীলপুরের যাত্রী
কমল চক্রবর্তী

একটা গাছ থেকে পাতা খসে পড়ল 'মা'
একটা শালবনে দুপুরের 'মা' 'মা' হাওয়া
কোটি বছর ঢেউ ভাঙছে ঢেউ, শব্দ হচ্ছে 'মা' 'মা'।

একটা কাগজ ছিঁড়লুম
একটা শালিখ বসল চোদ্দনম্বরে
যেখানে পাখির নখে ছড়ে গেছে সিমেন্ট 'মা'
সূর্য উঠল ঐ টাইগার হিলের বরফ-চাঁদায়, 'মা'
নদী ঝাঁপ দিচ্ছে হাজার হাত নায়েগ্রায়, 'মা'
সোনার ঘড়ি, মা-মা-মা-মা...

কালো ট্রাঙ্কের গলাকাটা শুকনো ঠোঁটে একটাই অক্ষর
জাহাজ ডুবে গেল শেষ আর্তনাদ
মিনিটে চৌষট্টি হার্টবিট
ডিম ফেটে মুরগি জন্মাল

সব তোমার
তোমার হাজার জন্মের কবিতার খাতা নকল করে কোন লাভ হল না
একটাও নদী, ফুল, নক্ষত্রকে শেখাতে পারিনি অ-আ-ক-খ
শুধু শব্দ হয়েছে মা-মা-মা।
তুমি আমার গোপন মন্ত্র
দু একটা সিক্সথ জেনারেশন রাক্ষস ছাড়া কারো কাছে
যার খোঁজ নেই
বাক্স গোছানো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি
চারপাশে জামাকাপড়, ন্যাপথলিন, মরা-আরশোলা, জাল শেওড়াফুলি
শুধু একটা ডানা ঝটফট শব্দ, মা-মা-মা
অনেকদূর পাখিওয়ালাদের গ্রাম, বড়নীলপুর।

মা

পঙ্কজ সাহা

ওই যে মা বসে আছে
নীল রক্ত পায়ে
আঙুলে তরমুজের জল
গর্ভে দ্বিতীয়ার চাঁদ
ঠোঁটে বনতুলসী শ্রান্তি,

গোলাপি বেগুনি সমতলে
ঘিরে আছে জাফরানি জমি,
মা বসে আছে
অলখ ভগ্ন সবুজ শাড়িতে,
হিম সাদা হাতে
কেন ভোরের আবছা আলো!

মা থাকো

দেবারতি মিত্র

কলঘরে ভিজে মেঝে—-বসে বসে চুল ছড়িয়ে কাঁদি—
তাও যদি ছিঁড়ে যায় আমার একটিমাত্র রক্তের বন্ধন!
মা, তুমি দাঁড়িপাল্লার যেদিকে রয়েছে, তার অন্য দিকে ব্রহ্মাণ্ড
সম্পূর্ণ ওজনশূন্য, ফাঁকা।

সমুদ্র-ঝিনুকে জন্ম, পড়ে আছি শুয়োরের পায়ের কাদায়।
জন্ম ও কর্মের হাত পাল্লা কষে—
নীল বাষ্পে সব রক্তকোষ ফেটে যায়
আমি যেন আকাশের বহুতলা উঠে গেছি
আলোয় যেন চির আকস্মিক।
রাক্ষস খোক্কস নেই এই দেশে,
রাক্ষসের ছেলে এসে বলবে না—দেখা আলজিভ।

পরি চাঁদ টি দিয়েছে, আহ্লাদ-কাজল দেবে মেঘ,
মা-গান শুনতে শুনতে তারাদের মধ্যিখানে তারা হয়ে কাঁপি।
মা থাকো মা থাকো মা থাকো
পরলোক কোন্‌দিকে—সে জগতে
হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে একা অন্ধকারে হেঁটে
তোমাকে, যদি না খুঁজে পাই!

ডানাজন্ম

অজয় নাগ

চাঁদের অপর পিঠে বায়ু-পথের আটচল্লিশটা মুখ খুলে
তৈরি হয় পুনর্বার আপনারা—নাকি ছলনা দেহ জন্মের—
নাকি মৃত্যু-মৃত্যু খেলা...
এখন সর্বস্ব ডানা—প্রতিটি পালকের মধ্যে পালক-আকাঙ্ক্ষা

দূরে দূর-আলোর স্বপ্নগুলোর মৃত বর্ণের ঝর্ণা ঝরে প্রতি
যাত্রায়—ক্ষত বিক্ষত-জীবন বাইরের রক্ত গোপন করে...

প্রত্যেক বিত্তের নতুন বৃত্ত—আবার নতুন... বিত্তের
ভিতর প্রসাধন-প্রতিভা অটুট প্রতিযোগিতায় সময়কে ছেঁটে
আসবাব বানায়—মেঘেদের আরাম কেদারা
আমাকে কেউ দেখে না—কীট-দক্ষতায় নিজেকে নিভাঁজ রাখতে কালো শূন্যতায়
বুকের রক্তাক্ত আলো ঢেলে দিই

তখন কি আমার মনে পড়বে ছাতিম পাতায় ছাওয়া সরণি...
মনে পড়বে তোমাকে... কোথায় কোন আকাশের তারা মা আমার

কয়েকটি পঙ্‌ক্তির জন্যে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা লিখব বলে বসে আছি
একলা নির্জনে উদাসীন,
সাদা পাতা খোলা থাকে, কলম উদ্যত,
একটি পঙ্‌ক্তিরও তবু দেখা নেই—

অনেক শব্দ ছিল এককালে কোঁচড়ে-পকেটে ভর্তি,
অনেক শব্দ বুকের গভীরে নিহিত,
ছন্দের সিঁড়ি বেয়ে পায়ে-পায়ে উঠেছি পদ্যের মগডালে
খুঁজেছি নিজস্ব এক টাইপরাইটার একা-একা—

চুপচাপ বসে আছি, বসেই রয়েছি, চাঁদের রূপটি ধরে ক্রমে নেমে আসে রাত,
দেখি জ্যোৎস্নার রঙও এঁকেবেঁকে খেলা করে তিরতির জলে,
হাত নেড়ে ডেকে যায় অষ্টমীর রাঙাভাঙা চাঁদ,
আমি সাড়া দিতে গিয়ে অকস্মাৎ থমকে গিয়েছি—

এক অষ্টাদশী আমার নিকটে ছিল মৃতসঞ্জীবনী হয়ে
নির্জন রাতের ঘোরে দিয়েছে চুলের গন্ধ, ফোটা গোলাপের স্বাদ,
নির্জন জলার ধারে
সে আবারো ফিরে আসে সিকিভাঙা চাঁদের কল্যাণে—

শব্দ তোয়ের হয় একা-একা টাইপমেশিনে দিনরাত
খটাখট শব্দ হয় টাইপমেশিনে অবিরাম
শব্দ লাফিয়ে ওঠে টাইপমেশিনে অবিরাম।

কখন এসেছি ফেলে পুঁথিপাতারির দিন বেনে-বৌ, আশশ্যাওড়ার ঝোপ
বহু খোঁচাখুঁচি করে একটি শব্দ বিখ্যাত হয়নি কোনদিন,
সমস্ত শব্দ থেকে একদিন রেহাই নিয়েছি স্বেচ্ছায়,
অষ্টাদশী চলে গেছে যেখানে সবাই যায় বিবাহের পরে—

যেসব শব্দেরা নিরন্তর খোঁচ দিত, তারা আজ কেউ নেই,
সাদা পাতা খোলা থাকে, কলমুদ্যত,
কবিতা লেখ না তুমি ইদানীং   তবু এই নীরব প্রতীক্ষা
কয়েকটি পঙ্‌ক্তির খোঁজে,
যেন তারা এখানেই ছিল, আপাতত বনে গেছে
কাঠটাঠ কাঁধে বয়ে ফিববে এখুনি—

জুয়া

প্রদীপচন্দ্র বসু

অন্ধ খেলছি
একদিন দিয়ে শুরু
দিন ঘুরে যায়
অন্ধ খেলছি

তিনটি তো তাস
এই নিয়ে খেলা
কেউ কি জেনেছে
তিনটিই এক

অন্ধ খেলছি
যা এনেছি শেষ
এবার দিলাম
দিলাম সবুজ

এতেও হল না
অনন্ত পথ
সুখ ও অসুখ
অন্ধ খেলছি

অন্ধ খেলছি
চোখ খুলে রেখে
দিন ঘুরে যায়
ঘোলাটে আকাশ

অন্ধ খেলছি
বাজি শেষ হলে
রাত শেষ হয়
চোখ খুলে রেখে

এক ও শূন্য
চেয়ার টেবিল
যেই দান দিক
নাকি পরপর

বসেছি একলা
সঞ্চয় নেই
জমি ও বসত
বৃক্ষ প্রতিভা

ঠিক আছে নাও
গোপন ঠিকানা
ওষ্ঠের ভাষা
চাপ ধরে রেখে

অন্ধ খেলছি
চোখ বুজে আছি
মাস ও বছর
কৌতুক গাঢ়

অন্ধ খেলছি
আগুন না ছাই
তবুও খেলছি
অন্ধ খেলছি

মধ্যে জীবন
আগেই সাজানো
কোন ছকে আছে
অথবা রঙিন

বাতাস উড়ছে
তবুও খেলছি
শস্য খামার
পুকুরের ঢেউ

প্রিয়তমা নারী
কবিতার বই
চোখের দৃষ্টি
এখনো খেলছি

অন্ধ খেলছি
অন্ধ খেলছি
অন্ধ খেলছি
অন্ধ খেলছি

মাতৃনাম

সুব্রত রুদ্র

কেন মা শেখো না, গর্ভ হতে ভাসিয়ে দেওয়া সন্তান
মাতৃনাম মুখে করে থাকে না পৃথিবীতে

কোথায় হারালো মাতৃনাম একলা জলে
ভাসতে ভাসতে
কোথায় হারালো মাতৃনাম তাকালো না তীরের দিকে

কোথায় হারালো মাঠের কাঠামো একপাশে দাঁড়িয়ে

কোথায় হারালে মাতৃনাম কেটে খণ্ড খণ্ড করে?
দুটো ভাত বেড়ে দিতে পারে না জলতরঙ্গ ডাক?

আর যা নয় তাই কচি কচি মা ফলেছে
এখন এখানে সেখানে
খালি গা খালি পা মা ফলেছে
মশা মাছি মা ফলেছে
ছোটো গো-সাপ জলে নামছে মা ফলেছে
দারিদ্র্য অপমান ধমক আর গান মা ফলেছে

ইচ্ছে না থাকলে মা ফলেছে
কার।

যুধিষ্ঠির : কুন্তীকে

অমিতাভ গুপ্ত

কখনো ঝড়ের শব্দে জেগে উঠি, ধ্বংসগোধূলির
এই আভা, বিপর্যস্ত এই দুটি চোখে
আমাকে দেখে কি তার কথা মনে পড়ে?

উপচার, যজ্ঞবেদী, অগ্নিও প্রস্তুত
মেঘার্ত নদীর কাছে নগ্ন আমি, নিরঞ্জন আমি
তর্পণ প্রস্তুত তবু আমাকে কর্ণের কথা বলো

আমি কার প্রেতচ্ছায়া, কাকে তুমি মারো?

মা, আজ-ও
কৃষ্ণা বসু

আমার মা লণ্ঠনের মলিন আলোয়
বসে রয়েছেন, চারিপাশে আমাদের
ছেলেবেলাকার বইখাতা, ছড়াছবি,
স্লেট পেনসিল, কাচ কড়ার পুতুল...

আমাদের পৃথিবীকে ভাগ করে গেছে
যে বিষুব রেখা তার ওপারের থেকে
এপারে চলে এসেছে জীবন যাপন,
আমাদের ভাইবোনের সকলের
চুলের মেঘের মধ্যে চমকে উঠেছে
রুপোলি বিদ্যুৎ, মেঘ ডাকে মাঝে মাঝে,
ব্যক্তিগত ক্ষত থেকে নুন বর্ষা নামে,
ভাইবোন এখন আর পরস্পরকে
ঠিকঠাক চিনতে পারি না মনে হয়।
কিন্তু আমাদের মা আজও লণ্ঠনের
মলিন আলোয় কাঁথা বুনে চলেছেন,
লাল নীল খয়েরি ফুলের ফোঁড়ে ফোঁড়ে
ভরে যাচ্ছে মায়ের গায়ের গন্ধমাখা
পুরনো কাপড়, ভরে যাচ্ছে গেরস্থালি

এত দূরের থেকে চেনা যায় না তাঁকে।

সাংসারিক

দীপক রায়

চব্বিশ বছর পর ভেঙে গেল আর একবার।
চুয়াত্তর বছরের জীবনে শ্রীমতী পদ্মাদেবী
এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দেখলেন। একবার উনিশশো সত্তরে
—পঞ্চাশ বছরের প্রবল গৃহকর্ত্রী তিনি।
স্বামী জ্বলন্ত উনুনের গায়ে লাথি মেরে চলে এসেছিলেন।
সংসার দুলে উঠেছিল;

চব্বিশ বছর পর, আজ তিনদিন হল, তিন ছেলের পূর্ণ সংসার
পাউরুটি যেমন কাটা হয়, নিপুণ ছুরির ধারে
সেরকম তিন টুকরো হয়ে গেল। আর সকলেই সুখে রইল।

শুধু শ্রীমতী পদ্মাদেবী তিন টুকরো রুটি আর ধারালো
ছুরির দিকে চেয়ে থাকে।
টিভিতে খবর পড়া শুরু হল
উপমহাদেশে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে
অন্যমনস্ক তিন ছেলের সামনে
একবার ক্লিনটন একবার সাদ্দাম হোসেনের মুখ ভেসে ওঠে
আর পদ্মাদেবী শুধু এক ধারালো ছুরির কথা ভেবে
কেঁপে ওঠে

শ্রীচরণেষু মা'কে

রাণা চট্টোপাধ্যায়

তুমি আর হাঁটবে না মল্লিকপুরের পথে
তুমি আর ভাববে না একা-একা খোকা তো এলো না
চলে গেল দু'টো রবিবার!
সবই ছিল ভবিতব্য সবই ছিল দায় গুরুভার?

ওই তো তেমনি আছে স্থির গাছগুলি
মাঠে ছিল ধুলো, আজ জলে বানভাসি,
ধানের চারারা বুঝি তাকিয়েছে মুখগুলি তুলি
মারা গেছে একা-একা সতী, প্রিয় কৃষ্ণ দাসী!
মাটির ঠাকুর ফেলে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ভেজা আষাঢ়ের নবম দিবসে
'নব দিনমণি উঠিবে আবার' বুঝি হরষে?

ওই পথে আমিও যাব না আর
তুমিও ঘুরবে না মাগো এ-বাড়ি ও-বাড়ি
চিবুক ছোঁবে না কেউ ফ্যাকাশে আঙুলে
চলে গেলে দুঃখসহা রাজ রাজেশ্বরী!
কতো অসহায় ছিলে জীবনের শেষ কটা বছর জননী
হাঁপানির টান আর বক্ বক্ সমস্ত রজনী
পাশের ঘরেতে ছিলে একটানা বুঝি আটমাস?
তারপর চলে গেলে মল্লিকপুরেতে তুমি অহঙ্কারী হাঁস
কেন, কেউ জানে?
পাঁচজন নিজেদের মতো করে নিয়ে মানে
আড়ালেতে দোষ দেয় আজো কেন তোমার পুত্রকে
মেলাতে পারেনি সে যে জীবনের বিচিত্র সূত্রকে

আজ চাই অপার্থিব সেই লোকে
শ্রীচরণেষু মা'কে লিখি ব্যর্থতার চিঠি
কেন যে এখন হয় দুঃখ-তাপ-শোকে
প্রতিবাদ জানাতে চেয়ে উর্ধ্বাকাশে ছুড়ি বৃথা মুঠি!
তুমি তো গিয়েছো চলে সকলেই যায়
আমরাও যাবো—
বেঁচে থাকা বুঝি আজ নিদারুণ দায়
আগামী জন্ম পাবো?

যদি পাই, কোনদিন, সে জন্মেও জননী হয়ো তুমি
সবই তো পূরণ হবে ভেঙে যাবে কতো ঝুমঝুমি
মায়ের বিকল্প নেই, মাতৃহারা সন্তান ছাড়া কেউ কি বোঝে মা?
মা'কি খুব দুঃখ পায়, সন্তান যখন তার দিতে শেখে হামা!

ঘুণাক্ষরে
রণজিৎ দাশ

একটি সাঁওতাল মেয়ে জঙ্গলে প্রসব করে
জঙ্গলেই ফেলে রেখে গিয়েছে আমাকে

পোকামাকড়ের মুখে একথা জেনেছি, আমি
দেখেছে এসব কথা ঘুণাক্ষরে লেখা আছে গাছের শাখায়

পাদ্রি ও বণিক আসে, নিঃশব্দে টহল দেয় সমস্ত জঙ্গল
ধাতুর ভাষায় তারা কথা বলে, মনে হয় আমাকেই খোঁজে

লুকিয়ে ছিলাম আমি ঝর্নার আড়ালে, নগ্ন হয়ে
এখনো লুকিয়ে আছি ঝর্নার আড়ালে, নগ্ন হয়ে

কেউ দেখে ভয় পায়, কেউ বলে জলের দেবতা
কৌতূহল দেখালেই প্রচণ্ড পাথর ছুড়ে মারি

পোকামাকড়ের মুখে শুনেছি আমার মা, সাঁওতাল মেয়েটি
খুব নাকি কেঁদেছিল, দেখেছি সেসব কথা
ঘুণাক্ষরে লেখা আছে গাছের শাখায়

মা

বীরেন সাহা

আকাশ তেমনি আছে—
এই নদী তোমার ভীষণ চেনা
এই মাটি জুড়ে তোমার চাওয়ার চিহ্ন এখনো ছড়ানো,
আছে প্রাণময় তাপ—
বাতাসের সুধা,
যা তুমি দিয়েছ
আঁচলের শিশুর দুহাতে

সব কিছু দিয়ে ভিখিরির মতো
শুয়েছ কৃতঘ্ন চিতায় মাগো,
এত আলো এত তাপ
তবু তো আঁধার ঘোচে না

বিশাল জলের ধারা শীর্ণখাদ বেয়ে
বয়ে যায় নিরবধি,
নারকেল পাতার ফাঁকে
সূর্য যায়, চাঁদ যায়
কাছে থেকে দূরে উদাসী সময়
অকরুণ উপেক্ষায় চলে যায় সরে,
তোমার গভীর মায়া টেনে নিয়ে আসে কাছে
বুকে নিয়ে দেয় রক্ষামন্ত্র অক্ষয় অম্লান
মধুময় মাটি জুড়ে

মাটিতে পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলে মাগো
শুয়েছ অনন্ত চিতায়,
ওড়ে নদীপাড়ে নির্মম খরবালি
ঢেকে দেয় তোমার মমতাভেজা
সবুজের আশ্চর্য রচনা
তোমার শিশুর হাতে
দাওনি নিরঙ্কুশ ব্যথা
রিক্ত হাতে কী নেবে অঞ্জলি

আকাশ তেমনি আছে
এই নদী তোমার করুণার জলে পূর্ণ হয়ে যায়
নিভৃত আকাশে মাগো দুঃখ জ্বলে ধিকিধিকি।

গভীর
জয়া মিত্র

মায়ের কথা মনে করলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বড়ো জলাশয়ের কিনারে কলাগাছের ছায়া। ঘন লম্বা। পাতা শাড়ির আঁচলের মত ঝুলে পড়েছে দুলে উঠছে। অথচ আমার মা কখনও আঁচল দোলাবার, ঘোমটা পরা বৌমানুষ হয়ে উঠবার সময় তো পাননি।

আবার নজর করে দেখি জলের মধ্যে। যেন এক দরজার ছায়া জেগে ওঠে। কে আমাকে বলে ওর মধ্যে দিয়ে চলে যাও ওখানে তোমার ছেলেবেলা আছে, ভাইবোনরা আছে। ওখানে তোমার মা আছেন

আর আমি দেখি একজন মানুষ জল হয়ে আর দরজা হয়ে আর ছায়া হয়ে আমার ভিতরে ডাক দেয়
কথা বলে

আমার মা
শ্যামলকান্তি দাশ

আমাদের ভাঙা দরজা পাহারা দেয়
গ্রহ-উপগ্রহ।

বাবা রাত জেগে আকাশের লেখা পড়ে

সওদাগরের মেয়ে আমার মা, এখন বনে বনে
ঘাসপাতা কুড়োয়।

কুড়নো ঘাসপাতায় আগুন রচনা করে
আমাদের জনমদুখী ভাই
ক্ষুদিরাম।

আর সেই আগুনে জ্বলে-পুড়ে সোনা হয়ে ওঠে
আমার হতভাগিনী দিদি
অপরূপা।

রাত শেষ হওয়ার আগে আমাদের এই হবিবপুর গ্রামে
শূন্য থেকে উড়ে আসেন
সুন্দর।

তখন আমাদের এই মেঘমেদুর কুটির
চাঁদের আলোয় ভেসে যায়।

মা

সুমিত্রা দত্তচৌধুরী

তোমার দক্ষিণ হাত রাখো মাথার ওপরে
মা আমার বড় ভয় করে
এই পৃথিবীর এত বেশি আলো
আমার সর্বাঙ্গে আগুনের আঁচসম জ্বলে
আমার সত্য থেকে আমি প্রতিদিন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাই
আমার প্রেম থেকে আমি প্রতিনিয়তই সত্যভঙ্গ করি
আমার আত্মার প্রার্থিত মুখ ছাই ওড়া প্রান্তরে হারিয়ে যায়
সবুজ ফসলে জেগে থাকে নষ্ট কীটের গোপন ছবি

ঐ শীর্ণ আঙুল থেকে আজ শান্তি ঝরে থাকে
চিরকাল আমি যেন কারো সন্তান হয়ে থাকি,
তোমার দক্ষিণ হাত রাখ মাথার ওপরে
মা আমার বড় ভয় করে॥

বাণরাজপুর
একরাম আলি

পথ সোজা—দুদিকে বিশাল সব কুঞ্জ
দ্বীপভূমি—ডাইনে-বাঁয়ে আড়াআড়ি পথ
এত যে ছড়ানো রোদ, তার সামান্যই
গায়ে লাগে—বাদবাকি অনঘ, উদ্বৃত্ত

সারি সারি আম্রবৃক্ষ পাকা ফলে ভরা
দুপুরের ঝিম থেকে কেউ জেগে ওঠো
প্রথম পুনর্জীবন, প্রথম এ-হাঁটা
গাছভর্তি হে আলস্য, পাতা অবনত

বাঁদিকে ঘুরেছে—টানা উষ্ণ বনাঞ্চল
পুষ্করিণী, গাছপালা—সমস্ত কিছুর
আড়ালে যক্ষের গুপ্ত শক্তির প্রকাশ
আড়ালে প্রথম থেকে কেউ-বা দেখছে

আরশি ধরো, তাকে তার বিনাশ দেখাও
বলো যে, প্রভুর দেহ ভক্ষিত হয়েছে
দেখতে চাইলে এই জল, প্রাচ্য পুষ্করিণী
নিজেকে উগরে দিয়ে উদর দেখাবে

দেখতে চাও? দেখ, জলতলে পাথরের
কৃষ্ণমুখ—গুল্মে ঢাকা দাঁতের শিলায়

পচা, গলা অস্ত্রের টুকরো লেগে আছে

দ্বীপভূমি—ডাইনে-বাঁয়ে নবতম পথ...

শুরু হল অভিভূত মুখর বাজার
মাছের থেকেও বড় মাছ-কাটা বঁটি
ধারালো তোরণ—এসো মাছের ভিতরে
আঁশটে টাকা, রক্ত-মাখা খুচরো লাফায়
হৃৎপিণ্ডে লাফায় রক্ত—চর্বি, পিত্ত, নালি
বঁটি থেকে পিছলে যায় নিরয়-পাতালে

দ্বীপভূমি—সামনে তবু নব নব পথ
দুদিকে বিশাল সব কুঞ্জ, বনস্পতি
সব পথই পুরনো পথের অনুবৃত্তি
শুধু ভ্রম সংশোধন — যেমন আড়ালে
প্রথম দিনটি থেকে কেউ-বা হাঁটছে

অপরূপ ভূখণ্ড
রতনতনু ঘাটী

মনে করুন, রাজারামপুর মৌজার গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে একটি নদী,
নদীর নাম আগুনভাষা।
আগুনভাষার বান মাধবের মার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল বলে
সে আর কখনও নদীমুখো হয়নি।
নদীর মানে তার কাছে উঁচকপালি মেয়ের অলক্ষণ।

আব্বাসের মা ফতেমাবিবির আবার নদীর প্রতি খুব টান।
আগুনভাষার জলে প্রতি বছর বান এলে
তবেই তার উঁচু জমিতে আবাদের জল ওঠে।

গঞ্জের ছেলে আমি, নদী আমার ইচকিমিচকি খেলার সঙ্গী।
এরকম এক নদীতে আমি একদিন নৌকো ভাসালাম।

তারপর নদীতে ভাসতে ভাসতে কুড়িয়ে পেলাম

বিধু সামন্তের আইবুড়ো মেয়ের লাশ,
কলার মান্দাসে ভেসে যাওয়া মাটির মনসামূর্তি।
গত পরশু ডুবে যাওয়া যাত্রীবোঝাই নৌকোর
নিখোঁজ কিশোরীটির ছেঁড়া লাল ফ্রক 'মা' বলে ডেকে উঠল যেন!
এমন আর্ত মা-ডাক আমি কখনও শুনিনি।

ভাসতে ভাসতে আমি নদীর দু'পার দেখছি।
দেখছি, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে—
মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম,
জেলার পর জেলা—
হুমড়ি খেয়ে আমাকে দেখছে কাতারে কাতারে মানুষ,
মনুষ্যসমাজ, জনপদ।
মাটির রং চিনে-চিনে এগিয়ে চলেছি আমি।
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, তামিলনাড়ু,
কেরল, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, রাজস্থান,
রাজ্যের পর রাজ্য দেখছি—

নানা বর্ণের মানুষ ভিড় করছে নদীর দু'পারে
নানা রঙের লোকাচার—
ছেলের মুখেভাত, মেয়ের বিয়ে, বাবার অন্ত্যেষ্টি।
দেখছি মথুরা, লুম্বিনী, নালন্দা, চাইবাসা, দ্বারকা,
কন্যাকুমারী, বিকানির—
দেখছি, আর দু'চোখ ভরে উঠছে মুগ্ধতায়।

ভাসতে ভাসতে আমি শুনছি
মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা, মসজিদের আজান, গির্জার ঘণ্টাধ্বনি।
গোমতী, নর্মদা, তাপ্তী, গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী—
সমস্ত নদীর স্রোত এসে মিলিত হচ্ছে একটি স্রোতে।
আর বিন্দুর চেয়েও ছোট একটি নৌকোয়
ভাসতে ভাসতে আমি দেখছি—
এক অপরূপ ভূখণ্ডের ছায়া পড়েছে জলে।

ঠিক কোনখানে

প্রমোদ বসু

মা, ঠিক কোনখানে ব্যথা লাগছে বলো,
ব্যবহারে, নাকি অসুখে তোমার?
সকাল থেকে কেঁপে উঠছে ঠোঁট, অথচ
সত্য বড় দেরিতে জন্মায়!

কোনখানে ব্যথা লাগছে বলো,
সন্তানে, না সংসারে তোমার?

হাওয়া এসে গুটিয়ে দিচ্ছে চাদর,
আলো এসে খেলা করছে আজ,
তবু চোখের আলোয় কেন এত অন্ধকার!

কোনখানে ব্যথা লাগছে বলো,
কেঁদে উঠি একবার।

মা আর উন্মাদপুত্র
জয় গোস্বামী

অন্ধকার পরমহংস, লতাপাতায় ঢাকা,
দিঘির ধারে পরমহংস, দিঘিবনের পাড়ে
গাছের নীচে বাড়িটি কত আড়াল দিয়ে রাখা
বনের ছাদে দাঁড়িয়ে কেউ উঁকি দিতেও পারে

অন্ধকার পরমহংস, শ্যাওলাভেজা পাখা
মগজে লাল ধুলোর স্তূপ, নিঃশ্বাসেও বালি
ওড়াও নেই সাঁতারও নেই মাটি কিংবা টাকা
দিঘির ধারে আপনমনে শ্লোক বলছে খালি

অহোরাত্র দিবসনিশি সূর্যচাঁদ ঘিরে
পাক খাচ্ছে দিঘি ও বন, দিঘির ধারে বাড়ি
বাসিন্দা তো মা আর ছেলে, মায়ের ছেঁড়া নাড়ি
ছেলের এখন প্রৌঢ় বয়স, চাঁদ পড়েছে শিরে

চাঁদ পড়েছে, ফেটেও গ্যাছে, মগজ ধুলো ঢাকা
মা রাঁধছেন সন্ধেবেলা, শোকের দিকে ফিরে
মা শুতে যান ঠাকুরঘরে—
তক্তপোষ ফাঁকা!
ছেলে কোথায়? ছেলে কোথায়?
গাছপালার ভিড়ে

জোনাক জ্বলে থোকায় থোকায়, রাত্রি চলে ধীরে
লণ্ঠনের আলোয় এই বাড়িটি পায় পাখা
উড়ে বেড়ায় আকাশে তার ডানায় তারা ঢাকা

ঘুম আসেনি, মা শুয়েছেন মেঝেয় পাশ ফিরে

মাথাখারাপ পরমহংস একা দিঘির তীরে....

অনির্বাণ

অনীশ ঘোষ

একটা বহুদিনের সাজানো ছবিকে সে
ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে নিভৃতে
ছড়ানো স্মৃতির টুকরোয় রক্তাক্ত সে নিজেও
ভেঙেছে হাঁটু মুড়ে চৈত্রের বিকেলে;
এখন তার ক্ষয়াটে চোখের নীচে শুকনো
জলের দাগ, কাঠফাটা ঠোঁট আর কেঁপেও ওঠে না
চারদিকে পড়ে থাকে নষ্ট ফসল....

সে শুধু দেখে তার ছেলেরা মেয়েরা
যৌবনকে সম্মান করতে শেখেনি কখনও
এক অনন্ত লড়াইয়ের মাঠে তারা
একে অন্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধি শানিয়েছে
কখনও গুটিয়েছে আত্মরক্ষায় নিজেরই ভেতরে
কেন্নোর মতো।

সাপের জিভের মতো ভিজে অন্ধকারের
ভেতরে দাঁড়িয়ে তবু এক মা সন্তানের মঙ্গলে
অনির্বাণ প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে শীর্ণ বুকে...

কালো দৃষ্টি ভরে
কালোবরণ পাড়ুই

বাইরে তাকালে রোদে ভেতরে অন্ধকারে পড়া যায় না কবিতা
যতক্ষণ চোখ ছিল ঘরের দেয়ালে, কড়িকাঠে, আলনার পাশে
তানপুরার
সাদা কাগজের পৃষ্ঠা ভরে ছিল অজয় সম্পদে, স্পষ্ট লেখায়
পথ ছিল শাখা-প্রশাখায় ভরা গাছের শরীর ছিল অন্ধ
অতলে;
চা নিয়ে যে ঢুকেছে সেও কিছু আলো এনে চোখে ঢেলে দিল
কবিতা পড়ার থেকে লেখায় আগ্রহী হই ভেতরে ভেতরে
খড় ছুঁয়ে রোদ নামে টালি ছুঁয়ে রোদ্দ নাচে চালের ওপরে।
চোখ বন্ধ করে এখন কবিতা পড়ার জন্য অন্ধকার দূর করে
লাভ কী
বরং কথার কিছু রূপের কালোর কিছু চায়ের কশের সঙ্গে
পান করে
ধন্য হয়ে যাই; যাই—ধারে কাছের সব বুকে, আবছা ছায়ায়
যারা আলো হয়ে ঢুকে এসে অন্ধকার মেখে ফিরে যায়—
তেমন বোনের হাতে পকোড়া ও মাখামুড়ি জ্বল জ্বল করে;
মুখের কথাটি তার অযুত বছর ধরে ইতিহাস ধৌত হয়ে
আসে।
কবিতার লিপি ফেলে কবিতার কথা কিছু আমাদের ঘরে ঘরে
হয়
নিতান্ত অন্ধকারে সেই সব বাঁকগুলি বাইরে তাকিয়ে আমি
রৌদ্রে ডুবিয়ে চোখ পড়তে পেরেছি লেখা কালো দৃষ্টি
ভরে।

চোখ
নির্মল হালদার

মায়ের চোখ খুঁজতে হাসপাতালে গেছি, চোখ নেই
মায়ের চোখের আলো খুঁজতে
চ্যাং মাছ মাগুর মাছ ধরতে গেছি, মাছ নেই
তীর-ধনুক নিয়ে পাখির চোখ লক্ষ্য করেছি, পাখির চোখ
মায়ের চোখে বসাবো

মা আবার ছেঁড়া শাড়ির পাড় থেকে সুতো টেনে টেনে
অনেক রঙের সুতো জড়ো করবে
কাঁথা সেলাই করবে ছেঁড়া জামা সেলাই করবে,
কাঁথায় শুয়ে আমরা স্বপ্ন দেখবো

ছোটো ভাইটা বলে উঠলো : দাদা, পাখির চোখ
মায়ের চোখে বসালে, মা আকাশের দিকেই
চেয়ে থাকবে
আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বলবে না,
কিরে খিদে পেয়েছে

জান্নাত

রফিক উল ইসলাম

মা চলে গেলে খেতে ডাকার থাকে না কেউ। এই শূন্যকথা জান্নাতবাসীর
কানে কানে পৌঁছেছে!

শিশিরে ভেজা কবরখানা মাড়িয়ে নীচে নামতেই দেখলুম ছেলেটিকে। সমগ্র
হাহাকারের ভেতর কেমন যেন বাকরুদ্ধ সে। মরা মাছের মতন তার
চোখদুটি বন্দরপারের চিমনির ধোঁয়ায় অসম্ভব কিছু খুঁজছে। কিছুতেই
ফিরবে না আর; এই অদ্ভুত আলোয়, সূক্ষ্ম রেখাচিত্র ছাড়া কিছুই
জেগে থাকবে না আর!

দূর প্রবাসে পড়ে আছে শিশুপুত্রটি তার—যাকে খেতে ডাকার থাকলো
না কেউ। শুধু এই সঞ্চয়ে, জান্নাতের দরোজার দিকে হেঁটে যাচ্ছে এক স্বেচ্ছাচারী
মা। তার পায়ের নীচে তীক্ষ্ণ রেশমসুতোর পথ। আর পাতাল ফুঁড়ে উঠে
আসছে আগুন। জিব্রাইল, তুমি কি স্তব্ধতা কুড়োবে আজ!

মা আমার

বৃন্দাবন দাস

যত গুরু-কথা বলি,
কিংবা অযথা,
সবই তার কাছে উৎসব,
সবই মহার্ঘ ধ্বনির ভাঁড়ার;

গোটা পৃথিবী শুয়ে এখন
কঠিন অসুখে,
একমাত্র সে-ই জানে—
সন্তান তার, মরতে শেখেনি;

খরা হোক, ঝঞ্ঝা হোক,
হাড়কাঁপানো শীত,—
বিজন দাওয়ায়, নিঝুম রাতেও
একাকী. নিপুণ,
শীর্ণ হাতে, আঁধার তাড়ায়—
শুধু, আমারই জন্যে।

আশ্রয়

চিত্রা লাহিড়ী

তোমার সমগ্র চরাচর জুড়ে বাজছে ঝম্‌ঝম আলোর বাজনা
ভ্রমণে বেরোল যেখানে উৎসব শাসিত সাঁওতালি সমাজ,
সোনাঝুরি জঙ্গল
যেখানে আশ্রয় খুঁজে পায় পরিজন-চ্যুত এই নির্জন প্রাণ
ফুলের পোশাক ও ঘুমের সঙ্গীত ভেসে ওঠে শরীরের হ্রদে
আর আমি প্রখর রৌদ্রে দাউ দাউ পুড়তে পুড়তে
তোমাকেই ঘর বলে ভাবি।

বৃষ্টির পৃথিবীতে ভিজতে ভিজতে
নৌকোর পাল খুলে ভাসিয়ে দিই ছিন্ন বাতাসে
জলে তোমার এত মায়া—উঠে আসে নুড়ি ও শ্যাওলার সবুজ
ঘোর বর্ষায় বার বার ফিরে আসি শীতল ডাঙায়
ভেজা মাটিতে জলাশয় আঁকি, শকট, কুটির আঁকি
নতুন আগুনের ঘ্রাণ, জুঁইফুল আর মৎস বিবাহ এইসব

এইসব আঁকতে আঁকতে অপরূপ বন্ধনে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ি
আরো এক রহস্যঘন জলের ভিতর।

সমুদ্রগুপ্ত এবং তার বীণা

মৃদুল দাশগুপ্ত

ছড়িয়েছি, কিন্তু শিকড়হীন; মা বলেন, শান্তি পাবি না;
ছড়িয়েছি, মৃদুল এই মীনরাশি ভয়ঙ্কর জলে, স্রোতে গাঢ়
ফসফরাস, ঢেউয়ের অপর প্রান্তে প্রভু কেউ, তিনি কি সামন্ত রাজা
—দূর থেকে পাণ্ডববর্জিত ভাবি, এই সব ভাবি;
—কে কাকে খাবো, আমি মদ নাকি ঐ মদ-ই আমাকে, ভাবি,
কবে যে আপেল গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মরে যাবো, ভাবি,
নিজেকে বিশদ আরো খুলে ফেলি, বাতাস ছড়াই, জল ছুঁড়ি
এই পাপী শরীরের লোহা;
মেডুলায় এক প্রান্ত, স্নায়ুগুলি, অন্যপ্রান্ত পায়ের আঙুল বেঁধে
নিজেকে বাজাই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বীণা, সাতমাত্রা, সুরগুলি
উড়ে কি ছড়িয়ে গেলে, মা আমার,
ফেরাতে পারি না

জীবন দেবতা

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি ছোট্ট শব্দ
কতো বড় মাত্রা নিয়ে আসে
আমাদের সবার জীবনে...
আমরা তা জানি
জানে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গও।
আসলে 'দেবতা' বলে যদি কিছু থাকে...
তিনি 'মা'
অন্য কেউ নন।

সন্তান-বাৎসল্যে যিনি বুঝিয়ে দেন—
কতো কষ্টে একটা জীবন!

মা

সুজিত সরকার

সকলেই গেট খুলে ঢুকি
শব্দ হয়

ঘরের ভিতরে বসে
শব্দ শুনে
মা ঠিক বুঝতে পারে
কে এসেছে

সকলেই
যে যার নিজের মতো গেট খুলি

পাগল, আমি-১৮
ধীমান চক্রবর্তী

পাখির ঠোঁটের ভিতর বাসা বেঁধেছে
কিছু গান। জানলা দিয়ে দেখি
মা-তার সন্তানদের গান খাওয়ায়,
ডানা ঠুকরে বার করে বৃষ্টির টুকরো।
ওই বৃষ্টিতে পাগল, আমি
ধাওয়া করি চাবুক-উপগ্রহের ছড়।
সেই সুর আঁচড়ে দেয় সমস্ত
বাসিন্দার চুল, তারা একে অপরেতে
ঢলে যায়। রিকশা থেকে নামে
সাদা জামা ও দর্জি, মুখভর্তি
রঙবেরঙ চক ও আলপিন নিয়ে, এই
জেলখানার ডাইনিং টেব্‌লে বসে
খায় কিছু হাঁস ও চোরা চালানকারী।
রাত হলে জেগে থাকে শুধু
সুস্থ মানুষেরা এখানে, তিন বছরের
উপর কোনও কথা বলেনি;—
তারা গান শোনায় পাখিদের, ধীরে
ধীরে মা খুলে ফেলে জিভের ব্যাজে
আলপিনের আলোয় দাঁড়িয়ে।

মা

ব্রত চক্রবর্তী

আমার মা-কে দেখি। ছোট্ট, শান্ত, অসহায়। আমাকে
ভয় আর সমীহ্ করে। আমার ভাবুক রহস্যময়তাকে সন্দেহ
করে, সহ্য করতে পারে না। অথচ ভালবাসে। চোখের
আড়াল হলেই ভয় পায়, কাঁপে। উদাসীনভাবে লেখার কথা
ভাবলেই মা ভাবে সংসারের বাইরে আছে এমন কোনও
প্রিয়মানুষের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছি। অথচ মা-র
পরোক্ষ প্রেরণাই আমাকে বাঁচায়। মাঝে মাঝে মনে হয়
কিছুদিনের জন্য লেখা বন্ধ করে, আমি কেবল মা-র জন্য
কিছু কাজ করি। সংসারের কাজ।

নৈতিক নির্দেশনামা
অনন্য রায়

তোমাকে বলেছি, জন্ম দিও না দিও না জন্ম এবং আমাকে
অপ্রয়োজনীয় আমি ও-রকম হবো না কখনো বন্দি বীভৎসতায়
জরায়ুর নোংরা স্ফীত অন্ধকারে গুঁড়ো গুঁড়ো চাঁদ
বসে আছো তুমি মৃত্যু—হলুদ শৃঙ্খল, ভালোবাসা
ভাঙা বোতলের স্তব্ধ অবয়বে মানুষের নশ্বর প্রচ্ছায়া
এবং সভ্যতা যেন জিরাফের সন্ত্রস্ত জিগীষা।
কিছুই লাগে না ভালো, সবকিছু এ্যাতো বেশি নিয়মমাফিক
সব হাস্যকর, মিথ্যা, নিরর্থক ধারাবাহিকতা
দুর্গন্ধ কাদার, লুপ্ত টিনশেড, বেশ্যালয়ে, কয়েদখানায়
দুধের মতন সাদা পাপবৃত্তি আমাদের শুদ্ধ করে যেন
টর্চলাইটের মতো গোয়েন্দা উৎকণ্ঠা এক ত্রস্ত ভৌতকামী
স্খলিত কুকুর হয়ে দৌড়ে গ্যালো দূর শালবনে—
বিদেশী চতুর আমি ক্লাউনের মতো হাল্কা গৃহে বেলুনের ফাঁপা রঙিন নাস্তিক ওড়াউড়ি
মৃত নচিকেতার ভণ্ডামি থেকে সঠিক অনেক।

তোমাকে বলেছি, জন্ম দিও না দিও না জন্ম এবং আমাকে,
নির্জনতা মানুষের মহত্তম পাপ ও বিস্ময় পবিত্রতা
যেমন কুমারী চায় ব্যক্তিগত নীলপদ্ম চকমকি নুড়ি ও পাথর
যেন প্রেম গভীর হ্রদের নীচে স্বতঃপ্রণোদিত প্রবঞ্চনা
পচা উদ্ভিদের গন্ধ—গর্ভের নিষ্ঠুর পরিহাস ঘিন্‌ঘিনে।
নৈতিক প্রহরী করে রেখেছে আমায় এই ত্রস্ত নিশ্চেতনে।
পাহাড়ের আঁকাবাঁকা অজানা কুয়াশা ভরা পথ দিয়ে হবে উঠে যেতে
যেখানে নিশ্চিত মৃত্যু যেন সম্ভাবনার সম্রাট
যেখানে ড্রামের শব্দে মৃত্যু যেন তীব্র অস্বীকার
পিচ্ছিল ভ্রূণের মতো অন্যায়ের মতো মূঢ় গতানুগতিক
তুমি যাও লেলিহান নারকী গহিনে যেন উচ্ছ্রিত দেবদূত
ঘনান্ধকারের মতো প্রবল উজ্জ্বল তুমি স্তব্ধ জুনিপার—
জন্ম দিও না দিও না জন্ম এবং আমাকে।
পৃথিবী কচ্ছপ যেন, শুয়ে আছে উঁচু হয়ে, পিঠে গোল বিমূঢ় আকাশ।
ঋতুর সৌগন্ধ ভুলতে মেয়েদের দীর্ঘকাল ভয়ঙ্কর লাগে

অনেক মৌমাছি যেন্নি নিসর্গের মতো কাঁদে সূর্যের আলোয়
প্রত্যেক মন্দির মৃত ঈশ্বরের হাস্যকর বিরহে যেন কাঁদে নায়িকার মতো
সমুদ্রের শব্দ আমি তেমনি শুনেছি টিনফুডের ভেতর—
তুমি যাও ফ্যাক্টরিতে বিছানায়, হিম ইউরেনাসে নেপচুনে
সমস্ত ভাষাকে দেখবে আমিষাশী বৃশ্চিকের ধূসর যকৃতে।
ক্রুশবিদ্ধ যিশু আর নিটোলিত ভেনাসের উজ্জ্বল সঙ্গম
বেঁচে থাকা
আত্মাভুক ছিন্নমস্তা এবং মরচে-পড়া পেরেকের গর্হিত সংলাপ
বেঁচে থাকা
নির্ভুল রোবট আর ভ্রষ্ট প্রাকৃতিক ট্যান্টালাসের প্রতীকে কররেখার চিৎকার
বেঁচে থাকা
বরং ক্রিকেট খেলবো—না ডুবে খোঁজার মতো ভণ্ডের বিষাদে
প্রেমের থেকেও ন্যাকা কিছু নেই আর হাস্যকর নিমজ্জিত
এবং সঙ্গম ভালো তবু জন্ম দিও না আমাকে ঈশ্বরিতা
অনেক অনেক জ্বালা অনেক যন্ত্রণা পেয়ে আমি আজ নৃশংস পাথর
পচা ঘা কুষ্ঠের ক্রিয়া জঘন্য তরল রক্ত প্রসব-অন্যায়ে
অনাকার স্বাভাবিক আমি বকধার্মিক করুণ তামাসা।

মানুষের দুঃখ শোক মোহগ্রস্ত স্মৃতি কাতরতা
নস্যাৎ করেছি হা-হা আমার নৈতিক স্বেচ্ছাচারে
যদিও চিন্তায় হলে অ্যানথ্রপোসেনট্রিক পাবো সার্থকতা কিংবা মৃত দীর্ঘ অমরতা
তবুও কী লাভ জন্মে ও জীবনে?—যদি প্রতিদানে পাই অন্তিম শূন্যতা
পারমাণবিক মৃত্যুর বিকারে?

এক পৌরাণিক দেবীর গল্প

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

এক চন্দন-ঘষা রাতে ছোট্ট পুতুলের মতো
এই পৃথিবীতে বেড়াতে এলেন মা।
শেকলের গোলাকার দোলনাগুলি
হাওয়ার হাতে একটু মজার দোল দিতে দিতে
তিনি চলেছেন, চলেছেন, চলেছেন....

গোমেদবর্ণ একটি চৌকো বাড়ির খেজুর গাছে
ডাঁশা খেজুরের ওপর হঠাৎ একটি পাখি এসে বসলো,
মা খেলাচ্ছলে ঢুকে পড়লেন সেই বাড়িতে।
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিদের মতো রেশমলাল চুল পুড়ে গেল,
ওপল পাথরের সাদা চামড়া কুঁচকে গেল,
বাড়িটির জানলার দিকে তিনি ছুটে গেলেন
আইকন বাতির আলো জ্বলা পথটি
আর দেখতে পেলেন না,
যে পথ দিয়ে তিনি পৃথিবীতে নেমেছিলেন।
গোমেদবাড়ির দরজাগুলিও কখন নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেছে!
ক্রমে ক্রমে তিনি স্বামী পেলেন, কুৎসিত বর্ণের কিছু সন্তান।
তিনি অপর্ণার মতো তপস্যা শুরু করলেন।
তারপর একদিন আকাশে আবার আইকন বাতির পথ তৈরি হলো।
তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ একদিন চলে গেলেন।

মা

সুব্রত সরকার

ছেলেদের মুখে কোথাও মায়ের একটু অংশ থেকে যায়,
অপরাধ করে এলেও মা এসে পিছনে হাঁটুমুড়ে বসেন, যেমন গৌতমী--
সিদ্ধার্থ যখন শিষ্যদের ধনরত্ন উপহার দিতে ডাকতেন :
কাছে গিয়ে হাওয়া করতেন তিনি, আর শিষ্যেরা মনে ভাবতো
প্রভুর মাথার পিছনে আজ জ্যোতির্বলয় দেখা দিয়েছে।
রাত্রিবেলা আসরের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আমি যখন
বাড়িতে ফিরি—পথে ঐরকম এক জ্যোতির্বলয়-কে
দেখতে পাই আসছে, আসলে সুন্দর বা কুৎসিত কোনো ছেলেকেই ছেড়ে
মা বেশিক্ষণ দূরে থাকতে পারে না, আর মায়ের কষ্ট হবে বলে
ছেলেরাও অসভ্য মাতাল বা জটাজুটধারী ঋষি হয় না।

অদ্ভুত দূরত্বে
কাজল চক্রবর্তী

শুধু দেখি মাঘী পূর্ণিমার রাত ভরে উঠছে জলে
তুমি সেই জলে ডুব সাঁতার দিচ্ছ—আর অজস্র
ডুবো পাথরের ঘায়ে জর্জরিত তোমার অস্তিত্ব।

আমি ছুঁতে পারিনা অদ্ভুত দূরত্ব। ডুবো পাথর
সরাতে সরাতে ক্লান্ত হয়ে, বুক ভ'রে শ্বাস নিতে
উঠে আসি জলতল ছেড়ে প্রতিশ্রুত সংসারে।

আমরা দুজনেই উভচর হয়ে উঠছি ক্রমশ। খাদ্য তালিকা
থেকে বাদ যাচ্ছে আমাদের প্রিয় খাদ্য প্রতিদিন। একমাত্র
ছোট্ট মেয়েটিকে আদর করতে গিয়ে পাচ্ছি তোমার ঘ্রাণ—।

আমরা দুজনেই নিজস্ব অভিমানে স্থির। মাঘী পূর্ণিমার
রাত ভ'রে উঠছে জলে। তোমার রক্তে ক্রমবর্ধমান আমি
দেখছি আমাদের আহত অস্তিত্ব হাঁটছে সটান--অদ্ভুত দূরত্বে।

অঞ্জলির কথা

সুবোধ সরকার

নদিয়া বাংলাদেশ সীমান্তের একটা গ্রাম।
অঞ্জলির বয়স উনিশ
তার তিনটে বাচ্চা, খেতে পায় না, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়
তার স্বামী জমি নিয়ে মারামারি করে
গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে
কিন্তু অঞ্জলির পেটে চার নম্বর বাচ্চা
ঠিক সেই দিন তার পৃথিবীতে বেরিয়ে আসার কথা

যে দিন ম্যানিলায় সুস্মিতা সেন মিস্ ইউনিভার্স হলেন
সুস্মিতা, অভিনন্দন আপনাকে
আপনার পরিবারের সবার জন্য শুভেচ্ছা
এতো নিষ্পাপ আপনার হাসি, এই দুঃখের পৃথিবীতে
এতো নিষ্পাপ হলো কী করে?
কিন্তু আপনি এ কী বললেন?
একটা মেয়ের পূর্ণতা মাতৃত্বে?
সে তার সন্তানকে অন্যদের ভালবাসতে শেখায়?

অঞ্জলির তিনটে সন্তান
আরও একটা এসে গেল
কি শেখাবে তাদের?
ক্ষুধার্ত মা ক্ষুধার্ত সন্তানকে কি শেখায়?
অঞ্জলি তার বড় মেয়েটাকে মালদার বাজারে গিয়ে বিক্রি করবে
বড় ছেলেটাকে লাগাবে চায়ের দোকানে
ছোটটাকে শেখাবে পাশের বাড়ি ঢুকে হাঁড়ি ভাঙতে
আর যে আজ জন্মালো
সে কয়েকবছর বাদে মায়ের গলা টিপে ধরে বলবে
'আমাকে তুই জন্ম দিয়েছিস কেন? খেতে দে, হারামি'।

মা ছেলেকে তখনি অন্যদের ভালবাসতে শেখায়
যখন সে ছেলেকে খেতে দিতে পারে, স্কুলে দিতে পারে
কটা মা সেটা পারে?
সুস্মিতা, অভিনন্দন আপনাকে
আপনার জন্য প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আসবে ভারতবর্ষে
ডলার, ডয়েশমার্ক, ইয়েন....
কিন্তু চারটি সন্তানের মা অঞ্জলির হাতে
ওই টাকার একটা টুকরোও কি পৌঁছবে কোনদিন?

কর্ণ

কুমারেশ চক্রবর্তী

না ডাকার না শোনার রাত ছিল সেটা—
আমরা কেউ কাউকে ডাকিনি, শুনিনি।
মাথার উপরে গুমোট থেমেছিল
তর্জনী উঁচিয়ে আসা ঝড়
আমাদের চারপাশে ছিল নানা বয়সের কৌতূহলী চোখ
এবং নানা শব্দে—
এই সতী সাবিত্রীর দেশে এ বেজন্মা কেন!
তখন, তুমিও আমাকে ছেড়ে গেলে একা—মনে পড়ে?

অন্ধকার জেনেছি। মেখেছি কুরুক্ষেত্রের ব্যঙ্গ, তামাশা।
জেনে গেছি, একই উচ্চারণের না-উচ্চারিত কিছু অংশ
কী ভয়ঙ্কর....! কী ভয়ঙ্কর ....!
প্রায় সব দেখা শোনার ভেতরেই কিছু অংশ
কীভাবে ফুটো করে বাড়ি, প্রিয় বাড়ির লোকজন!

আমাকে নিয়ে কেউ কোনো চরিত্র আঁকে না
আমাকে নিয়ে কেউ কোনো ঘরের ছবিও লেখে না
লোকগণনায় আমার জন্যে কোনো সংখ্যা নেই
তবু এখন, আমি একটানা তোমাকে ডেকে যেতে পারি
আমি একটানা তোমাকে লিখে যেতে পারি
মা মাগো মা আমার.....
আমাকে বারণ করবে কে?

আমিই ডাকঘর। আমিই ডাকটিকিট। আমিই ডাকপিওন।

পোড়া শহর

নাসের হোসেন

হাঃ রহস্য! ফের ঘুরে এলি এ কলমের নিবে!
তোর বুকে হৃদয়ে নেই—রহস্য
ফিরে এলি সেই আবার পোড়া শহর...চারিদিকে
খাঁ খাঁ পুড়ে যাচ্ছে মানুষের কঙ্কাল, হীরক যন্ত্রপাতি—
বৃক্ষহীন শাখাপ্রশাখাহীন পাতাহীন ফুলহীন
এই রুক্ষ প্রান্তর—কী নিবি এখানে তুই—
ঘ্রাণ—ঘ্রাণ চাস তুই মাটির? নিতে পারিস
বারুদের ঝাঁঝ—
আর ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে
রক্তিম ভূখণ্ড, পাথর—
পেতে পারিস কয়েকটি অঙ্গার...
এবার অন্তত চশমাটা খুলে ফ্যাল—ছিঁড়ে ফ্যাল
আবরণ—চল্ ছুটে—
খোঁজ, ডাক্, মা, মা আমার কোথায়,
কোথায় তুমি—
তারপর ফাঁকা, শূন্য আওয়াজ হেঁটে চল্—
আর
সঙ্গে যে হাত আছে তার দিকে চেয়ে বল্ :
সেই তো নিজেকে ছিঁড়ে দিলি শয়তান,
এতদিন তবে ঢেকে ছিলি কেন?

পদ্মসম্ভবা
রামকিশোর ভট্টাচার্য

আমি আর সোনালি আকাশ
মাঝখানে চন্দন পা
তাকেই আজ রেখেছি সাদা কাগজের ওপর,
আলতা ছোঁয়ায় সমস্ত বলয় পদ্মসম্ভবা
ঘুমগানে ভিজে উঠছে আমার ঈশপ দুপুর

জানালা পেরিয়ে
ঝুমঝুম রাত মেখে কত পরম্পরা ভেসে এলো
কেউ সাদা, কেউ বা ঝলমল বর্ণপরিচয়
ওদেরই দু'হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে আমার জন্মভ্রম।
আমার মাথাধরা, অসুখগন্ধের কয়েকটি দিন—
গা ঘেঁষে হেঁটে যায় বসন্তের আগে
এ ভিজে চোখকে কি ভয় দেখাতে ওরা!
হাত বাড়াচ্ছি—
সমস্ত দিনটাই জুড়ে আছে
পিতৃতন্ত্রের বলিরেখাগুলি

তরুণ কবির মা-কে

পিনাকী ঠাকুর

[জানো, মামাবাড়ি গেলে এখনও জাহাজ, দেখা যায়?]

মালা বেচে ফিরে এলে? অনেক শীতের কাজ বাকি?
পাতাটি খসিয়ে দিয়ে রাতে নিত্য মশারি খাটানো?
প্রতি সোয়েটার থেকে আড়াই টাকার গ্রীষ্ম জমিয়ে জমিয়ে
যার জন্যে তুলে রাখো সে তোমার দগ্ধ হাড়মাস
সে তোমাকে কালি ক'রে লিখে গেছে মাছ, ঘুড়ি,
জলসায় ভাই হারিয়ে আসা...
অনেক গদ্যাংশ বাকি / জাহাজ দেখার শীত আজ
চলেছে অকালপক্ক ছাতাপড়া শিঙাড়ার লোভে!

মালা বিক্রি করে যাকে খারাপ বাসোনা, আয় ঘুম-এ
সে বলছে : শীতের পর পরাবে তো চন্দনের সাজ?

গল্প লেখার মা-কে
নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আগুন রাঙা অন্ধকারে ছড়িয়ে আছে তোমার ভাঙা মুখের ছবি,
তোমার ঘরে ফেরার পথে শববাহকের বাজনা, সবুজ সুরের আলোয়
ঝলসে ওঠে খিদে; নিজের পুত্র, পিতা, স্বামী, মৃত শিশুর মুখের
আদল দেখে সুখ পেয়েছে? জন্ম নেবার আগেই যাকে নুন চেনালে?

মা গো, তোমার মাংস কেটে বেচব, আমার ভাবতে মোটেও ভয় করে না
কে তোমাকে ডাইনি ডেকে ঢিল ছুড়ছে, বিষ্ঠা বমি নিষ্ঠীবনের আলকাতরায়
আমি তো মুখ ঘুরিয়ে রাখি, অমন করে চেয়ে রয়েছ, ভয় পেয়েছ?
তোমার অমল অন্ধকারে ভীষণ ঋণী, নুন শেখালে, চোখ ফোটালে—

ভয় তো শোকের চন্দ্রাতপে কঙ্কালী কলঙ্করেখায় জড়িয়ে আছে
লিঙ্গমূলে, মুখ ও পিঠের চাবুক দাগে, আমার তবু শোক হলো না
শববাহকের সবুজ আলোয় সেতুর গাঢ় স্মৃতির গন্ধ উপচে যেতেই
মা গো, আমি তোমার ঘৃণায় আগুন রাঙা অন্ধকারে প্রাণ পেয়েছি

সেতুর ছায়ায়, চন্দ্রাতপে, জীবন, আমার মরণমায়া, বাহান্ন পীঠ—
তোমার ছেঁড়া মুখের ছবি সত্যি ভালোবাসতে পেলাম, দেখতে পেলে?

পথের প্রতি

অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র

হে পথ, ছেলেদের ফুটবল মাঠের পাশ দিয়ে,
বক্রগ্রীব দ্বিচক্রযান পরিত্যাগ করে তার প্রেমিকার গৃহে
প্রবিষ্ট যে যুবক,
তার পরিত্যক্ত যানের পাশ দিয়ে,
বিষয়ী ধোসাবিক্রেতার উদাস আহ্বানধ্বনির পাশ দিয়ে,
তীব্র প্রথম পুষ্পে আচ্ছন্ন গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়াগুলির পাশ দিয়ে,
উজ্জ্বল বাজার চত্বরের পুঞ্জিত, উৎসাহিত নরনারীবৃন্দের
পাশ দিয়ে
আমিও কেবলি তোমার মতো চলে যেতে চেয়েছিলাম সম্মুখে,
আরও সম্মুখে—
একা, আপনার সঙ্গীতে
আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জকে সাক্ষী রেখে
হেড্রনগুলি কতগুলি কোয়ার্ক দিয়ে নির্মিত, সে কৌতূহল
আমার ছিল না
ছিল না ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত সম্প্রদায়নাম নিয়ে শিরঃপীড়া
তবু আজ আমি এই ক্ষুদ্র গৃহে, গৃহস্থ

হে পথ, আমার স্ত্রী বর্তমান, পুত্র আগত প্রায়
হয়তো তোমারও ঈর্ষা হয়।

পালন

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ভাতসরা দিয়ে চলে আসার পরও তোমাকে
অন্নপূর্ণা ভেবেছি। একবারও ফিরে না তাকিয়ে তাই জানি
আজ ডোমবালকের মচ্ছব

জল ও ঘাটসংলগ্ন গাছের কুটিলতা মিশিয়ে নেয় অন্ধকার,
পাখপাখালির ডাক। মরচেপড়া চাবির ছোঁয়া বাঁচিয়ে
তোমার সাদা হাড় দূরে চলে যায় খুব
আমি একে-একে বুঝে নিই অশ্রুপাত, আগুন, ভয় ও
ক্ষয়ে-যাওয়া ধাপগুলিকে

ইলিউশন অব রিয়ালিটি

জহর সেনমজুমদার

ইলিউশন অর রিয়ালিটি
ঘুমোতে পারছি না। গলা, শুকিয়ে গেছে। উঠে বসে
হাঁফাই। মা, এক গেলাস জল দাও তো। মা
জল নিয়ে আসে। আমি চুমুকু দিতে গিয়ে চমকে
যাই। গেলাসের জলে ছোট্ট হয়ে মা। ভুল দেখছি।
ঢক্ ঢক্ করে সব জল শেষ করে শুয়ে পড়ি।
তারপর বিকেল। বোন এসে বলে, মাকে দেখেছিস?
বলি—না তো। একটু পরেই বাবা মা'র নাম ধরে
ডেকে ডেকে বিরক্ত। কোথায় যে যায়। ছোটো
ভাইটাও এ-ঘর ও-ঘর ঘুর ঘুর করছে। হঠাৎ
তখনই মনে পড়ে গেলো, জল খাবার সময়
গেলাসের মধ্যেই তো মাকে দেখেছি। তা হলে,
তা হলে কি আমিই জলের সঙ্গে মা'কে খেয়ে ফেললাম?
কাউকে বলতে পারি না। শুধু ছটফট করি আর
আড়ালে বমি করবার চেষ্টা করি। কিন্তু বমি
করা কি অতো সহজ? রাত বাড়তে থাকে। আমি
নাভির কাছটায় টোকা মারি। মা, মা। সাড়া নেই।
শুনেছিলাম, মা ও ছেলের নাড়ির সম্পর্ক। মনে পড়ে,
ছোটবেলায় একবার আধুলি খেয়ে ফেলেছিলাম।
কলা খেয়ে মলদ্বার দিয়ে সে বার হয়েছিল।
তবে কি তবে কি মাকে ওইভাবে একবার
চেষ্টা করে দেখবো? ছি ছি। মা'কে মলদ্বার দিয়ে
নামাবো? ভাবছি কি করে? এইসব ভেবে ভেবে
যখন কাহিল, তখনই শুনলাম, ক্ষীণস্বরে কোনো
দূর প্রবহমান দূর থেকে মা বলছে—গলা
শুকিয়ে গেছে রে। ঘুমোতে পারছি না। এক গেলাস
জল দিবি?

মা, তোমাকে

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

মাটি-ফাটা রোদে নামিয়েছিলে বর্ষা
শয়তানের সামনেও বুক পেতে দাঁড়ানোর
বিষয়গুলো শিখিয়েছিলে;
শুধুই চলতে চলতে কত খেয়ালি অভিশাপ পান করেছি,
খেয়েছি সততার শাখাপ্রশাখা।
সারাদিন অক্লান্ত স্পর্শসুখ বিনিয়োগ,
মাতাল জীবন অনেকটা খণ্ডচিত্র;
এ-সময়ে চুপিসাড়ে খুঁজি মা তোমার হাতখানি,
ঐ হাতখানি বুকের ওপর রামধনু এঁকে দিত,
ভুল হয়, আজও খোঁজা-শৈশবের গন্ধ-মাখানো আঁচল।
তোমার হাতের বেড়ে দেওয়া নুনভাত, কাঁচালঙ্কা
আজীবন না-ভোলা-বেদনা জাগিয়ে রাখে।
তবু বল কী সুখ আছে ঐ সাদা থানে?
কার মহিমা প্রচার কর তুমি?
এখনো প্রহর জাগি, সাঁকো পার হই—
মা, তোমাকে ধরে অনূর্ধ্ব-চল্লিশেও।

মা

মল্লিকা সেনগুপ্ত

মা শুনলে ভেসে ওঠে সিঁদুরের টিপ
লাল পেড়ে শাড়ি, কোলে দুধের সন্তান
যামিনী রায়ের ছবি, সে তো তুমি নও!
কোথায় লুকিয়ে আছ অন্তরালে, রক্তমাংসময়ী?

মা হওয়া মুখের কথা নয়
হাসিমুখে টিপ সেজে যিনি ঠিক বেছে নেন
শিশুযোগ্য হরলিক্স, বেবি সফ্‌ট পণ্য রাশি রাশি
সে তো শুধু বিজ্ঞাপন টিং টং স্বপ্নের বাজার!

শিশুর আঙুল ধরে মা চলেছে ইস্কুলে ইস্কুলে
মুখ ধোয়া, ছুঁচু করা, পেনসিল কেনা—মা চলেছে
বাবা শুধু মাঝে মাঝে নিয়ে যায় চিড়িয়াখানায়
প্রতিটি মায়ের মুখে খুঁজে দেখি জননী তোমাকে
'হাসিমুখে সব সয় সেই তো জননী'
হাজার বছর ধরে শুনে শুনে কান পচে গেল
কে বলেছে সব সইবার দায় শুধুই মায়ের?
মাতৃত্ব মহান যদি কুকুরী মায়ের গায়ে ঢিল কে মেরেছে!
ডাস্টবিনে কার শিশু কুকুরীর স্নেহে বেঁচে ওঠে!

মায়ের গা থেকে যতো অতিকথা কবিতা কল্পনা
পলেস্তারা খুলে ফেলে দেখ, তারও রক্তে উত্তাপ
তারও বুকে ধক্‌ধক্ করে হৃদরোগ, প্রণয়ের ভাষা
মাতৃহত্যা মনে পড়ে ওরেস্টেস, পরশুরামের!
জঠরে দেবকী তুমি পালনে যশোদা হতে হবে
গার্ডিয়ানশিপ তবু এই রাষ্ট্র তোমাকে দিল না

মায়ের পেটের মধ্যে তিলে তিলে ন'মাস ন'দিন
হোমোসেপিয়েনগুলি বেড়ে উঠে ভুলে যায় তাকে।

মনে আছে, মা?

প্রবালকুমার বসু

কুড়িয়ে আমাকে পেয়েছিল কিছু সৈনিক
খোলা মাঠে নীল আকাশ যেখানে দড়
সেদিন সে-রাতে বিভীষিকা অনিমিষ
সেই রাত ছিল পৃথিবীর থেকে বড়

আমার জন্ম হয়েছিল সেই রাতে
পিটুলির জলে খিদে মিটেছিল ভোরে
এ-সকল কথা জেনেছি যে ছলনাতে
সে-রাত আমার কেটেছিল ক্যাম্পঘরে

সেদিন সে-রাতে মা'র মুখ মনে নেই
জেনেছি আমার মা'র নাম কালরাত্রি
বাবা ছিল মেঘে বহতা অনীক বিদ্যুৎ
এদেশে দুজনে হয়েছিল শরণার্থী

এখনো এ-দেশে রাত্তির নেমে এলে
জন্মের কথা মনে পড়ে ক্যাম্পঘর
তারপর থেকে বেয়োনেটে কুলে কুলে
ভেঙেছি শিবির শরণার্থীর ঘর

ওদের কখনো মানুষ বলেই ভাবিনি
মানুষ আমাকে করেছিল কিছু সৈনিক
কালরাত্রি ছিল যে আমার জননী—
জীবনে অবোধ একা একা তাই নৈঋত

হাত বাড়ালেই ঝলসে যাব

তপন দে

তোমার রাঙা চোখের আড়ালেই তোমাকে দেখে নিলাম
এক ঝলক
আর দেখলাম সেখানে নানান রঙের আগুন খেলা করছে
হাত বাড়ালেই ঝলসে যাব, এইবুঝে কিছুকাল স্থির থেকে
আবার ছুটলাম সেই নির্জন আশ্রয়ের সন্ধানে
কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পেয়ে হলুদ হয়ে গেল চোখের পাতা
বিবর্ণ হয়ে গেল এই মন, ধূসর হয়ে গেল এই দেহ
আমার থ্যাৎলানো আত্মা
বাঁচতে শেখার ভাষাটাই শেষে অন্ধ হয়ে গেল একদিন—
একদিন একদিন.....
ঠুনকো রঙিন কাচপাত্রের মত ভেঙে গেলাম
অনেক পথ, আর অনেক জীবন পার হয়ে
আবার জন্ম নিলাম এই মায়ের শরীর থেকে

আত্মপক্ষ বললেও
চিত্তরঞ্জন হীরা

.মিতা মানে মিত্রপক্ষ লিখে দিয়েই আত্মবমনে
ঝুঁকে পড়লেন কবি।
মিতা শব্দের মধ্যেই সেই গানের শূন্যতা, সঙ্গদোষ
হারিয়ে যেতে দেখল অসংখ্য চরিত্রহননের উপমাকে।

আর আত্মপক্ষ বললেও ইদানীং ঝন্ ঝন্ বেজে উঠছে
উপহার কাচপাত্রগুলি
সমস্ত বন্ধুবাসর অমিত্রাক্ষরে গেয়ে উঠছে প্রেম
একটি নিঃসঙ্গতার বিনোদন।

বাহান্ন প্রত্যঙ্গ কখনো দুশো ছয় হাড় খুলে
অবিরাম নরম অনুষঙ্গ
ঝরে পড়ে কুয়াশার মত,
তবু হৃদয় বিভক্তিহীন।
জানি তুমিও তো সাঁইত্রিশটি আত্মার সঙ্গে
যোগ বিয়োগ খেলে
এতদিনে সিদ্ধ হয়েছ আত্মক্রীড়ায়।

জানি, শেষ পর্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট হল এই একাকী জীবন...

শ্রীচরণেষু মা

দীপশিখা পোদ্দার

আমাকে ভূমিষ্ঠ করেছ তুমি, নাকি আমি নিজেই
ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছি!
আমাকে ছুঁয়েছে জল, নাকি আমি নিজেই
লক্ষ্যহীন ভেসে ভেসে ছুঁয়েছি প্লাবন!
কে প্রথম তুমি আমাকে বলনি।
আমাকে চিনেছে রাত্রি, নাকি আমি
রাত্রিকে চিনে চিনে ভেঙেছি অন্ধকারের পরিসীমা!
কে প্রথম তুমি আমাকে বলনি।
আমাকে বলনি ঠিক কতখানি পাখা মেলে—
আকাশে উড়বো আমি
কতটা সহজ হলে আমার নিজস্ব হবে অনন্ত আকাশ
তুমি আমাকে বলনি।

মাতৃলব্ধ নয় পাখা, তবু আমি পেয়ে গেছি পাখির জীবন।
রপ্ত হয়ে গেছে ক্রমে—
মাটির বসতি ছেড়ে শূন্যে ভাসার অভিযান।
তবু, যেহেতু তোমার মুখ দেখিনি কখনও
যেহেতু মাতৃচ্ছায়া তরু-তমালের মত আমাকে ঘেরেনি
যেহেতু সমস্ত স্বপ্ন শৈশবেই চুরি হয়ে গেছে
আমাকে আমার করে তাই বুঝি চিনতে চায়নি রোদ
সুনীল বাতাস গাছের পাতায় এসে—
অভিমানে ফিরে গেছে একা....

মা আমার, এখনো অনেক পথ যেতে হবে
বাঁকে বাঁকে এত মেঘ, অন্ধকার!

আমার কপালে কোন কাজলের টিপ নেই।

চিঠি—'মা'কে

সুমনা সান্যাল

মা, এখন ওসব কথা লিখতে বসে হাত কাঁপছে। বিশ্বাস করো—
এখন ওসব মনেও পড়ে না। সেই কবে চলে গ্যাছে চোদ্দশ এক—
বইমেলা—মহীনের ঘোড়াগুলি—একচল্লিশ নম্বর টেবিলে বন্দিমুক্তি
দুপুর দুই ঘটিকায় আর কবিতায় নয়-এর দশক—এখন ভুলেও
গেছি রাজনের সেইসব গান—শুধু মনে পড়ে গিল্ড অফিস একটু একটু...
(না গো, 'একটু' না, এখনো স-ব কিছু মুখস্থ বলতে পারি)—
ও এসে দাঁড়ালো জানুয়ারি আটাশ—
আর জানো, তক্ষুনি সব কিছু মুছে গ্যালো.....মাঠভর্তি লোক—যেন
কেউ কোত্থাও নেই—হ্যাঁগো মা, তুমিও নেই—রাজপুত্তুর—
সিঁথির মোড়....কোথায় উধাও...মাথার ভেতর খালি নীল শার্ট তখন—
....সব নীল... সেই মুহূর্তে আমি সামান্য মেয়ে কালোকুচ্ছিত—যেই
ওর চোখে চোখ রেখেছি...অমনি সোনার কাঠি রুপোর কাঠি...
আমার সরু সরু হাত পা গুলোতে জোর এল....বুক কোমর সব যেন
তোমার বাপের বাড়ির মধুমতী...সত্যি বলছি...সব কালো মুছে গ্যালো
লাল আলো...নীল....আলো
কত রঙমশাল...মা, ও মেঘের মতো
আমাকে ঢেকে নিল....তারপর আর কিছু তুমি জানো না.... জানো না
কী ভীষণভাবে ডুবে আছি....তারপর....মা....তুমি জানো না....
উনত্রিশে মার্চ....মন্মথ মুখার্জী রো... গোপন সই...ওরা সব সাক্ষী ছিলো
আর.... সেই রাত...
মা—
আজ থাক্।
এখন ওসব কথা তোমাকে লিখতে গেলে... দেখো...ঠিক পাগল হয়ে যাব...

বাসরুট

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

ছাব্বিশ নম্বর রুটে বাস চলল হুগলি-চাঁপাডাঙা
রুটের পাশেই ছুটে শুকিয়ে মরেছে একটা খাল
সবজির বস্তা, মুরগি, ফুলকাটা টিনের বাক্সো
জানলার বাইরে চোখ, ধু ধু মাঠ, একটা দুটো গ্রাম

মাথায় বেগুনি ফিতে, পায়ে লাল প্লাস্টিকের চটি
বাঁ দিকে লেডিস সিটে টুলু নস্করের পরিবার
বড়টির পাঁচ বছর, মেজোটিও মায়ের হাত ধরে
খানাখন্দ ভরা পথে বেদম ঝাঁকুনি খাচ্ছে বাস

বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন আর কান্নাকাটি
এখন সামলাও ঠেলা, দুধ তুলেছে কোলের বাচ্চাটি।

যোদ্ধা

সৌমিত্র বসু

তোমার কথা বারো ভতের কথা
তোমার কথা আকাশপানে ধায়
আকাশ ছিঁড়ে উড়ছে দিকে দিকে
ক্লান্ত মেঘের আনত সন্ধ্যায়

এখন সেসব যতই মনে করো
দু-হাত দিয়ে জাপটে ধরো বাড়ি
বাড়ি কি ছাই লম্বা সরু নদী
আমি কিছুই জানিনা এসবের

কিভাবে কোন তারা খসার রাতে
কে ঢেলেছে কার চোখে নিঃশ্বাস
এক পা দু-পা কুৎসা রটে গাছে
ও গাছ তুমি জানো না আমায়

ও গাছ, জানো, মৃত্যু কাকে বলে
তেমন হলে ভাইকে খুঁজে আনি
দুজন মিলে জ্বালবো তোমায় আবার
ও গাছ তুমি যেও না লক্ষ্মীটি

জলের নীচে বেড়ায় যেসব শিশু
প্রশ্ন করো কঠিন কোনো শীতে
আমার বাবা গলায় ভীষণ জ্বর
জাগছে আকাশ দূর কোন নৈঋতে

মায়ের কথা বলবো তাতে মানা
বলবো খানিক হিংসা অহিংসাতে
কতকালের পুরোনো সেই জামা
উড়ছে দ্যাখ পুড়ছে গতরখাকী

ও গাছ আমায় পাগল ভাবে ওরা
থুতু ছেটায় আমার চোখে মুখে
চোখ যদি যায় থাকবে কি আর বলো
ঢালবে কোথায় কিভাবে চুম্বন?

ও গাছ আমায় ছেড়ো না লক্ষ্মীটি
ও গাছ তোমায় মন্ত্র দেবো কানে

রক্তপাথর

রাহুল পুরকায়স্থ

যদিও মন্থর দিন, তুমি পার কর

স্নায়ু ও শিবির থেকে দূরে
অতিরিক্ত ভারবাহী, যেন ধর্ম,
কলহপ্রবণ, এইমাত্র দাঙ্গা সেরে এল
বৃথা বাক্য, স্নায়ু শিবিরেরা
যদিও মন্থর দিন, কোলাহল করে

দুই

যদিও মন্থর দিন
অন্ধকার, বেজেছে নির্জন
মৃত হাড় ভাসমান, ইতস্তত
বনমরিচীবাগ—
যতিহীন, ছিন্ন এই উপমাশৃঙ্খল
কী চেয়েছে জলবিগ্রহের কাছে

ঝাউবনে, সমুদ্র গর্জনের পাশে
নৌকা, একাকী পড়ে আছে

আর কত

সিদ্ধার্থ সিংহ

তুমি যে একেবার ঘেমে নেয়ে গেছো, মা

টুপটাপ ঝরে পড়া ডাল-পাতা ঝাঁট দিয়ে আর কত সরাবে
আর কত দিন উঠোন থেকে দাওয়ায়, দাওয়া থেকে ঘরে হাত ধরে তুলবে
ঝড় জল রোদের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে আর কত আগলাবে

তুমি যে একেবারে ঘেমে নেয়ে গেছো, মা

এবার অন্তত সদর দরজার বাইরে আমাকে একটু একা একা ছাড়ো।

মা

তাপস অধিকারী

মা নামের স্নিগ্ধ উচ্চারণে
আমার আলোকিত হয়ে ওঠে ভূমি,

হৃদয় স্বকালে দেখি
চিরন্তন মাতৃমূর্তি সর্বংসহা তুমি।

নিঃসঙ্গ শূন্যতা যত
তোমার রম্য স্নেহে পূর্ণ হয় মা,
যন্ত্রণার আঁধার ভেঙে
মূর্ত হও হে আমার তমোহর প্রতিমা।

তোমার ছায়াময় আঁচল
গাছ হয়ে আমায় মন্ত্রবাণী ছড়ায়,
অনাবিল শিশিরের হাত
আমার দিন শেষে ক্লান্ত শরীরে মমতা ভরায়।

তুমি শুধু মা নও
জননী জন্মভূমিশ্চ মাটি ধাত্রী মা,
তোমা হতে বুঝেছি
কিভাবে পাওয়া যায় কঠিন অর্যমা।

আদরিণীকে

যশোধরা রায়চৌধুরী

১

একা একা কষ্ট পাচ্ছো, তবু তুমি অপর কারুকে নিয়ে
অন্দর পাতাবে না। তুমিও আমারই মতো মা, ভ্রান্ত,
শুধু ঠিক-ঠিক দিকে ভ্রান্ত, তাই ভয়াবহ লাগে। ঈশ্বরে
পুতুল নেই, ভালোবাসা আছে, তাই লক্ষ্মীপুজোর দিনে
বানাবে না চিনিমঠ, চিনিমসজিদ! শুধু একা-একা
বসে আলপনা জাগাবে এই বাড়ির শরীর ধরে-ধরে...
সিঁড়ি ঝাঁকালেই ধানছড়া ঝরে পড়তে থাকে : আর
রান্নাঘর : দুটো চড় দিতেই দু-গালে আঙুলের মত ফুটে
উঠবে পাড়া, লক্ষ্মীঠাকুরের পাড়া....আর পাড়ায়-পাড়ায়
পুজো শুরু হয়ে যাবে, তুমি একা-একা অসংসারী তোমার
আদর, ঘট, ভেতর, সমস্ত ভরে টাটকা, সোঁদা বাতাপিলবণ।

২

আর পুজো, অকালবোধন, শাড়িছাপ, কুমোরটুলি ছাপ কোনও দিন বেছে
নিতে পারব না শলাকার চিহ্ন দেখে-দেখে দুব্বোঘাস, ওটা
মাইনাস চিহ্ন অ্যারোচিহ্ন নয়, ট্যাঁশ, ভূত...আর নিজ-আচ্ছাদনের
মত চালচিত্র থেকে কোনওদিন আলাদা করতে পারব না চিত্রহার...
শুধু আমার লম্বাটে খাতায় কড়ে আঙুলের মত ছোট্ট করে মনের
ভুল আমাকে দিয়ে লেখাচ্ছে অক্ষর মা মা মা মা মা...

৩

মাতৃমঙ্গল গাইতে পারছি আমি, আবার, উমাপিসি!

মহালয়া

রূপক চক্রবর্তী

চোদ্দ বছর বনবাস শেষে ফিরে এসেছিল রাম,
ফিরে এসেছিল পাণ্ডবেরাও অজ্ঞাতবাস কাটিয়ে,
এই সেদিন কালীপ্রসন্ন লিখলেন মড়া ফেরার হুজুক।
অথচ আমি ভাবতেই পারি না,
বাবা তুমি বাবা মড়া তুমি মড়া বাবা
(বাজে কথা বাবারা কখনও মরতেই পারে না)
তোমার শৃঙ্খল, ভদ্রতাবোধ, কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দূ-উ-র
সোনাগাছি-চোর-খালাসিটোলা-প্রবল মারপিট-কবিতার জন্য মাঝরাত।
স্মৃতিগুলো ফিকে হয়ে আসছে, তবু জ্বর হলেই ছেলেবেলার বইগুলো
নাড়িচাড়ি, অ্যালবাম উলটাই। ঘুম ভেঙে দেখতে পাই—
অন্ধকারে বসে আমার কালো মা, অপরূপ গরিব দুঃখী মা মাথা যন্ত্রণায়
কাঁদছে। আমি তখন শুনি না শুনি না!
'আকাশ আমায় ভরলো আলোয়, আকাশ আমি ভরবো গানে'
সুবিনয় রায়ের কাছ থেকে আমি পালাই।
(কে পড়ছেন এই লেখা? খুব হাসি পেল!)
চোদ্দ বছর পেরিয়ে চলেছে, আবার বাজছেন অমৃতকণ্ঠ হেমন্তবাবু
'হেইও হো হো হেইও, ও মাঝি ভাইও'
চোদ্দ বছর পেরিয়ে চলেছে, তাতে কী! আমি বিশ্বাস করি বাবা
একদিন দুপুরে তুমি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ফিরে আসবে আর
মাকে বলবে, 'শিগগির ঝোল ভাত দাও।'

গোপন শীতকাল

মানসকুমার চিনি

অজস্র তরুণ আলো আর পুরনো বান্ধবীদের
ডাকি, দু'চোখে জুড়ে যায় আবছা আলো
সরু সুতোর নীচে এখন উলবোনা কি ভীষণ শীত
তৈরি থেকো, তোমাকেও একটি নাম ঠিক করে দেবো।

তুমি পুরনো রঙ মুছে জুড়ে দাও সব সংসার
আসে বৃষ্টি, সারা বর্ষাকাল কতদিন একা একা
উড়ে যায় গাছে যেখানে আস্তে আস্তে প্রজাপতি
তৈরি হয় সব সুড়ঙ্গ ভেদ করে
আলো উপচে পড়ে:...

সরু জানালার ভেতর সুতোখোলা দিন তৈরি থেকো
তোমাকেও একটি নাম ঠিক করে দেবো
অথচ টানা শীতকাল কিভাবে গোপন রাখে
এই পিঁপড়ের বাসা বাধা যেমন তোমার চারপাশ।

দায়

বিভাস রায়চৌধুরী

আমার হাজার হাজার ঘুম আর হাজার হাজার জেগে-থাকা
এখন মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছে,
কী ভাষায় উত্তীর্ণ হবো আমার জানা নেই,
চেয়ে দ্যাখো, হিংসুটে চরাচর তোমার থেকেও পাগল হতে চায়,
খুব করে বকো তাকে, বকো...
মা, আমি কবিতাসম্ভবা!
ওই আলো, ওই অন্ধকার আমাকে নিংড়ে নিচ্ছে...
ওই জল, ওই হাওয়া আমাকে প্রলয় চেনাচ্ছে...
আমি কি খেলা হয়ে গেলাম?
আমার জ্ঞান ও পাপ,
আমার ধারণের প্রক্রিয়া দিগন্তকে উত্তেজিত করে,
আর দ্যাখো. পাতালের আর্তনাদ...
আর দ্যাখো, সময়ের বিভ্রান্তি...
অস্তিত্বের মধ্যে আর এক অস্তিত্বের নড়াচড়া মাঝে মাঝে
টের পাই,
হে ভয়, হে ভালোবাসা,
নির্জনের এই উঁকি তীব্রতম দায়,
আত্মমোচনের মতো জ্যান্ত ঘূর্ণিঝড় পাক খেতে থাকে...ওঃ!
আমার তারাবমি হবে...
আমার বৃক্ষবমি হবে...
মা, আমি কবিতাসম্ভবা!
চেয়ো দ্যাখো, তৃষ্ণা তাড়া করেছে এক ঝর্নাকে...
বাঁশি তাড়া করেছে এক সুরকে...
ঘর তাড়া করেছে এক জানালাকে...
বিষ তাড়া করেছে এক চুমুককে. .
আজ আমি উন্মুখ, তোমার বুকে মুখ গুঁজে এই আমার অস্থির গোঙানি,
শোনো, আমি তোমাকে এক স্বপ্নের ভাষ্য পাঠ করে শোনাচ্ছি,
আর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি
এক অসম্ভব বীজতলার দিকে...
তোমাকে গোপন দেখাতে কোনও লজ্জা নেই,
এই দ্যাখো, আমার ভেতরে সম্পূর্ণ নতুন এক
উপত্যকা জেগে উঠেছে,
মা গো! আমাকে তুমি যত খুশি 'নষ্টা' বলো,
কিন্তু ওর জন্ম নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলো না,
আগুন আর সেতুর সন্তান এখন আমার গর্ভে রক্তমাংসের রূপ নিচ্ছে...

অন্য রকম

প্রসূন ভৌমিক

শুধু চাও জয়েন্ট পাবো?
আর ঐ বিজ্ঞাপনের পাতায় পাতায় লটকে থাকি?
মা, তোমার অপূর্ণ সব.....
বাবারও আশৈশবের মিথ্যে হওয়া স্বপ্নগুলো
গলায় লকেট ঝুলিও না গো!

আমি তো এ-ঐ জানি
আমি তো বিন্দু পারি
মেঘেদের সঙ্গে আমার মৌন আলাপ জানলে না তো!
জানো না খাতায় কেমন মোমরঙেদের মন্ত্র পড়াই,
বেঁহুশ করি!
আমাকে ওদের মত চন্দ্রবিন্দু শেখাও কেন?

মা দ্যাখো,
অন্যরকম গাছ এঁকেছি
দেখবে এসো!

কাঁথা

তাপসকুমার লায়েক

এখানে কাগজ ছেঁড়া-বর্ণমালা গোটাকয় রেখে দাও স্মৃতি আমাদের আত্মীয়স্বজন,
পাড়াপড়শিদের ডেকে ডেকে এইসব শোনাও... নৌকা, জল, অথবা বাতাস
কোথাও না কোথাও আমরা-ঘর-পেলে-থাকব-একদিন আমি যা কিছু বলেছি অতিশয় অদ্ভুত ভাসাতে, যেমন—এই চোখে ধরা পড়ল সব, এই পাতা বন্ধ করে তোমাকে ছুঁলাম,
ছুঁয়ে দেখতে পেলাম একটা গল্প লেখা পথ মা সেলাই করেন।
এইসব রাজকন্যা, পরী, এক নির্জন মহল কোন বৃষ্টির দিন তোমরা ভাসিয়ে দিলে
গ্রামরাস্তা বরাবর উঁচুনিচু ধানখেত, জমিন
পুরোনো পাড়ায় গিয়ে ডাকে দুষ্টু বদমাশ ছেলেদের, ডাকে—
এখন ভিজতে হবে, আজ স্কুলে ছুটির বিকেল, কথা মেঘলা হয়ে আছে।
তোমার কি নাম বলো এইবার, পোশাক পুরোটাই ভিজে?
এই জলের রেখায় কাঁথা বুনেছেন তিনি। তোমার গল্প কিছু ঢুকে পড়বে যেখানে দেয়াল।
যেখানে অন্ধ আমি কিছুতেই অক্ষর ছুঁতে পারছি না ছুটি, নৌকো ভাসালাম।
নদী বহু দূর থেকে এলে, মা তোমাকে ডাকছেন...
'আজকের দিনটা থেকে যাও'....
ওখানে সুতোর কাছে বহু গল্প, ডালপালা, এইবারে ঠিক করতে হবে।

রামপ্রসাদী
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই রকমই ব্যক্তিগত শীতের রাতে
কোনক্রমে দুধ আর রুটি খাবার পরেই
তোমার পাশে কে শোবে তার মীমাংসা নেই
লেপের তলায় ভাইয়ের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ

তোমার সঙ্গে ছুটির দুপুর আকাশবাণী
কলকাতা 'ক' কল্পমায়া অতুলপ্রসাদ...
তোমার স্পর্শে নিঝুম সন্ধ্যা ক্লান্ত পাখি...
আকাশ তোমার আঁচল ধরেই উড়তে থাকি

আকাশ মানে মেঘনা-মেঘের প্রাইমারি স্কুল
কাল সেখানে পড়তে যেতাম...আজ সেখানে...
আকাশ মানে কিশোর পাখির ফুটবল মাঠ...
আকাশ মানে নির্জন ঘর, দু'জন কুসুম

বিচিত্র সব আকাশ গগন নীলাম্বরী
একাই তুমি সামাল দিতে গানের মতো.....
সামাল দিচ্ছো আমার ধ্রুপদ কিংবা ধামার
কিংবা তোমার দ্বীপান্তরের যৌথ খামার

অতীত হাওয়ায় ভাসছে তোমার হারিয়ে যাওয়া
তখন তুমি অন্য একটা আকাশ ধরে
ভাসছিলে এক নতুন পাখির, ক'জন কুসুম?
কষ্ট পেতে, আমার মতো কষ্ট পেতে?

বৃথাই আমায় স্নায়ুর অঙ্ক শিখিয়েছিলে
কোনো অঙ্কই তোমার জন্য কষে রাখিনি
সর্বপ্রথম আকাশ নিয়ে লিখতে চাইছি
অন্যরকম দু'চার লাইন রামপ্রসাদী

দীক্ষান্ত

অহনা বিশ্বাস

তারপর শরীরের চাতাল ছাপিয়ে ঝড় জল
তারপর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষপোকা
গুটি কাটে, গুটি কাটে আয় মায়াবিনী
প্রজাপতি সখী ভালো, মুহূর্তে পালিকা আমি
ব্রাহ্মণ যুবকটিকে মন্ত্রপূত করেছি সকালে

প্রথমেই বলে রাখি, দলিতরমণী আমি
বলে রাখি কৃষ্ণবর্ণা, শিষ্যটি জেনেছে সব ধীরে
আয়ত দুচোখ তার, তার আর্যবর্ণ
চক্রপথে ঘুরে নেয় পাতালপ্রদেশ
পলাশবর্ণিতা গুরুমাতা, ঘোর নীল চুল
খরস্রোতা বিনুনির খাঁজে ফোটে যূথীফুল
এতসব জেনে আমি নর্মদা ঘর্ঘরা ঘেঁটে
এতসব বুঝে আমি গুহাঘরে ঢুকে
বালকের মুগ্ধ চোখ ফুটো করে শ্লোকমায়া পলি
ওই শ্লোকে স্নান, ওই শ্লোকে গান পুরো তিনদিন
ছাত্রটির নাওয়াখাওয়া নেই, ভুলে গেছে ধানখেত
হৃদয়রতন

চোখে বিষ, মুখে বিষ, বিষ নামে অধরে চিবুকে
হাহা করে ওঠে ফুসফুস, নীলকণ্ঠ বালক আমার
ছুঁয়ে ফেলেছেড়ে, ছুঁয়ে যে ফেলল সর্পশীতল গা
কী করি, কী করি আমি, ঘোর জ্বর গর্ভদেশে পায়ের পাতায়
বুঝি এ খবর রাষ্ট্র হয় স্বর্গের উদ্যানে
বুঝি বেঁধে নিয়ে যায় শাস্ত্রী, গ্রাম ছাড়া করে পাছে, তাই
মধ্যরাত্রি মহারাত্রি, তোকে আমি খাদে টেনে ফেলি

কালোজল কালোজল, সাঁতার ভুলেছে যুবা
বিষপোকা উড়ে যায়, খোবলায় পিত্তবর্ণ চোখের কুসুম
চেয়ে দেখি, ছুঁয়ে দেখি আমি এক মাছরাঙা পাখি
আহা মায়া হয়, বড়ো মায়া হয়, চিপে ধরে হৃদয় পাঁজর

পাঁজরে পাঁজরে পাপ, রক্ত গঙ্গা দুয়ার ভাসায়
তার তোলা জল ঘরে আছে, ছুঁতে ভয় হয়
কেন জানি সেগুনপাতায় ঢেকেছিল পানিফল

ফেলে দেব, ধুয়ে দেব এতখানি শোক
ফেলেই দেব কবরে তোর শ্লোকের ঘরদুয়ার
ফেলে দেব আচরণ, পোঁতা রইল পা
সব বিদ্যে মিথ্যে হোক, হেরে ভূত হই
এইখানে হিমঝুরি অসহ্য সবুজ
অন্নদান পুষ্পদান প্রিয়তা কোথায়?

সেই মানবীকে নিয়ে

অপর্ণা দত্ত

উদ্বেল ভালবাসার অপার পাহাড়
এবং সেখানে এঁকে দেয়া ভোরের সূর্য টানটান;
সেই টানটান নিমগ্নতার ঝর্না বুকে নিয়ে
উল্লোল সুখে মনে আনে
ঝলমলে সবুজ হাসি,
সেই হাসি যেন সমুদ্রের দুহাত
দুহা বাড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ
ঢেউ অনেক মুগ্ধতায় কাছে টেনে নেয়—
গড়ে ওঠা
তারই ভ্রুকুটিতে
আনন্দের মূর্ছনায় বিমোহিত
নতুন নতুন চারা গাছে সৃষ্টি।

সেই মানবীর থাকে না কোন
চাওয়া পাওয়ার হিসেবনিকেশ
থাকে শুধু স্বপ্নের বীজবোনা,
শুধু তারই মনোবাসনার উষ্ণ প্রতাপে
চারাগাছকে বাঁচিয়ে রাখতে গড়া হয়েছে বাগান

ঝড়ঝঞ্ঝার হাত থেকে তুলে আনছে
নিয়ত যে বাগান,
তাই মায়ের কল্পিত ছবি
তাই-ই মহান মানবী তিনি।

হাওয়ার বেড়াবিনুনি
তৃষ্ণা ভট্টাচার্য

ছিল এক ন্যাড়া ছাদ, ঝাড়া হাত-পা সমস্ত মেয়ের
নীচের শরিকি কলে, পিছলিয়ে খুনসুটি সেরে
সন্ধ্যাতারাটির মতো টিপ পরে, তেরি বিন্দিয়া রে—
বসতিস দাঁড়ে দাঁড়ে, বহু কাঠে ঘুণ সেরে যেত।

কারুর সাইকেল ছিল, কারো ছিল ডাক করা চিঠি
ধরা পড়লে হারিকেন— ধরা পড়বার চান্স ছিল,
তবু ন্যাড়া ছাদ ভালো মরা ঘাস বিকেলের থেকে
এমন অনেক কথা— কাউকে যা বোঝানো যাবে না।

এক মেয়ে চিঠি পায়নি, তানপুরা রেওয়াজের খাতা
মেয়ের মা ছুঁতে দেয় না, এমনকি ছোট বোনকেও
কেমোথেরাপিতে শেষে সব চুল উঠে গিয়েছিল
এক মেয়ে চিঠি চায়নি, মার কাছে থাকতে চেয়েছিল।

ছাদে ছাদে ঠুকে যায়— এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে
কাটা ঘুড়ি এসে পড়ে, শ্রাবণের বৃষ্টির স্তবক
দুড়দাড় ঢুকে যায় বাজেট অধিবেশনের ফাঁকে
সমস্ত বিকেল, মা হাওয়ার বেড়াবিনুনী বাঁধে।....

মা-কে, ১ বৈশাখে
জয়ন্ত ভৌমিক

বৈশাখ পড়লেই (জানোই তো কী বলতে যাচ্ছি—.
মানে আমার যা উল্টোপাল্টা মন, সিঁদকাটা চোরের সঙ্গে
আমি কল্পনার মিল খুঁজে পাই, অতএব মনের মধ্যে
জমা হয় ঝুরঝুরে মাটি, জমে চাঁই হয়,—আর ওমনি একদিন
চাঁই-টাই সরিয়ে, উরিস্‌সব্বোনাশ, ঢুকে পড়লো
হইহই কী-এক সেই ডাকাতে-কল্পনা!...
এখন আমি তার সঙ্গে পারি আর না-পারি, নিজের মুখ রাখতে
তোমাকে তো বলতেই হবে চারপাশে, আমার কল্পনার
কী জোর, কী তার হাঁকডাক!—
আসলে, এইসবই, দুপুরে না-ঘুমিয়ে
কাগজ-কলম এক-করার ফল,—
তবু তোমাকে তো বলতেই হবে, কী-ভাগ্যে আমি ছিলাম,
(এবং জেগেও ছিলাম দুপুরে না-ঘুমিয়ে), সেজন্যই তো
লড়তে পারলাম ডাকু-কল্পনার সঙ্গে, নইলে তুমি কী-আর
রক্ষে পেতে ওদের হাতে!—
তবেই বুঝে দ্যাখো মা, কী বিরাট ব্যাপার! সেই কবে
রবীন্দ্রনাথ লড়েছিলেন, তারপর এই আমি লড়ছি,
তোমাকে নিয়ে লিখতে লিখতে!

মা তোমার ছেলের লেখা
সাম্যব্রত জোয়ারদার

কালো দুই ডানার ছায়া অতর্কিতে দাঁত বসিয়ে দিলে
উজ্জ্বল জ্বর উঠে দাঁড়ায় ফের চার জলোচ্ছ্বাস, পাঁচ জলোচ্ছ্বাস
ছয় শীর্ষস্তম্ভ ডিগ্রি সাত নক্ষত্র থেকে ছিটকে ছিটকে ওঠে
আগুন আরো আগুন আলোকবর্ষ ছুঁতে চাওয়া
ভীষণ মনখারাপের একটি স্পর্শ.....

অথচ দীর্ঘ সাত বছর ধরে ডাক্তারবাবু আমার ঘুম
আসছে না কিছুতেই, স্বপ্নের মধ্যে কিংবা স্বপ্ন নয়
অন্য কোনো কুয়াশায় এক ডাইনি চুল খুলে দিনরাত
হি হি করে হাসছে আর হাসছে আর সাপ জড়ানো
আপেল খেতে দিচ্ছে আমায়,
একটা সরু পাঁচিলের ওপর দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে
কোনোক্রমে টলতে টলতে মা তোমার স্বপ্নে পাওয়া ছেলে
ফিরে আসছে আবার অতিকায় এক খাঁচার ভেতর,
আর মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে লক্ষ কোটি বছরের
কুণ্ডলীকৃত ঘোর অনন্ত শীতঘুমের তলায় পড়ে যাচ্ছে সে...

তবু কালো দুই ডানার ছায়া আর অতর্কিতে দাঁত
বসিয়ে দিলে, সারাদিন মুখ গুঁজে শুয়ে থাকবে কেউ
উষ্ণ বালিতে, উজ্জ্বল পারদ উঠে দাঁড়াবে ফের
আর প্রলাপ বকবে ভুল বকবে বিকার আর সারাজীবন ধরে
কত কত ভুল নিয়ে হয়ে থাকবে একা কঠিন লোহা
হয়ে তামা হয়ে মাটি হয়ে মাটির নীচে নেমে যাওয়া
শিলা কেন্দ্রমণ্ডলের তাপ হয়ে ফুটতে থাকবে কতদিন
অপেক্ষায় অপেক্ষায় অন্ধকারে চুল খুলে লুকিয়ে থাকবে
এক ডাইন অতর্কিতে দাঁত বসিয়ে দেবে গলায়,
হাড় চুষতে থাকবে মজ্জা চুষতে থাকবে সমস্ত
রক্তরস প্রাণ তাপ টেনে নিতে থাকবে নিজের রূপ তৈরির জন্য

শুধু একদিন না একদিন মা তোমার স্বপ্ন ভোলানো ছেলের মাথায়
জন্ম নেবে চিরঘূর্ণায়মান এক কবিতা, গলা টিপে ধরা
মৃত্যুর মধ্যেও চকিতে ঘুরে দাঁড়ানোর এক আগুন হড়ানো পথ...